বাংলাদেশে এন জি ও:

দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়ন

আনু মাহমুদ

'আনু মাহ্‌মুদ' কলমী নামে লেখেন বিভিন্ন ইংরেজী, বাংলা সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকা সমূহে, বাংলাদেশ এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ সার্ভিস-এর সদস্য মোঃ মাহ্‌মুদুর রহমান। তার দ্বিতীয় বই বাংলাদেশে এনজিওঃ দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়ন, আমাদের দেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সেবার কর্মকান্ডে নিয়োজিত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের অবস্থান, ব্যাপ্তি, প্রাসংগিতা, প্রভাব ও বিরাজমান দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমস্যা ও সম্ভাবনার গতি প্রকৃতির ভিত্তিতে তিনি গ্রন্থিত করেছেন। ইতোপূর্বে তার অন্য একটি বই Inside Bangladesh Economy প্রকাশিত হয়েছে।

মূলতঃ অর্থনীতির ছাত্র 'মাহ্‌মুদ' প্রশাসনিক সার্ভিস- এ যোগদান করেন তার সিভিল সার্ভিসে কাজ করার প্রত্যাশা পুরণার্থে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ১৯৮৫ ব্যাচের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রশাসনিক সার্ভিসে যোগদানের পূর্বে তিনি গবেষণা ও ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানসহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অর্থায়িত আর্ন্তজাতিক সংস্থা সমূহে কাজ করেন।

'মাহমুদ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে সম্মানসহ স্নাতোকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। স্কুল ও কলেজের শিক্ষা জীবন তার জন্মস্থান পটুয়াখালীতে সম্পন্ন করেন এবং সরকারী জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এস এস সি এবং পটুয়াখালী সরকারী কলেজ থেকে এইচ এস সি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও জাতীয় সংসদ সদস্য জনাব মজিবর রহমান তালুকদার- এর তিনি দ্বিতীয় সন্তান।

www.pathagar.com

প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা কালেক্টরেট, সহকারী পরিচালক, ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর, সিনিয়র সহকারী সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ই আর ডি)-এ দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টার একান্ত সচিব হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।

'মাহমুদ' কিছু সংখ্যক সামাজিক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত রয়েছেন - গত ৭ বছর হলিক্রস গার্লস হাই স্কুল-এর ম্যানেজিং কমিটির সদস্য, বাংলাদেশ এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ সার্ভিস এসোসিয়েশনের কার্যকরী কমিটির সহকারী মহাসচিব, 'বিয়াম' ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য এবং বাংলাদেশ অর্থনৈতিক এসোসিয়েশনের সদস্য।

তিনি ইরান ও ভারত-এ ট্রেনিং, ওয়ার্কশপ এবং ষ্ট্যাডি ট্যুর প্রোগ্রাম-এ অংশ গ্রহণ করেন। স্কুলের ছাত্র থাকাকালীন সময়ে প্রথম শ্রেণীর বয়স্কাউট হিসেবে ১৯৬৭ সালে পাকিস্তানের করাচীতে ৬ষ্ঠ জাতীয় স্কাউট জাম্বুরীতে যোগদান করেন। তাঁর মূল আগ্রহের বিষয় হচ্ছে-আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন, পাবলিক এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন ও ব্যবস্থাপনা কৌশল সমূহ।

'মাহমুদ' ইতোমধ্যে বাংলায় ৩০০-এর অধিক এবং ইংরেজীতে ২০০-এর মতো প্রবন্ধ লিখেছেন, যা বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এর প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে-আর্থ-সামাজিক সমস্যা ও এর নিরসনের পন্থা নির্দেশনা, অবকাঠামো উন্নয়ন, জনপ্রশাসন এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন। তাঁর এ ধরনের লেখা সমূহ উচ্চপদস্থ, বন্ধু সহকর্মী ও পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের দ্বারা প্রশংসিত হওয়ায় এবং তাদের প্রেরণা পেয়ে প্রকাশিত কতিপয় প্রবন্ধ সন্নিবেশনের মাধ্যমে তিনি এই বই প্রকাশের ক্ষেত্রে উৎসাহিত হয়েছেন।

প্রচ্ছদ: সমর মজুমদার

ISBN 984-31-0001-X

www.pathagar.com

বাংলাদেশে এনজিও : দারিদ্র্যবিমোচন ও উন্নয়ন

আনু মাহ্‌মুদ

হাক্কানী পাবলিশার্স

www.pathagar.com

প্রকাশক:
গোলাম মোস্তফা
হাক্কানী পাবলিশার্স
মমতাজ প্লাজা, বাড়ী নং-৭, সড়ক নং-৪
ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫, ফোন: ৯৬৬১১৪১-৩

© লেখক

প্রকাশকাল:
মার্চ ১৯৯৮

দ্বিতীয় প্রকাশ:
অক্টোবর ১৯৯৮

প্রচ্ছদ শিল্পী
সমর মজুমদার

পরিবেশক:

- পপুলার পাবলিশার্স
  ২০, প্যারীদাস রোড
  বাংলাবাজার, ঢাকা, ফোন: ২৪৫৯২০

মূল্য:
২০০ টাকা (ইউএস $ ১০)

মুদ্রণে:
ধানসিড়ি প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং কোং লিঃ
তারকালোক কমপ্লেক্স, ২৫/৩ গ্রীন রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন: ৮৬১৩৪৬, ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮৬৪৩৩০

BANGLADESHEY NGO: DARIDRO BIMOCHON O UNNA'
by Anu Mahmud, Published by : Golam Mustafa, Hakkani Publishers, M
Plaza, House No-7, Road No-4, Dhanmondi, Dhaka-1205. Printed by : D
Printing & Publishing Co. Ltd. 25/3 Green Road, Dhaka-1205, Phone
Fax : 880-2-864330, Published in March 1998, Cover Design: Samar M
Price Tk. 200.00 (US $ 10).

ISBN : 984-31-0001-X

www.pathagar.com

উৎসর্গ

মোঃ হাফিজুর রহমান
ডঃ মোহাম্মদ হান্নান
গোলাম মোস্তফা
-এর প্রতি

যাদের উৎসাহ
সহযোগিতা ও প্রচেষ্টায়
বইটি প্রকাশিত হলো

www.pathagar.com

ভূমিকা

আমি তখন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)-এ কর্মরত এবং বিশ্বব্যাংক অর্থায়িত কিছু প্রকল্প বাস্তবায়নের মনিটরিং ছিলো আমার কর্মপরিধির আওতাভুক্ত। আমার আজিমপুরস্থ সরকারী কোয়ার্টার থেকে অফিসে যাওয়া-আসার পথে ইআরডি-এর গাড়ীতে অন্যান্য কর্মকর্তাদের মতো আলাপ ঘটে জনাব মোঃ হাফিজুর রহমানের সাথে, যিনি এশিয়া উইং-এর চীন বিষয়ক কার্যক্রম দেখা শোনা করেন। তার চিন্তা-চেতনার ভিন্নতা, যুক্তির প্রখরতা, জ্ঞানের গভীরতা, আলোচনার পান্ডিত্য ও মনের উদারতা আমাকে তার প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে এবং কয়েকদিনের মধ্যে তার সাথে বেশ সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। যার ফলশ্রুতিতে আমার লেখালেখির উপর দুর্বলতা সহজেই তার কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং আমি ক্রমান্বয়ে আমার সদ্য প্রকাশিত লেখার কপি তাকে পড়তে দিয়ে এর উপর মতামত প্রদানের জন্য বলে দিতাম। তার মতামত অনুযায়ী আমিও যৌক্তিকতাপূর্ণ পরিবর্ধন ও পরিবর্ধন আনার চেষ্টা চালিয়ে যেতাম পরবর্তী লেখাগুলোতে। এভাবেই তিনি আমাকে উৎসাহী করতে থাকেন বই প্রকাশ ক্ষেত্রে। যদিও প্রকাশকের অভাবের কারণে এব্যাপারে আমার অপারগতার কথা তাকে বলাতে তিনি সহায়তার আশ্বাস দিয়ে সাহস যোগাতেন।

আর এরই মাঝে আমার প্রথম বই, 'Inside Bangladesh Economy', বিয়াম'-এর প্রকল্প পরিচালকের সহায়তায় প্রকাশিত হওয়ার আশ্বাসের কথা শুনে তিনি যেন আরও উৎসাহিত হয়ে আমাকে আশ্বস্ত করতে চাইলেন- এবার আরো প্রকাশক পাওয়া যাবার কথা বলে। একই সাথে তাঁর বিল্ডিংয়ে প্রখ্যাত তরুণ ও প্রতিভাবান লেখক, গ্রন্থাকার, সুপন্ডিত, ড. মোহাম্মদ হান্নান যে থাকেন, তার মাধ্যমে আমাকে সহায়তার আশ্বাস বাণীও শোনালেন। আমিও মনে মনে কল্পনার জাল ছড়াতে লাগলাম আরও দু'একটা বই প্রকাশ হবে এই স্বপ্নে বিভোর হয়ে।

এর আলোকে একদিন হাফিজ ভাই পাণ্ডুলিপিও চাইলেন, তা নিয়ে ড. হান্নান-এর সাথে কথা বলাতে, ডঃ হান্নান তা ব্যবহারের প্রচেষ্টা চালালেন তার বহু বই-এর প্রকাশক 'হাক্কানী পাবলিশার্স'-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব গোলাম মোস্তাফার মাধ্যমে।

দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর এ পর্যায়ে একদিন সুফল পাওয়ার খবর পাওয়া গেলো। কথা হলো আমার সাথে হাফিজ ভাই, হান্নান ভাই, মোস্তফা ভাই-এর উপস্থিতিতে আলাপ করে কোন কোন বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত হবে আমার প্রকাশিতব্য বইটিতে সে বিষয়ে স্থির করা হবে। আর সে আলোচনায় বইটির নামের প্রশ্নের সমাধান দিলেন হান্নান ভাই- তিনি কলম টেনে লেখে ফেললেন, 'বাংলাদেশের এনজিও : দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়ন' নামটি। একদিকে নামটির যেমন যথার্থতা রয়েছে এবং অন্যদিকে তার প্রচেষ্টার স্বীকৃতি স্বরূপ আমিও নামটি অত্যন্ত সানন্দ্যচিত্তে গ্রহণের ক্ষেত্রে সম্মতি জানালাম। হাফিজ ভাই ও মোস্তফা ভাই-এর কাছেও মনে হলো নামটি সমাদৃত হলো। এ সকল আলাপ-আলোচনা হয়েছিল কোনো

www.pathagar.com

বৃষ্টিভেজা শুক্রবারের বিকেলে এবং আজিমপুরস্থ লেডিজ ক্লাবের সম্মুখস্থ খোলা মাঠের মধ্যে একটি গাড়ীতে বসে। এ আলোচনা ও সিদ্ধান্তের মাঝেও যেন অনানুষ্ঠানিক বৈচিত্র্যতার ছাপ ছিলো। আর এভাবেই যেন 'হাক্কানী গ্রুপে'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোস্তাফা ভাইয়ের সাথে আমার বই প্রকাশের যাত্রা শুরু হলো। যার জন্য আমি কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে রইলাম হাফিজ ভাই ও হান্নান ভাই-এর মতো মহান ব্যক্তিত্বদ্বয়ের কাছে। তাদের এ সহযোগিতা না পেলে আমার এ বইটি প্রকাশিত হতো কিনা সে বিষয়ে আমি সন্দিহান।

'বাংলাদেশে এনজিও : দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়ন' আমার দ্বিতীয় বই হিসেবে প্রকাশিত হওয়ার কথা থাকলেও প্রকৃতপক্ষে এটি প্রকাশিত হচ্ছে চতুর্থ নাম্বারে, এজন্য বিভিন্ন ঘটনা ও কাজের মারপ্যাঁচ এক্ষেত্রে অনেকটা সময় নষ্ট করেছে যার পিছনে একমাত্র প্রাকৃতিক কারণ ছাড়া কারো হাত ছিলো বলে প্রতীয়মান হচ্ছে না। যদিও শেষ পর্যায়ে আল্লাহর রহমতে অনেক চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে বইটি যে প্রকাশিত হতে পেরেছে সে বিষয়ে মহান আল্লাহতালার অসীম করুণার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে থাকলাম।

এই বইতে বাংলাদেশে এনজিও'র উৎপত্তি, ব্যাপ্তি, বিকাশ ও কার্যক্রমের আওতাসহ আমাদের সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এর অবদান সহ আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে সফলতা ও ব্যর্থতা সম্পর্কে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এবং এর সাথে সন্নিবেশিত রয়েছে, এনজিও'র প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম শুরুর ক্ষেত্রে প্রচলিত বিধি-প্রক্রিয়াসমূহ, যা এনজিও কার্যক্রমের ক্ষেত্রে উৎসাহীদের সহায়তা প্রদানে সফল হবে বলে আমার বিশ্বাস।

তাছাড়া আরো সন্নিবেশিত রয়েছে দারিদ্র্যের আকার-প্রকৃতি সম্পর্কিত বিষয়সমূহ, উন্নয়নের গতি-প্রকৃতির আলোকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চালচিত্রসহ স্বাধীনতা উত্তর দীর্ঘ সিকি শতাব্দীর আর্থ-সামাজিক সফলতা ও ব্যর্থতার হিসাব-নিকাশের অবস্থান, যা এ বিষয়ে উৎসুক পাঠক, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও গবেষকদের সহ এনজিও সংগঠক ও কর্মীদের দৃষ্টি আকর্ষনে সফল হবে বলে আমি প্রত্যাশা করছি। আর সে ক্ষেত্রে সফলতা পেলেই আমার পরিশ্রম কিছুটা হলেও লাঘব হবে বলে আমি মনে করি।

বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে যারা সার্বিকভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন তাদের প্রতি আমি কৃতার্থ হয়ে রইলাম। এ জন্য আমি হাফিজ ভাই, হান্নান ভাই ও মোস্তফা ভাই-এর প্রতি ঋণী হয়ে রইলাম। তাছাড়া সার্বক্ষণিক সহায়তা দানের জন্য 'হাক্কানী পাবলিশার্স'-এর বুলন দা-সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা ধন্যবাদের দাবীদার এবং তাদের প্রতি রইলো আমার অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা। প্রচ্ছদ অলংকরণ ও পরিস্ফুটনের ক্ষেত্রে সমর মজুমদার দাদা যে পরিশ্রম, মনোযোগ ও ধৈর্যের সাথে সময় নিয়ে কাজ করে সফলভাবে সম্পন্ন করেছেন এজন্য তাঁর অবদান যথার্থভাবে মূল্যায়িত না করলে তার প্রতি অবিচার হবে বলে আমি মনে করি।

মার্চ ১৯৯৮ **আনু মাহমুদ**

www.pathagar.com

সূচীপত্র

১.	এনজিও কার্যক্রম : উৎপত্তি-ব্যাপ্তি ও উন্নয়ন	৯
২.	এনজিও কার্যক্রম গ্রহণ : বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া	১৭
৩.	এনজিও'র ভূমিকা : সেবার মূল্যায়ন	৩১
৪.	আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন : এনজিও কার্যক্রম	৬০
৫.	সরকারী-বেসরকারী সংস্থা : দারিদ্র্য নিরসন	৬৫
৬.	এনজিও'র মাধ্যমে কৃষি ঋণ	৭০
৭.	ইউএনডিপি'র এনজিও কাহিনী	৭২
৮.	এনজিও'র কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা	৭৪
৯.	এনজিও'র অনুসরণীয় কার্যপ্রণালী	৭৬
১০.	The Societies Registration Act, 1860	৮৮
১১.	কিছু গুরুত্বপূর্ণ দাতা সংস্থার তালিকা	১২১
১২.	দারিদ্র্য নিরসনের পথের সন্ধানে	১২৯
১৩.	দারিদ্র্য বিমোচনের প্রত্যাশা	১৩৫
১৪.	রাজনৈতিক ব্যয়জনিত ঋণের দায়	১৩৯
১৫.	অর্থনীতিতে বইছে উল্টো হাওয়া	১৪৬
১৬.	সুদের হারের পরিবর্তনই বিনিয়োগের জন্য যথেষ্ট নয়	১৫৫
১৭.	বিদেশী বিনিয়োগ ও বেসরকারিকরণে চাই সাহসী ভূমিকা	১৬১
১৮.	সংস্কার কর্মসূচির স্থবিরতা দূর করা আবশ্যক	১৬৬
১৯.	এডিবি'র নীতিনির্ভর ঋণ উন্নয়নে সহায়ক হবে কি?	১৭৩
২০.	গ্যাট কি শোষণের হাতিয়ার	১৭৯
২১.	দারিদ্র্য থেকে সমৃদ্ধি : বাস্তবতার আলোকে উন্নয়ন মডেল	১৮৭
২২.	বাংলাদেশের উন্নয়নের গতিপ্রকৃতি : ২৫ বছরের চালচিত্র	১৯৪

www.pathagar.com

এনজিও কার্যক্রম :
উৎপত্তি-ব্যাপ্তি ও উন্নয়ন

স্বাধীনতার পূর্বে বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের (এনজিও) কর্মতৎপরতা তেমন লক্ষ্যণীয় ছিলো না। ঐ সময়ে মাত্র কয়েকটি বেসরকারী সংস্থা গতানুগতিকভাবে প্রধানত ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কাজ করে আসছিলো। তার মধ্যে ব্যাপটিষ্ট মিশনারী, সিআরএস ক্রিশ্চিয়ান মিশন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে মার্কিন কেয়ার সংস্থা পঞ্চাশ দশকের শুরু থেকেই এতদঞ্চলে উন্নয়নমূলক বিভিন্ন ধরনের গ্রামীণ প্রকল্প সরকারের অনুমোদনে বাস্তবায়িত করে আসছিলো।

স্বাধীনতা উত্তর পর্ব :

বিশেষ করে ১৯৭০ সালের উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড় ও ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পর এ দেশের জনসাধারণের মধ্যে ত্রাণ, ঔষধ, স্বাস্থ্যসেবা ও আশ্রয়জনিত পুনর্বাসনের কাজে নিয়োজিত হয় বেশ কিছু সংখ্যক দেশী ও বিদেশী এনজিও। মূলতঃ সে সময় থেকেই বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ নিছক সেবামূলক ত্রাণ কর্মকাণ্ড থেকে উন্নয়নমূখী প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যাপক অংশগ্রহণ শুরু করে এবং দিন দিন তাদের কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাংলাদেশী বৃহৎ এনজিও সমূহ- ব্র্যাক, গণস্বাস্থ্য বিশেষ ভাবে এসময়ই সংঘবদ্ধ হয়। গ্রামীণ ব্যাংক যেটি আইনত এনজিও নয়, কিন্তু এনজিও হিসাবে ব্যাপকভাবে পরিচিত, তেমন একটি সংস্থা যা এ সময় পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করে। বর্তমানে এটি বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভে সক্ষম হয়েছে।

১৯৮০-১৯৮৪ কাল পর্ব :

১৯৮০ সালের পর থেকে এনজিও'র সংখ্যা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিশেষ করে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষা, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ সংরক্ষণ, দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এনজিওরা বহুমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করে এবং জনসাধারণের দোরগোড়ায় এদের সেবাধর্মী কার্যক্রমের ক্রমবর্ধমান মাত্রা পরিলক্ষিত হতে থাকে।

কার্যক্রমের প্রকৃতি ও ধরণ

বর্তমানে বাংলাদেশে কর্মরত এনজিওসমূহ বহুমুখী উন্নয়নধর্মী কার্যক্রমের অংশ হিসাবে বিগত বছরগুলোতে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে তাঁর অবস্থান হচ্ছেঃ-

www.pathagar.com

ছক : ১(ক)

এনজিও ব্যুরো থেকে ১৯৯০-৯১ পর্যন্ত খাতভিত্তিক অনুমোদিত প্রকল্প

ক্রমিক নং	সেক্টর/খাত	প্রকল্প সংখ্যা
১.	সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন	৮২
২.	পরিবার পরিকল্পনা	৪৭
৩.	আয়বর্ধণমূলক	৩২
৪.	স্বাস্থ্য	৩৮
৫.	মহিলা উন্নয়ন	৩৪
৬.	শিক্ষা	৪৭
৭.	বয়স্ক শিক্ষা	০৭
৮.	ত্রাণ ও পুনর্বাসন	২৪
৯.	উদ্বুদ্ধকরণ	
১০.	কৃষি	১০
১১.	মৎস্য ও পশুপালন	০৫
১২.	আইনী সহায়তা	১০
১৩.	শিশু মঙ্গল	১১
১৪.	অন্ধ পুনর্বাসন	১৪
১৫.	শিশু সদন	১১
১৬.	বন ও পরিবেশ	০৭
১৭.	জন স্বাস্থ্য	০৫
মোট	৩৯৯	

www.pathagar.com

ছক : ১ (খ)

এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক ১৯৯১-৯২ সালে খাতভিত্তিক অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ

ক্রমিক নং	সেক্টর/খাত	প্রকল্প সংখ্যা
১.	পরিবার পরিকল্পনা	৮২
২.	স্বাস্থ্য	৩৩
৩.	জন স্বাস্থ্য	০৫
৪.	মহিলা উন্নয়ন	৩৮
৫.	আইনী সহায়তা	১১
৬.	শিশু মঙ্গল	০৫
৭.	শিশু সদন	০৯
৮.	শিক্ষা	৮৮
৯.	পুনর্বাসন	০৪
১০.	পল্লী ও শহর উন্নয়ন	১০০
১১.	অবকাঠামো নির্মাণ	১১
১২.	আয়বর্ধক প্রকল্প	৫৪
১৩.	ত্রাণ ও পুনর্বাস	১২১
১৪.	কৃষি	১৩
১৫.	মৎস্য	০২
১৬.	মৎস্য ও পশুপালন	০১
১৭.	বন ও পরিবেশ	১৫
১৮.	যুব উন্নয়ন	০১
১৯.	অন্যান্য	১৭
মোট	৬১০	

www.pathagar.com

ছক : ১(গ)

এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক ১৯৯২-৯৩ সালে খাতভিত্তিক অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ

ক্রমিক নং	সেক্টর/খাত	প্রকল্প সংখ্যা
১.	পরিবার পরিকল্পনা	১৫৪
২.	স্বাস্থ্য	১৭১
৩.	মহিলা উন্নয়ন	৭৬
৪.	আইনী সহায়তা	২২
৫.	শিশু সদন	০৫
৬.	শিক্ষা	২৩৮
৭.	পল্লী উন্নয়ন	
৮.	আয়বর্ধক প্রকল্প	১৮৫
৯.	অবকাঠামো নির্মাণ	৩৭
১০.	কৃষি	৪০
১১.	মৎস্য	২৯
১২.	বন ও পরিবেশ	৪৫
১৩.	যুব উন্নয়ন	০২
১৪.	মানব সম্পদ উন্নয়ন	৮২
১৫.	দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা	৭৯
১৬.	পানীয়জল ও পয়ঃব্যবস্থা	২৭
১৭.	মাদকাসক্ত পুনর্বাসন	০১
মোট	১১৮৮	.

১৯৯০-৯৩ তিন বছর মোট অনুমোদিত সংখ্যা: প্রায় বারো শতটি।

ক্রমবর্ধমান বিকাশ ও ব্যাপ্তি

৭০-এর দশকের শুরুতে দক্ষিন বাংলার সমুদ্র উপকূলবর্তী বিশাল জনগোষ্ঠীর উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া প্রলয়ংকারী জলোচ্ছাস ও স্বাধীনতা যুদ্ধে বিধ্বস্ত জনপদে নিগৃহীত মানুষের তাৎক্ষণিক সমস্যাসমূহ নিরসনের নিমিত্তে স্বল্প পরিসরে যে এনজিও কার্যক্রমের যাত্রা

www.pathagar.com

শুরু হয় তা এখন আর শুধু ত্রাণ কার্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। বর্তমানে বাংলাদেশে এনজিও কার্যক্রম উন্নয়ন বিশেষ করে মানব সম্পদ উন্নয়নের এক শক্তিশালী কর্মসূচী হিসাবে বিকশিত হয়েছে। দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন কর্মতৎপরতার সাথে এনজিওসমূহ সামগ্রীকভাবে জড়িয়ে রয়েছে। ক্রমবর্ধমান এই এনজিও কার্যক্রমের বিকাশ ধারার একটি তুলনামূলক চিত্র নিম্নোক্ত ছকে তুলে ধরা হল:

ছক : ২(ক)

এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত বৎসর ভিত্তিক এনজিও সংখ্যা

ক্রমিক নং	বছর	দেশী	বিদেশী	মোট
১.	১৯৯১ পর্যন্ত	৩৯৫	৯৯	৪৯৪
২.	১৯৯১-৯২ পর্যন্ত	১২৭	১২	১৩৯
৩.	১৯৯২-৯৩ পর্যন্ত	৭৫	১৫	৯০
৪.	১৯৯৩-৯৪ পর্যন্ত	১৪৮	০৮	১৫৬
	মোট	৭৪৫	১৩৪	৮৭৯

ছক : ২(খ)

১৯৯০ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত এনজিওসমূহ কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্প সমূহের জন্য নির্ধারিত ব্যয়ের পরিমান

সময়কাল	অনুমোদিত অর্থের পরিমান	অনুমোদিত প্রকল্প
জুন'৯০ - ডিসেম্বর'৯০	২৭০,৩৮,৫৪,৩০৭/৭৫	২৩৮
জানু'৯১ - ডিসেম্বর'৯১	১১৮০,৪৯,০৪,৯৮২/৭৬	৫৯৩
জুন'৯০ - ডিসেম্বর'৯১	১৪৫০,৮৭,৫৯,২৯০/৫১	৮৩১
জানু'৯২ - ডিসেম্বর'৯২	১৪২৯,৯০,৪৫,৯৮৩/৭৭	৫৪০
জুন'৯০ - ডিসেম্বর'৯২	২৮৮০,৭৮,০৫,২৭৪/২৮	১৩৭১
জানু'৯৩ - ডিসেম্বর'৯৩	১৬৬,২১,৮১,৮৮৮/৩৪	৫৯০
জুন'৯০ - ডিসেম্বর'৯৩	৩৮৪৬,৯৯,৮৭,১৬২/৬২	১৯৬১
জানু'৯৪ - ডিসেম্বর'৯৪	২১১১,২২,৮৬,৯৯০/৫০	৫২৭
জুন'৯০ - ডিসেম্বর'৯৪	৬০৩৮,২২,৭৪,১৫৩/১৬	২৪২৮

(মোট : প্রায় ছয় হাজার কোটি টাকা)

www.pathagar.com

উপরোক্ত ছকে যেসমস্ত এনজিও কার্যক্রমের তালিকা সন্নিবেশিত করা হয়েছে সেগুলি শুধু এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর সাথে নিবন্ধীকৃত। এ ছাড়াও সমাজ সেবা অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং পরিবার পরিকল্পনা বিভাগসহ অন্যান্য সরকারী বিভাগের সাথে প্রায় ২০ সহস্রাধিক এনজিও নিবন্ধিত হয়ে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নিয়োজিত রয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ১৯৯০ সালে স্থাপিত পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন ইতোমধ্যে ১০৫টি বাংলাদেশী এনজিও'র মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে সরাসরি অবদান রাখছে। এ যাবৎ পিকে এসএফ ৪৩,৩৭,৮৯,৫০০০/- টাকা দারিদ্র্য বিমোচনে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় বিনিয়োগ করেছে।

এনজিও'র কর্মক্ষেত্র

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এনজিওসমূহ বর্তমানে যে তাৎপর্যপূর্ণ ও অর্থবহ ভূমিকা রাখছে তার ক্ষেত্র হচ্ছে-

(ক) **জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ:**

বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত জনবিস্ফোরণ নিরসনে এবং পরিকল্পিত পরিবার গঠনে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিশাল নিরক্ষর ও অসংগঠিত জনগোষ্ঠীর মাঝে যে কার্যক্রম চলছে এবং গণসচেতনতা সৃষ্টির যে কর্মসূচী বাংলাদেশ সরকার গ্রহণ করেছেন তা দেশে ও বিদেশে ইতোমধ্যেই ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। এক্ষেত্রে ইতোমধ্যে অর্জিত বিশাল সাফল্যে এনজিওসমূহ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে একথা সর্বজনবিদিত।

(খ) **বেকারত্ব দূরীকরণ:**

এদেশের প্রধানতম সমস্যা জনসংখ্যা বিস্ফোরণ রোধে প্রায়োগিক কার্যক্রম গ্রহণের পাশাপাশি আরেকটি অন্যতম প্রধান সমস্যা বেকারত্বে পতিত অগনন শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত সমাজের সম্মুখে চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টিসহ আত্মকর্মসংস্থানের যে টেকসই সম্ভাবনার দ্বার এনজিওরা উন্মোচন করেছে, তা বাংলাদেশের সামগ্রীক ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে সুদূর প্রসারী সুফল বয়ে আনবে একথা নির্দিধায় বলা যায়। বেকারত্বের এই সর্বব্যাপী অভিশাপ থেকে জাতিকে মুক্তিদানের মহান ব্রতে এনজিওসমূহ এ দু'টি উপায়ে প্রত্যক্ষভাবে বেকারত্ব দূরীকরণে সহায়তা প্রদান করছে:

(১) চাকুরী সৃষ্টি:

বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহ এদেশের বেকার লোকদের একটি বিরাট অংশকে চাকুরীতে নিয়োগদানের মাধ্যমে বেকার সমস্যার সমাধানে সুষ্ঠু ভূমিকা পালন করছে। দিন দিন যতই এনজিও'র সংখ্যা বাড়ছে ততই বেকার লোকদের

www.pathagar.com

কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি হচ্ছে। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, এ পর্যন্ত এনজিও সেক্টরে ২ লক্ষেরও বেশি লোক চাকুরী নিয়েছেন। এ সকল চাকুরীজীবীর এক বৃহৎ অংশ মহিলা।

(২) স্ব-কর্ম সংস্থান:

বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কেবল মাত্র চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। গ্রাম বাংলার আপামর দরিদ্র জনগোষ্ঠী যাদের একমাত্র সম্পদ কায়িক শ্রম তা পূর্বে বিক্রির ছিলোনা কোনো সুযোগ, ছিলো না সামান্য মূল্যধন, যা দিয়ে একটি জাল কিনে মাছ ধরে অথবা অন্য কোনো ছোট খাটো ব্যবসা পরিচালনা করে ঘরের অন্নের সংস্থান করা যায়। বেসরকারী সেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ এসব লোকদেরকে সামান্য পুঁজি প্রদান ও আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে বিধবা থেকে শুরু করে কামার, কুমার, তাঁতী, কৃষক, জেলে এরকম এককোটির বেশি লোককে দিয়েছে স্ব-কর্ম সংস্থানের সন্ধান। এর ফলে কম করে হলেও, ৩ থেকে ৪ কোটি লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হচ্ছে। মনে রাখা প্রয়োজন, এই বিশাল জনগোষ্ঠী পূর্বে জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূলধারার বাইরে অবস্থান করছিলো। এনজিওদের দেয়া সকল স্বল্প পুঁজি ও প্রশিক্ষণ এদেরকে অর্থনৈতিক মূলধারায় ফিরিয়ে নিয়ে আসার সুযোগ করে দিয়েছে।

(গ) শিক্ষা:

বাংলাদেশ সরকার 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচী ইতোমধ্যে হাতে নিয়েছে। সরকারী কর্মসূচীর পাশাপাশি বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহও শিক্ষাকর্মসূচীর প্রসার ঘটাচ্ছে ব্যাপকভাবে। এক হিসাবে দেখা গেছে বেসরকারী সংস্থাসমূহ প্রায় ১ লক্ষ স্কুল পরিচালনা করছে। এই ১ লক্ষ স্কুলে কম করে হলেও ৪০ লক্ষ ছেলে-মেয়েকে শিক্ষা দান করা হচ্ছে। তাছাড়াও এনজিও সমূহের রয়েছে বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচী যার মাধ্যমে বয়স্কদেরকে দেয়া হচ্ছে শিক্ষার আলো। ২০০০ সালের মধ্যে সার্বজনীন স্বাক্ষরতা অর্জনের জাতীয় অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করতে হলে প্রয়োজন হবে এনজিওদের সহায়তা, এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

(ঘ) বনায়ন:

বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীর মাধ্যমে পথে প্রান্তরে বিপুল পরিমান বৃক্ষরোপণ করছে। এ কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে তারা এক্ষেত্রে সরকারের জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন সহ দেশে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায়ও বিরাট ভূমিকা রাখছে।

(ঙ) স্বাস্থ্য:

বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার '২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য' পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এনজিওসমূহ শহর থেকে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা

www.pathagar.com

পৌঁছে দেয়ার কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। বেশ কিছু সংখ্যক এনজিও পরিবার পরিকল্পনা, কুষ্ঠরোগ নিরাময়, শিশু ও মায়ের সেবা ইত্যাদি কর্মসূচীর মাধ্যমে বিরাট এক জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বাস্থ্য সেবা ও বিনামূল্যে ঔষধ প্রদানের এক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেছে। ফলে এটা দাবী করা অসঙ্গত হবে না যে জাতির প্রধান সম্পদ 'মানব' উন্নয়নে এনজিওরা সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

(চ) **পানীয় জল:**

পানীয় জল সরবরাহের নিমিত্তে গ্রামের প্রতিটি অঞ্চলে নির্দিষ্ট দূরত্বে টিউবওয়েল স্থাপন ও স্বল্পমূল্যে ল্যাট্রিন স্থাপনে সরকার/ইউনিসেফ যৌথ ও সমান্তরাল কর্মসূচীর মাধ্যমে বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ বাংলাদেশ সরকারের 'সবার জন্য পানীয় জল' ও গ্রামীণ ল্যাট্রিন স্থাপন কর্মসূচী বাস্তবায়নে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে। বর্তমান বছরে বাংলাদেশে এনজিওরা গ্রামাঞ্চলে বিশ লক্ষ ল্যাট্রিন স্থাপন করবে এবং এর জন্য বাংলাদেশ সরকার থেকে ৪০ কোটি টাকা মূল্য ভর্তুকী হিসাবে মঞ্জুরী পাবে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এ কাজে সরকারের পক্ষে সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করবে।

(ছ) **ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র:**

বন্যাদূর্গত ও উপকূলীয় জলোচ্ছাসের কবল থেকে নিরাপদ আশ্রয় প্রদানের নিমিত্তে উপকূলীয় অঞ্চলে নির্মিত হয়েছে অনেক সাইক্লোন সেন্টার যার মাধ্যমে অসহায় ও আশ্রয়হীন মানুষকে দেয়া হয়েছে আপদকালীন আশ্রয়ের ব্যবস্থা। এনজিওরা এ পর্যন্ত উপকূলীয় জেলাসমূহে ২৭০টি বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন করেছে।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বর্তমান ধারাকে আরও বেগবান ও টেকসই রাখার লক্ষ্যে সরকারের ব্যাপক কার্যক্রমের পাশাপাশি এনজিওদের সক্রিয় ভূমিকা বাংলাদেশের সামগ্রীক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সুদূর প্রসারী ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে একথা এখন জোরের সাথেই বলা যেতে পারে। ❑

** বিয়াম'-এ অক্টোবর ১৫, '৯৫-এ সেমিনার-এ জনাব এম,এ মান্নান কর্তৃক উপস্থাপিত প্রবন্ধ থেকে সন্নিবেশিত।*

www.pathagar.com

এনজিও কার্যক্রম গ্রহণ : বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

এনজিও (Non Governmental Organization) হচ্ছে বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। এ বিবেচনায় সরকারের নির্দিষ্ট বিধিবদ্ধ আইন দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অলাভজনক সকল প্রতিষ্ঠানকেই এনজিও বলা চলে।

এনজিও সমূহকে সাধারণত: দু'ভাগে ভাগ করা যায়:
(১) বিদেশী ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট বাংলাদেশী এনজিও এবং
(২) স্থানীয় এনজিও।

বিদেশী ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট বাংলাদেশী এনজিও. সমূহ বৈদেশিক অর্থ দ্বারা তাদের প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। বিদেশী এনজিওর প্রধান অফিস বিদেশে অবস্থিত। এদেশে একজন কান্ট্রি ডাইরেক্টর/প্রতিনিধি (বিদেশী/দেশী) দ্বারা সংস্থাটি পরিচালিত হয়। বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট বাংলাদেশী এনজিও সমূহ নির্বাহী কমিটি দ্বারা পরিচালিত হয়। বিদেশী ও বৈদেশিখ সাহায্যপুষ্ট এনজিওর সংখ্যা বর্তমানে ৯৯২টি। তন্মধ্যে বিদেশী এনজিওর সংখ্যা ১৩৮টি এবং দেশীয় এনজিও'র সংখ্যা ৮৫৪টি। ২য় প্রকারের এনজিও (স্থানীয় এনজিও) যারা বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট নয়, এরূপ এনজিও'র সংখ্যা পনের হাজার (১৫,০০০)-এর অধিক। এর সঠিক পরিসংখ্যান জানা সম্ভব হয়নি।

এনজিও কার্যক্রমে আইনগত অবস্থান:

বিদেশী ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট বাংলাদেশী এনজিও'রা প্রধানত: 'The Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Ordinance 1978 ও The Foreign Contribution (Ordinances' 1982)-এর অধীনে প্রণীত রুলস দ্বারা পরিচালিত। এই এনজিও সমূহের কার্যক্রম এনজিও বিষয়ক ব্যুরো সমন্বয় করে থাকে। স্থানীয় এনজিও সমূহ The Voluntary Social Welfare Agencies Registration & Control Ordinance, 1961-এর বিধান অনুসারে নিয়ন্ত্রিত এবং সরকারের সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তর এদের কার্যক্রম সমন্বয় করে থাকে। এ ছাড়াও বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ তাদের কাজের স্বরূপ অনুযায়ী বিভিন্ন আইনের আওতায় নিবন্ধন লাভ করে। এ সম্পর্কিত দেশে বিদ্যমান আইনগুলো হলো-

ক) The Societies Registration Act, 1860.
খ) The Company Act (Sec-26).

ক-এর ক্ষেত্রে বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ রেজিষ্ট্রার কোম্পানী এবং
খ-এর ক্ষেত্রে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

প্রকল্প

প্রকল্প হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে পরিকল্পিত ও

www.pathagar.com

উদ্ভাবনী কর্ম সম্পাদনের বাস্তব পরিকল্পনা। আজকাল অনেক এনজিও প্রকল্প ও প্রোগ্রামকে এক করে দেখছে। প্রকল্প এবং প্রোগ্রামের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। প্রকল্প নির্দিষ্ট এবং অল্প সময়ের (২/৩বৎসর) মধ্যে সম্পাদন সম্ভব এমনসব কর্মকান্ড। অন্যদিকে প্রোগ্রাম হচ্ছে দীর্ঘ সময়ব্যাপী পরিকল্পিত ও বাস্তবায়নযোগ্য কর্মসূচী। এনজিওদের কর্মকাণ্ড প্রকল্পের আওতায় সীমাবদ্ধ।

ব্যবস্থাপনা

সহজকথায় বলতে গেলে ব্যবস্থাপক কিভাবে তাঁর সংস্থার কাজের ব্যবস্থা করেন তাই ব্যবস্থাপনা। সংজ্ঞাকারে বলা যায়, ব্যবস্থাপনা বলতে সংশ্লিষ্ট সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনকে বুঝায়।

মুলত: প্রকল্প প্রণয়ন, আর্থিক শৃংখলা নিশ্চিতকরণ, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা অনুষ্ঠান প্রকল্প বাস্তবায়ন ইত্যাদি বিষয়গুলির সুবিন্যস্ত পরিকল্পনাই হচ্ছে ব্যবস্থাপনা। সফল প্রকল্প ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যে সমস্ত পদক্ষেপ বর্তমানকালে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে অনুসরণ করা হচ্ছে তা এ ধরনের একটি শব্দ দ্বারা- অভিহিত করা হয়। শব্দটি হচ্ছে 'P O S D C C O R B'

P-(Planning)	পরিকল্পনা
O-(Organizing)	সংগঠন
S-(Staffing)	কর্মী নিয়োগ
D-(Directing)	নির্দেশ প্রদান
C-(Conrtolling)	নিয়ন্ত্রণ
CO-(Co-ordinating)	সমন্বয়সাধন
R-(Reporting)	প্রতিবেদন
B-(Budgeting)	বাজেট প্রণয়ন

প্রকল্প ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যথাযথ নির্দেশনা প্রদান এবং সঠিক নিয়ন্ত্রণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। যাদেরকে নির্দেশ দেয়া হবে এবং নিয়ন্ত্রণ করা হবে তাদেরকে মানসিকভাবে এবং কৌশলগত দিকে থেকে প্রস্তুত করতে হবে। অর্থাৎ প্রশিক্ষণ দিতে হবে। প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। এ কারণে সরকারের ন্যায় এনজিও সমূহ বর্তমানে প্রশিক্ষণ-কর্মশালার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। ছোট ছোট এনজিও সমূহ এই প্রশিক্ষণখাতে তহবিলের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যয় করে থাকে।

প্রকল্প প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা

সরকারী পর্যায়ে প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশন সম্প্রতি (PPP) পিপিপি (People's Participatory Planning) পদ্ধতি অনুসরণ করার জন্য প্রস্তাব করেছে। তবে চিরায়ত পদ্ধতি অনুসারে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ Sectoral Planning পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। এ পদ্ধতিতে মুলতঃ মন্ত্রণালয় বা বিভাগই প্রকল্প প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

www.pathagar.com

সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় তাদের নিজস্ব পরিকল্পনা উইং-এর মাধ্যমে প্রকল্প প্রণয়ন করে প্রকল্প প্রস্তাব (PP) পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করে। পরিকল্পনা কমিশন ফিজিবিলিটি স্টাডি করে প্রকল্পের বরাদ্দ যুক্তিযুক্ত যাচাইয়ের জন্য সরকারের আইএমইডি বিভাগে প্রেরণ করে। পরবর্তীতে এই পিপি, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)-এ প্রেরণ করা হয় (বিদেশী সাহায্যের প্রয়োজন হলে)। ইআরডি প্রকল্পের আর্থিক উৎস. প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে এর প্রভাব ইত্যাদি বিবেচনা করে সম্মত হলে প্রকল্পের ব্যাপারে 'প্রি একনেক' এবং পরবর্তীতে প্রকল্প বরাদ্দ ১০ কোটি টাকার বেশী হলে একনেক-এ আলোচিত হয়। 'একনেক'-এ অনুমোদিত হলে উদ্যোগী মন্ত্রণালয় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করে। মন্ত্রণালয় তা পরিবীক্ষণ ও মুল্যায়ন করে।

এনজিও ক্ষেত্রে

এনজিও সমূহ প্রকল্প প্রণয়নে বিভিন্ন দিক লক্ষ্য রাখে। নিবন্ধিত এনজিও সমূহকে তাদের আর্থিক কর্মকান্ডের পরিমাণ বিবেচনা করে ৩টি ভাগে চিহ্নিত করা যায়।

(ক) ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কর্মকান্ড সম্পন্ন এনজিও গুলোকে ছোট।

(খ) ২৫ লক্ষ টাকা হতে ১ কোটি টাকা পর্যন্ত কর্মকান্ড সম্পন্ন এনজিও সমূহকে মাঝারী এবং

(গ) তদুর্দ্ধ এনজিও সমূহকে বড় এনজিও হিসাবে ধরা যায়। এদের সংখ্যা হচ্ছে-

ছোট এনজিও - ৪৮৪ টি

মাঝারি এনজিও- ২৩১ টি

বড় এনজিও - ২৭০ টি

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকার উর্দ্ধে কর্মকান্ড সম্পন্ন এনজিও.র সংখ্যা ১৭ টি। তন্মধ্যে বিভিন্ন প্রকল্পে ১০০ (একশত) কোটি টাকার বেশী বাস্তবায়নরত এনজিও'র সংখ্যা ৭ টি। এ ধরনের সংস্থাগুলো হচ্ছে-

৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকার উর্দ্ধে বাস্তবায়নরত সংস্থাসমূহ:

1. ASA
2. BRAC
3. CARE
4. CARITAS
5. Concern-Bangladesh
6. Centre for Development Services
7. CCDB
8. Christian Service Society
9. Community Health Care Project
10. Family Planning Asso.of Bangladesh

www.pathagar.com

11. Gono Shasthya Kendra
12. Proshika
13. RDRS
14. UCEP
15. Ideas International
16. Institute of Integrated Rural Dev.
17. World Vision

১০০ (একশত) কোটি টাকার উর্দ্ধে বাস্তবায়নরত সংস্থাসমূহ:

1. BRAC
2. CARE
3. CARITAS
4. Gono Shasthya Kendra
5. Proshika
6. RDRS
7. World Vision

প্রকল্প প্রণয়নে ছোট এনজিও সমূহের নিজস্ব কোনো স্থির লক্ষ্য মাত্রা (Set Goal) নেই। কেননা ছোট এনজিও গুলোর প্রকল্প দাতা তাড়িত (Donor Driven) হয়ে থাকে। তারা মাঝারি ও বড় এনজিও সমূহের প্রকল্প প্রণয়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে। মাঝারি ও বড় এনজিও গুলো প্রকল্প প্রণয়নে প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে থাকে। বড় বড় এনজিও গুলো পরবর্তীতে অনুরূপ প্রকল্প প্রণয়নে সম্পাদিত প্রকল্পের খুঁটিনাটি যাচাই করে ফিডব্যাক করে থাকে ও পুনঃপরিকল্পনা করে। প্রকল্প প্রণয়নকালে সম্ভাব্য পদক্ষেপগুলো একটি ছকে দেখা যেতে পারে।

প্রকল্পের ছক :জীবন চক্র

Identification -> Planning -> Implementation -> Monitoring and Evaluation -> Feed back and Replanning.

সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় প্রকল্প প্রণয়নকালে যে সমস্ত বিষয়ে বিশেষ জোর দিয়ে থাকেন তা SMART শব্দ দ্বারা অভিহিত করা যায়।

S = Specific M = Measurable A = Achievable R = Realistic T = Timed	প্রকল্পটি নির্দিষ্ট ও বাস্তবসম্মত হতে হবে। লক্ষ্য হাসিল করা যাবে এবং পরিমাপ করা যাবে। এমন প্রকল্প হতে হবে। নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে সম্পন্ন হতে হবে।

ইদানীং এনজিও'রা প্রকল্প প্রণয়নকালে এ সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখছে।

www.pathagar.com

দাতা সংস্থা

প্রায় ৮৪ টি দাতা সংস্থা এদেশে এনজিওদের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সাহায্য করছে। দাতা সংস্থার মধ্যে WB, E.E.C, USAID, GERMAN GOVT, CIDA, FORD FOUNDATION, PATH FINDER, ADB, ASIA FOUNDATION, NORAD, PACT উল্লেখযোগ্য।

এনজিও কার্যক্রম

বর্তমানে এনজিও কর্মকান্ডে বহুধা মাত্রা সংযোজন হয়েছে। স্বাধীনতার পূর্বে বহুকাল থেকেই (কোনো কোনো ক্ষেত্রে ১৯৬৫ সন থেকে) দেশী ও বিদেশী বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ (এনজিও) বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

প্রাথমিক পর্যায়ে সংস্থাসমূহ প্রধানতঃ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এবং স্বাধীনতার প্রাক্কালে ও অব্যবহিত পরে দুর্যোগোত্তর ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের মধ্যে এদের কার্যক্রম সীমিত রাখে। পরবর্তীতে তা দরিদ্র জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ব্যাপৃত হয় এবং স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষাসহ দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান, সমাজ কল্যাণ এবং গণ উন্নয়নমূলক ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে এনজিওসমূহ ১৮টি ক্ষেত্রে কাজ করছে। এনজিও কর্মকান্ডে বিভিন্ন মাত্রা সংযোজনের ফলে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বিভিন্ন এপ্রোচ/দৃষ্টিভংগী উদ্ভাবিত হয়েছে। যেমন জার্মান সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে GOPP (Goal Oriented Project Planning) এবং ইউএসএইড সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে LFWA (Logical Frame Work Approach) অনুসরণ করা হচ্ছে।

এনজিও সমূহ প্রকল্প প্রণয়ন করে দাতা সংস্থার নিকট পেশ করে। দাতা সংস্থা প্রকল্প পর্যালোচনা করে প্রকল্পে বরাদ্দ প্রদানে রাজী হলে সংস্থাকে (এনজিও) একটি সম্মতি পত্র দেয়। সংস্থা তখন নির্ধারিত ফর্মে (এফডি-৬) ঐ প্রকল্প ও সম্মতিপত্র ব্যুরোতে দাখিল করে।

প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থ ছাড়ে ব্যুরোর করণীয়

ব্যুরো দাখিলকৃত প্রকল্প পর্যালোচনা করে। এনজিও সমূহের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এসকল নীতিমালা অনুসৃত হয়:

(ক) সরকারী নীতি বা জাতীয় নিরাপত্তার পরিপন্থী না হলে উন্নয়ন কর্মকান্ডে এনজিওদের অংশগ্রহণকে উৎসাহ প্রদান করা হয়,

(খ) এনজিও সমূহ যাতে সরকারের আইন ও নীতিমালার গন্ডীর মধ্যে তাদের নিজ নিজ কার্যপ্রণালী সুষ্ঠুভাবে অনুসরণ করে কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে পারে তা নিশ্চিত করা হয়,

(গ) সরকারের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প অথবা এর সুনির্দিষ্ট অংশ এনজিও-র মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়।

এ ছাড়াও ব্যুরো দাতা সংস্থার সম্মতিপত্র এবং অর্থের পরিমাণ, বাজেট বরাদ্দের সাথে

www.pathagar.com

দাতা সংস্থার প্রতিশ্রুতিপত্রের সামঞ্জস্যতা, প্রকল্প এলাকা, প্রকল্প ব্যয় ও প্রশাসনিক ব্যয়ের আনুপাতিক হার (১০ঃ ১), কর্মী নিয়োগ পদ্ধতি, ঘূর্ণায়মান কর্মসূচীর ক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জ আদায়ের হার এবং আদায়কৃত টাকার ব্যবহার পদ্ধতি, উপকৃত লোকের সংখ্যা, ইত্যাদি বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়। সংস্থা কর্তৃক পূর্বে সম্পাদিত অনুরূপ প্রকল্পের ক্ষেত্রে পূর্ব প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন, নিরীক্ষা প্রতিবেদন মুল্যায়ন করা হয়। কোনো নূতন ধারণার প্রকল্পের ক্ষেত্রে (যেমন AIDS সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি) সংস্থাকে ব্রিফিং দিতে বলা হয়। ব্রিফিং কালে ব্যুরোর সকল কর্মকর্তা উপস্থিত থাকেন। ব্যুরো কর্তৃক পর্যালোচনার পর প্রকল্পের ব্যাপারে মতামতের জন্য প্রকল্প প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয়ের মতামত পাওয়ার পর ব্যুরো সংস্থাকে প্রকল্পের অনুমোদন জ্ঞাপন করে।

মন্ত্রণালয়ের মতামত ব্যুরো গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে এবং প্রকল্প অনুমোদন পত্রে শর্ত হিসাবে উল্লেখ থাকে। মন্ত্রণালয়ের আপত্তি বা পরিবর্তনের কারণ পর্যালোচনা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার পর তা অগ্রহণযোগ্য মনে হলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করে প্রকল্প অনুমোদন করা হয়। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো প্রযোজনবোধে প্রস্তাবিত প্রকল্প পরিবর্তন বা সংশোধন করে তা অনুমোদন করে। তবে অনুরূপ ক্ষেত্রে দাতা সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট এনজিও এর মতামত ও সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করা হয়। প্রকল্পের অনুমোদনসহ অনুমোদনের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও টিএনও কে দেয়া হয়।

সংস্থা প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্তে অর্থ ছাড়ের জন্য ব্যুরোতে নির্ধারিত ফর্ম (এফডি-২) দাখিল করে। ব্যুরো অর্থ ছাড়পত্র প্রদান করে। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক এনজিও বৈদেশিক টাকা গ্রহণ করার জন্য ১ টি মাত্র ব্যাংক হিসাব নাম্বার থাকে। সেই হিসাব নাম্বার থেকে অর্থ উঠানোর অনুমতি দেয়া হয়ে থাকে। একাধিক বর্ষী প্রকল্পের ক্ষেত্রে কিস্তি হিসাবে অর্থ ছাড় করা হয়। পূর্বের বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে পরবর্তী কিস্তি প্রদান করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বাস্তবায়ন প্রতিবেদন সংস্থাকে ব্যুরোতে দাখিল করতে হয়।

প্রকল্প বাস্তবায়নে বিদেশী এনজিও সমূহ এবং কোন কোন দেশীয় এনজিও বিদেশী বিশেষজ্ঞ নিয়োগের প্রস্তাব নির্ধারিত ফর্ম (এফডি-৯) এর মাধ্যমে ব্যুরোতে দাখিল করে। ব্যুরো এই প্রস্তাবের উপর মতামতের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। উল্লেখ্য যে, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে যথাযথ যোগ্যতা সম্পন্ন না হলে কোন ব্যক্তিকে বিশেষজ্ঞ হিসাবে নিয়োগ করা হয় না। বর্তমানে এনজিও সেক্টরে মোট ৪১৬ জন বিশেষজ্ঞ কাজ করছেন।

এনজিও সম্পর্কিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে ব্যক্তি বিশেষ এককালীন (পাঠাগার উন্নয়ন, বিদ্যালয় নির্মাণ, সেমিনার, প্রশিক্ষণ, শিক্ষা সফর, প্রশিক্ষণ সামগ্রী, চিকিৎসা সামগ্রী গ্রহণ) অনুদান গ্রহণ করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে এফডি আইনে নিবন্ধিকৃত এনজিও-র ক্ষেত্রে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। কোন অবস্থাতেই সরকারের অনুমোদন ব্যতিরেকে বিদেশী অনুদান গ্রহণ করা আইন সঙ্গত নয়।

www.pathagar.com

বিশেষ করে, এনজিও দেরকে পূর্বের মতো সরকারের বিভিন্ন সংস্থার সাথে তাদের কাজের জন্য তদবির করার প্রয়োজন হয় না। সংস্থার নিবন্ধন, প্রকল্প অনুমোদন, অর্থ ছাড়করণ, বিশেষজ্ঞ নিয়োগ, পুনর্বাসন প্রকল্প, জুরুরী ত্রাণ ব্যবস্থা সকল প্রকার কার্যাবলীর জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা আছে। যার আওতা হচ্ছে

বিষয়	মন্ত্রণালয়ের মতামতের জন্য সময় সীমা	ব্যুরোর পর্যালোচনার জন্য সময় সীমা	মোট সময় সীমা
নিবন্ধনের ক্ষেত্রে	৬০ দিন	৩০ দিন	৯০ দিন
প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষেত্রে	২১ দিন	২৪ দিন	৪৫দিন
পুনর্বাসন প্রকল্পের ক্ষেত্রে	১৪ দিন	৭দিন	২১ দিন
দুর্যোগোত্তর তাৎক্ষণিক	-	২৪ ঘন্টা	২৪ ঘন্টা
কর্মসূচীর ক্ষেত্রে	-	-	-
বিশেষজ্ঞ নিয়োগের ক্ষেত্রে	২৫ দিন	২৫দিন	৫০ দিন

এ সকল কার্যক্রম ব্যুরো নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন করে থাকে।

এনজিও বিষয়ক ব্যুরো সম্পর্কিত

১৯৯০ সনে ব্যুরো সৃষ্টি কালে নিবন্ধিত এনজিও সংখ্যা ৩৮২টির স্থলে বর্তমানে সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯৯২টি। তখনকার সময়ে ৮টি সেক্টরে ২৩৮টি প্রকল্প সংখ্যার তুলনায় বর্তমানে ১৮টি সেক্টরে ৭০৭টি প্রকল্পের কাজ চলছে। সেক্টরওয়ারী এনজিও সংখ্যা, প্রকল্প সংখ্যা সংলগ্নি-১ সন্নিবেশিত রয়েছে। ব্যুরো সৃষ্টির বছরে ২৩২ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছিলো। এ বছর ৪৮৮ কোটি ছাড় করা হয়েছে। ব্যুরোর সৃষ্টির পর বৎসর ওয়ারী অনুমোদিত প্রকল্পের সংখ্যা, অনুমোদিত অর্থের পরিমাণ ও অর্থ ছাড়ের পরিমাণ দেখানো হলো সংলগ্নি-২-এ। ব্যুরোর জনবল পূর্বের ৬৬ জনের পক্ষে এত অধিক পরিমাণ কাজ সুষ্ঠু সমন্বয়ে ব্যুরোকে বেগ পেতে হচ্ছে। এ বিবেচনায় ব্যুরোর জনবল আরও ২৬ জন বৃদ্ধির প্রস্তাব সরকারের গঠিত নুরুন্নবী কমিটিতে সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে। সাথে সাথে ব্যুরোর আনুসাঙ্গিক সুবিধাদি (Logistic Support) বৃদ্ধি করার যুক্তিযুক্ত কারণও রয়েছে। এ প্রসংগে ব্যুরো সৃষ্টির পটভূমি উল্লেখ প্রয়োজন।

এনজিও কার্যপ্রণালী সহজতর করে এক ধাপে এনজিওদেরকে বিভিন্ন প্রকারের সরকারী অনুমোদন প্রদান, এনজিও কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন এবং সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সরকার তৎকালীন রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের অধীনে (বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো নামে অধিদপ্তর গঠন করে।

এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর দায়িত্বে একজন মহাপরিচালক আছেন এবং ব্যুরো বিদেশী ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট এনজিও দের জন্য সরকারের অন্যতম সংযোগস্থল হিসাবে কাজ করছে।

www.pathagar.com

প্রকল্প বাস্তবায়ন

ব্যুরো কর্তৃক প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থ ছাড়ের পর সংস্থা প্রকল্প বাস্তবায়নে মনোনিবেশ করে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় বিধৃত থাকে। সংস্থা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনকে অবহিত রেখে প্রকল্প বাস্তবায়ন করে।

পরিবীক্ষণ ও মুল্যায়ন

প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে প্রকল্পের যথাযথ উদ্দেশ্য হাসিল হল কিনা তা পরিবীক্ষণ ও মুল্যায়নের মাধ্যমে অবহিত হওয়া যায়। সরকারী প্রকল্পের ক্ষেত্রে সরকারের আই এম ই ডি বিভাগ মুল্যায়ন করে থাকেন। এনজিও সমূহ ইদানিং প্রশ্ন উত্তর পদ্ধতির পরিবর্তে PRA (Participatory Rural Appraisal)-এর মাধ্যমে মূল্যায়নকে অত্যাধিক ফলপ্রসূও গ্রহণযোগ্য বলে মনে করছে। এতে উপকারভোগী অর্থাৎ যাদের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়িত হল তাদের সাথে থেকে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করে প্রকল্পের সফলতা জানা সম্ভব। এই পদ্ধতির ব্যাপক প্রসারে ও জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে SDC এর Prompt নামীয় প্রকল্পটি এবং GTZ প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখছে।

হিসাব পরিদর্শন ও নিরীক্ষা

দি ফরেন ডোনেশন (ভলান্টারী এক্টিভিটিজ) রেগুলেমন অর্ডিন্যান্স ১৯৭৮ এর ৪ ও ৫ ধারা অনুসারে সংস্থা সমূহের হিসাব নিরীক্ষা ও পরিদর্শন করার ক্ষমতা এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে প্রদান করা হয়েছে।

এনজিওসমূহের বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষণের জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বাংলাদেশ চ্যাটার্ড একাউন্ট্যান্স অর্ডার ১৯৭৩ অনুসরণে চ্যাটার্ড একাউন্টস গণের একটি তালিকা প্রস্তুত করে। বর্তমানে ১৩৪টি ফার্মকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এনজিও সমূহ তালিকাভুক্ত চ্যাটার্ড একাউনট্যান্ট দ্বারা সংস্থার হিসাব নিরীক্ষা করে থাকে এবং সংস্থা প্রকল্প ব্যয় থেকে নিরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহ করে থাকে।

অভিযোগ উত্থাপিত হলে

এনজিও কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে ব্যুরো কর্তৃক তদন্ত করা হয়। এছাড়া সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক তদন্ত করে তদন্ত প্রতিবেদন ব্যুরোতে প্রেরণ করেন। প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়ম, অর্থ আত্মসাত প্রমাণিত হলে এবং আইন ভংগ করলে ব্যুরোর পরিচালক মহাপরিচালকের অনুমোদনক্রমে অধ্যাদেশের (৬১) ও ৬ (১) ধারা বলে নিবন্ধন বাতিল, প্রকল্পের কার্যক্রম বন্ধ এবং আদালতে মামলা দায়ের করে থাকেন। উল্লেখ এ যাবৎ বিভিন্ন কারণে ৩৪টি এনজিও'র নিবন্ধন বাতিল করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১০টি বিদেশী এবং ২৪টি দেশীয় এনজিও।

সমন্বয় সাধন

এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এনজিও কার্যক্রম সার্বিক সমন্বয় করে থাকে। মাঠ পর্যায়ে ব্যুরোর

www.pathagar.com

কোন অফিস নেই। বিভাগীয় কমিশনারগণ তাদের বিভাগের মধ্যে কর্মরত এনজিও সমূহের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় করেন। জেলা প্রশাসকগণ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর পক্ষে তাদের নিজ নিজ এলাকার এনজিও'দের কার্যক্রম পরিবীক্ষণের দায়িত্ব পালন করছেন। জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকগণ প্রতিমাসের সমন্বয় সভায় জেলার এনজিও সমূহের কর্মকান্ড পর্যালোচনা করেন এবং কার্য বিবরণী ব্যুরোকে অবহিত করছেন। এনজিওদের দাবীর প্রেক্ষিতে জেলা পর্যায়ের সমন্বয় সভায় এনজিওদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে।

সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচীতে এনজিও'রা সম্পূরক ও পরিপূরক ভূমিকা পালন করছে এবং নিজস্ব উদ্যোগে সরকারী কর্মসূচীর আলোকে বিভিন্ন কর্মসূচী সংযোজন করছে। সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে এনজিও কার্যক্রমে সুষ্ঠু সমন্বয় প্রয়োজন। এই বিশাল উন্নয়ন কর্মকান্ডে জেলা প্রশাসনকে অধিকতর সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে প্রতি জেলায় একটি এনজিও সেল গঠন করে এবং এই সেলের দায়িত্বে একজন সহকারী কমিশনারকে নিয়োগ করার পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

এনজিও সফলতার ইতিহাস

কয়েকটি সেক্টরে এনজিওরা সফল হয়েছে এবং জনমনে প্রশংসিত হচ্ছে। এর আওতায় রয়েছে:

১। প্রাথমিক শিক্ষা,
২। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম,
৩। পরিবার পরিকল্পনা,
৪। সামাজিক বনায়ন,
৫। সেনিটেশন,
৬। প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা,
৭। নারীর ক্ষমতায়ন প্রসংগ এবং নারীর অধিকার সংরক্ষণে সচেতনতা বৃদ্ধি,
৮। ইপিআই কর্মসূচী,
৯। ত্রাণ ও পুনর্বাসন,
১০। রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন।

বিশেষভাবে বিবেচনার দাবীদার:

কিছু কিছু এনজিও'র সেবামূলক মনোভাব থেকে ভিন্নতর ভাবনা প্রসার ঘটায় এনজিও কার্যক্রমকে সমালোচনার সম্মুখীন করেছে।

১। বড় বড় এনজিও দের কমিউনিটি পার্টিসিপেশন কমে যাচ্ছে,
২। প্রশাসনিক ব্যয় ক্রমান্বয়ে বাড়ছে,
৩। স্থায়ী অবকাঠামো ও নিজস্ব সম্পদ সৃষ্টির ঝোক বাড়ছে,

www.pathagar.com

৪। পকেট কমিটি সর্বস্ব এনজিও দের জবাবদিহিতা থাকছে না,

৫। এনজিও অবকাঠামো বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ফলে প্রশাসনে স্তর বাড়ছে এবং সংযোগ কমছে। সেবার মনোভাব কমে আমলাতান্ত্রিক ভাব বেশী হচ্ছে।

এনজিও কার্যক্রম সহজতর করার লক্ষ্যে ব্যুরোর এ সকল ইতিবাচক পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে-

১। নিবন্ধনের ক্ষেত্রে সময় সীমা ১২০ দিনের স্থলে ৯০ দিন করা হয়েছে। প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষেত্রে ৬০ দিনের স্থলে ৪৫ দিন এবং বিশেষজ্ঞ নিয়োগের ক্ষেত্রে ৬০ দিনের স্থলে ৫০ দিন করা হয়েছে,

২। বিশেষজ্ঞ নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি চিঠি স্পেশাল ব্রাঞ্চে বিলম্বজনিত কারণে বিশেষজ্ঞ নিয়োগের জটিলতা দেখা দিতো। বর্তমানে ব্যুরোর চিঠিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চিঠির উল্লেখ থাকলে তা গ্রহণযোগ্য হচ্ছে,

৩। জরুরী ত্রাণ কর্মসূচী প্রকল্প দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সহিত যোগাযোগের পরিবর্তে ব্যুরো ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রকল্প অনুমোদন, অর্থ ও সামগ্রী অবমুক্তি আদেশ জারী করে থাকে,

৪। প্রকল্প অনুমোদন, অর্থ ছাড়করণ সহজতর করার পদক্ষেপ হিসাবে ব্যুরো নিবন্ধিত সংস্থার ক্ষেত্রে প্রকল্প ও অর্থ ছাড়ের বিষয়টি একই সাথে বিবেচনা করে। নিবন্ধন প্রাপ্ত নয় এমন সংস্থার ক্ষেত্রেও একই সাথে বিষয় দুইটি প্রসেস করে নিবন্ধন লাভের সাথে সাথেই প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থ ছাড় করা হয়,

৫। দাতা সংস্থা কর্তৃক বরাদ্ধকৃত অর্থ তামাদি হতে পারে এরূপ ক্ষেত্রে প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বে ব্যুরোর অনুমতিক্রমে অর্থ ব্যবহার করতে পারবেনা এই শর্তে সংস্থাকে তার ব্যাংক হিসাবে টাকা জামা রাখার অনুমতি প্রদান করা হয়,

৬। প্রকল্পে উপকারভোগীদের জন্য ঋণদান কর্মসূচী অন্তর্ভূক্তির ব্যাপারে ব্যুরো এনজিও দেরকে উৎসাহ দিয়েছে,

৭। প্রতিটি এনজিও এর সম্পাদিত ও বাস্তবায়নরত প্রকল্প এবং আর্থিক সংশ্লেষসহ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্বলিত একটি ডাইরেক্টরী ১৯৯৩ সনে প্রকাশ করা হয়েছে, ২য় ডাইরেক্টরী অল্প কয়েকদিনের মধ্যে প্রকাশ করা হবে।

ব্যুরোর প্রত্যাশা

১। জনবল স্বল্পতার কারণে এনজিও কর্মকান্ডে কার্যকরী মূল্যায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে সমালোচিত এনজিও দের কর্মকান্ডের সঠিক চিত্র জনগণ অবহিত হচ্ছে না। ব্যুরো সাধারণ প্রকল্প সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি এবং এনজিও সমূহের সমন্বয়ে মূল্যায়নের ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে,

২। এনজিও দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আচরণবিধি ও সাধারণ নীতিমালা প্রণয়নে কোন কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করা হয় নি,

৩। দারিদ্র্য বিমোচনসহ এনজিও সমূহের সফল প্রকল্প সম্পর্কে ব্যুরোর রিপোর্টিং থাকা বাঞ্চনীয়,

www.pathagar.com

৪। এন.জি. ও সমূহের সফল প্রকল্পের ক্ষেত্রে স্বীকৃত প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

জিও-এনজিও সম্পর্ক

১৯৮৭-৮৮ সালে সরকারী বেসরকারী যৌথ উদ্যোগে সরকারের গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প প্রণয়ন ও সফল বাস্তবায়ন হয়। বর্তমানে এ সকল আদর্শ গ্রাম প্রকল্প হিসাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প। এই প্রকল্প বাস্তবায়নে দেশে-বিদেশে বেশ প্রসংশিত হয়েছে।

বর্তমানে সরকারের উপানুষ্ঠানিক কার্যক্রম, সেনিটেশন প্রোগ্রাম, সামাজিক বনায়ন ও পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচী, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্য্যা কর্মসূচী, আরএমপি, ভিজিডি কর্মসূচী ইত্যাদি সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা সমূহের যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

জিও-এনজিও সম্পর্ক অধিকতর বৃদ্ধি করণের লক্ষ্যে এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় সরকারের ১৮ লক্ষ টাকাসহ মোট ১৪৮ লক্ষ টাকার একটি দ্বি-বার্ষিকী প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। প্রকল্পের মুখ্য বিষয়গুলো হচ্ছে-

ক) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো শক্তিশালী করণ,

খ) এনজিও ব্যক্তিবর্গকে দেশে বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান,

গ) গুরুত্বপুর্ণ এনজিও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্পর্কে অধিকতর ধারণা লাভের জন্য সরকারী কর্মকর্তাকে ঐসব প্রকল্প সাময়িক প্রতিস্থাপন,

ঘ) জিও-এনজিও সম্পর্কিত কোন বিষয়ে মত্যৈকে পৌছানোর লক্ষ্যে GNCC (Government-NGO Consultation Counsel) গঠন,

ঙ) প্রকল্পের উদ্দেশ্য সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে ১৪ সদস্য (সরকার পক্ষ ৮ জন, এন.জি. ও পক্ষ-৬ জন) বিশিষ্ট একটি JWG (Joint Working Grop) কাজ করছে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক এই গ্রুপের সদস্য সচিব হিসেবে কাজ করছেন।

এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এনজিও কার্যক্রমে ফেসিলিটেটর হিসাবে কাজ করছে। এনজিও কার্যক্রম আরও সহজতর করার লক্ষ্যে এনজিও সমূহের যুক্তিযুক্ত প্রস্তাব সরকারের সুবিবেচনার জন্য ব্যুরো সর্বদা সচেষ্ট। সামগ্রিক আর্থিক-সামাজিক উন্নয়নের বর্তমান ধারা আরো বেগবান ও টেকসই করার লক্ষ্যে ব্যুরো এনজিও'র ন্যায়ানুগ কার্যক্রমে সর্বাত্মক উৎসাহ ও সহযোগিতা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

** 'বিয়াম'-এ ডিসেম্বর ১২,'৯৫-এ জনাব মোঃ মমিনুল হক ভূঞা কর্তৃক উপস্থাপিত প্রবন্ধ থেকে সন্নিবেশিত।*

www.pathagar.com

Number of NGOs Working in Different Sectors (1992- 1993)

Sl. No.	Name of the Sector Projects	Number of NGOs Working	Number of
01.	Agricul,ture	80	31
02.	Child Home & Orphanage	22	20
03.	Cultural Activities & Human	82	69
04.	Disaster Management Rehabilitation	79	50
05.	Education	238	114
06.	Environment & Forest	45	36
07.	Family Welfare	154	126
08.	Fisheries & Livestock	29	20
09.	Health	171	134
10.	Income Generation	185	150
11.	Infrastructure Development	37	26
12.	Legal Aid	22	17
13.	Prevention of Drug Abasement *	01	01
14.	Primary & Mass Education	103	90
15.	Rural & Urban Development	172	128
16.	Water Supply & Sanitation	27	22
17.	Women in Development	76	63
18.	youth Development **	02	02

* Only CARITAS Doing these Activites.

** CARITAS & Jubo Aeademy Doing these Activities

www.pathagar.com

এক নজরে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মাধ্যমে প্রাপ্ত বিদেশী অনুদান সংক্রান্ত তথ্য

(ক্যালেন্ডার বছর অনুযায়ী)

সময়কাল	অনুমোদিত অর্থের পরিমান (টাকা)	ছাড়কৃত অর্থের পরিমান (টাকা)	অনুমোদিত প্রকল্প সংখ্যা
জুন '৯০ ডিসেম্বর '৯০	২৭০,৩৮,৫৪,৩০৭/৭৫	২৩২,০৯,৫৬২/০৫	২৩৮
জানু '৯১ ডিসেম্বর '৯১	১১৮০,৪৯,০৪.৯৮২/৭৬	৪৮৮,৭৮,১১,৫১৭/৭১	৫৯৩
জুন '৯০ ডিসেম্বর '৯১	১৪৫০,৮৭,৫৯,২৯০/৫১	৭২০,৮৭,২১,০৭৯/৭৬	৮৩১
জানু '৯২ ডিসেম্বর '৯২	১৪২৯,৯০,৪৫,৯৮৩/৭৭	৭০১,৩৪,৪২,৬৭৮/৮১	৫৪০
জুন '৯০ ডিসেম্বর '৯২	২৮৮০.৭৮০৫,২৭৪/২৮	১৪২২,২১,৬৩,৭৫৮/১৭	১৩৭১
জানু '৯৩ ডিসেম্বর '৯৩	৯৬৬,২১,৮১,৮৮৮/৩৪	৫৯৩,৭৪,২৯,১৩১/২৩	৫৯০
জুন '৯০ ডিসেম্বর '৯৩	৩৮৪৬,৯৯,৮৭,১৬২/৬২	২০১৫,৯৫,৯২,৮৮৯/৪০	১৯৬১
জানু '৯৪ ডিসেম্বর '৯৪	২১৯১,২২,৮৬,৯৯০/৫৪	৮৩৫,৬৬,১০,২২৬/৯৯	৫২৭
জুন '৯০ ডিসেম্বর '৯৪	৬০৩৮,২২,৭৪,১৫৩/১৬	২৮৫১,৬২,০৩,১১৬/৩৯	২৪৮৮
জানু '৯৫ ডিসেম্বর '৯৫	৩৭৪,৯৯,০৩,৫০৪/৬০	৪৮৮,২৭,৩৩,৬৯৩/১০	৩২২
জুন '৯০ ডিসেম্বর '৯৫	৭১০,৮১,৭৬,৯০৪/১৬	৩৮৬৬,৬৪,১০,৭৭৩/৯৯	৩১৪

তথ্য: কম্পিউটার শাখা, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ডিসেম্বর/৯৫

www.pathagar.com

এক নজরে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মাধ্যমে প্রাপ্ত বিদেশী অনুদান সংক্রান্ত তথ্য

সময়কাল (জুলাই-জুন)	অনুমোদিত অর্থের পরিমাণ (টাকা)	ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকা)	অনুমোদিত প্রকল্প সংখ্যা	ব্যুরো প্রতিষ্ঠার পর থেকে: রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত এনজিও'র সংখ্যা			রেজিস্ট্রেশন বাতিলকৃত এনজিও'র সংখ্যা			সর্বমোট: কার্যরত এনজিও'র সংখ্যা			অনুমোদিত পরিমাণ (টাকা)	ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকা)	অনুমোদিত প্রকল্প সংখ্যা
				দেশী	বিদেশী	মোট	দেশী	বিদেশী	মোট	দেশী	বিদেশী	মোট			
পূর্ববর্তী জের	১,৪৮,৯২,২৭৯/০০ (৩,৭২,৩০৬.৯৮)	২১,৭১,৭৯,৬৮৫/০০ (৫৪,২৯,২৪২.১৩)	৮	২৯৩	৮৯	৩৮২	-	-	-	২৯৩	৮৯	৩৮২	১,৪৮,৯২,২৭৯/০০ (৩,৭২,৩০৬.৯৮)	২১,৭১,৬৯,৬৮৫/০০ (৫৪,২৯,২৪২.১৩)	৮
১৯৯০-৯১	৬৩৪,১৬,৮০,২২৯/৩৩ (১৫,৮৫,৪২,০০৫.৭৭)	৪২৬,৪০,৮০,৫২২/১৯ (১০,৬৬,০২,০১৩.০৫)	৪৬৪	১০২	১০	১১২	-	-	-	৩৯৫	৯৯	৪৯৪	৬৩৫,৬৫,৭২,৫০৮/৩৩ (১৫,৮৯,১৪,৩১২.১৭)	৪৪৮,১২,৫০,২০৭/১৯ (১১,২০,৩১,২৫৫.১৮)	৪৭২
১৯৯১-৯২	১১৮৪,৪৩,৭৯,৪০৪/৬৭ (২৮,৭১,০৯,৪৮৫.১২)	৪৮৬,৫৫,২২,৮৪৪/৯৮ (১২,১৬,৩৮,০৭১.১২)	৫৪৯	১২৭	১২	১৩৯	০১	-	০১	৫২১	১১১	৬৩২	১৭৮৪,০৯,৫১,৯১৩/০০ (৪৪,৬০,২৩,৭৯৭.৮৩)	৯৩৪,৬৭,৭৩,০৫২/১৭ (২৩,৩৬,৬৯,৩২৬.৩০)	১০২১
১৯৯২-৯৩	১৫৬৭,৪৮,৫৫,৫১১৭/৭৭ (৩৯,১৩,৭১৩৮৭.৯৪)	৭৮২,৮২,৩০,৬৮০/৭৮ (১৯,৫৭,০৫,৭৬৭.০২)	৬২৬	৭৫	১৫	৯০	-	-	-	৫৯৬	১২৬	৭২২	৩৩৪৯,৫৮০৭,৪৩০/৭৭ (৮৩,৭৩৯৫,১৮৫.৭৭)	১৭১৭,৫০,০৩,৭০২/৯৫ ৪২৯৩,৭৫,০৯৩.০২)	১৬৪৭
১৯৯৩-৯৪	১২৫৫,৯৯,৬১,৩১১/৬০ (৩১,৩৯,৯৯,০৩২.৭৪)	৬৮৪,০৩,৬২,৫৩০/৪৩ (১৭,১০,০৯,০৬৩.২৬)	৫৮১	১১০	০৭	১১৭	২৩	১০	৩৩	৬৮৪	১২২	৮০৬	৪৬০৯,৫৭,৬৮,২১/৩৭ (১,১৫,২৪,১৯,২০৫.৪৩)	২৪০১,৫৩,৬৬,২৬৩/৩৮ (৪২,৯৩,৭৫,০৯৩.৩২)	২৬০৭

* বন্ধনীতে উল্লেখিত মানসমূহ ১ মার্কিন ডলারকে ৪০ টাকা হিসেবে ধরা হয়েছে।

www.pathagar.com

এনজিও'র ভূমিকা : সেবার মূল্যায়ন

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এক সময়ে মজুতদারদের একচেটিয়া দোর্দন্ড প্রতাপ ছিলো। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী অবৈধ মজুত করে তাঁরা কৃত্রিম সরবরাহ সংকট সৃষ্টি করে। এর ফলে হু-হু করে বেড়ে যায় ওই পণ্যের দাম। এরকম কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে মজুতদাররা তাদের পণ্যের দাম এক-এক লাফে দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চতুর্থগুণ এমনকি পাঁচ-ছয় হাজারগুণ পর্যন্তও বৃদ্ধি করে ফেলে, ব্যবহারকারী সাধারণ মানুষের হয় মরণ, কিন্তু মজুতদারদের হয়ে যায় রাতারাতি কোটি-কোটি টাকার মুনাফা। বিশেষতঃ ঈদ-পার্বণের মতো উৎসব এবং প্রতিবছরের বাজেটকে সামনে রেখে এরা অবশ্যই এই কৃত্রিম সৃষ্টির খেলায় নামবেই। এটা যেন তাদের 'ফরজে-আইন', বাপ-দাদার দোহাই। এই সব উৎসবের পূর্বে এদের গোডাউনগুলো হয়ে ওঠে লোভের-পাপের গনগনে আগুনে ঠাসাঠাসি। বাজারে যেন কিছু থাকে না অভাগা সরল জনতার জন্য। একেই বলে Go And Stock. এই Go And Stock অলারাই ছিলো এক সময়ে সর্বাপেক্ষা সহজে সর্বাধিক টাকা উপার্জনকারী। বানের জলের মতো টাকা আয় করা যায় এই পাপের পথে। তাই দেশের অর্থনীতিতে সবচেয়ে দোর্দন্ড প্রতাপ ছিলো এদেরই।

কিন্তু কালোবাজারীরা যখন সংঘবদ্ধভাবে সুগঠিতরূপে ব্যবসাতে নামলো তখন সমাজের উঁচুস্তরে অবস্থানকারী শিক্ষিত নামী-দামী ইন্টেলেকচুয়াল কালোবাজারীদের আয় মজুতদারদেরকেও ছাড়িয়ে গেলো। মজুতদারেরা তাঁদের এই ডিমোশন বা অবনতিকে মেনে নিতে পারলো না। মজুতদারীর পাশাপাশি তাঁরাও কালোবাজারীও শুরু করে ছিলো। এক সঙ্গে দু'টো। যে মজুতদার সেই কালোবাজারী, যে কালোবাজারী সেই মজুতদার। এই সময়টাতে রাতারাতি কোটিপতি হওয়ার একমাত্র উপায়ই ছিলো এই মজুতদারী ও কালোবাজারীর ঘৃণ্য অলিন্দ।

এরপরে রাতারাতি না হলেও অপেক্ষাকৃত কম সময়ে কোটিপতি হওয়ার নতুন একটি পথ খুলে গেলো। তা হলো- এনজিও-এর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজসেবার কর্মকান্ড পরিচালনার দ্বারা। আর অনুন্নত অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও এনজিও'র প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ ঘটেছে জনগণকে সাহায্য প্রদানোপলক্ষে। সর্বতোভাবে উন্নত বিভিন্ন দেশের অর্থে পরিচালিত এনজিওদের সংখ্যা বর্তমানে অগণিত, কর্মক্ষেত্রের সীমাও তারা অতিক্রিম করেছে অনেক আগে এবং ব্যাপক ভাবে প্রসারতা লাভ করেছে রে ব্যাপ্তি।

এনজিও-এর আবির্ভাব

বাংলাদেশে সমাজকল্যাণমুখী কার্যক্রমে বেসরকারী সংস্থাসমুহের এনজিও'র অংশগ্রহণের ইতিহাস দীর্ঘদিনের। ৭০-এর ভয়াভহ ঘূর্ণিঝড় এবং ৭১-এর রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের স্বাধীনতা পরবর্তী পূনর্বাসন কর্মকান্ডে এনজিওসমূহ বিশেষ ভূমিকা পাল করতে শুরু করে। এসময় তারা তাদের পূনর্বাসন কর্মসূচী গ্রহণ করতে শুরু করে। বিদেশী

www.pathagar.com

দাতাসংস্থাসমূহ ক্রমে এনজিওদের মাধ্যমে সাহায্য প্রদানে উত্তরোত্তর আগ্রহী হতে থাকে। আমাদের সেই সংকট ও সমস্যার সময় বিদেশের সেবাব্রতী প্রতিষ্ঠানগুলোর সমবেদনা জনগণের কাছে ভালই মনে হয়েছে। সাধারণ মানুষ সরল মনেই তাদের গ্রহণ করেছে। শুরুতে দাতাদেশগুলোর ভূমিকা সেবা ও উন্নয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো। তখনও এনজিও'র ভূমিকা ছিলো সরকারী প্রচেষ্টার সহায়ক, সরকারের বিকল্প হিসাবে এনজিওগুলো তখনও মাথা তোলেনি। ৮৮-এর বন্যায় তাৎক্ষণিক ত্রাণ সাহায্য প্রদানকালে এই আগ্রহের ব্যাপক বহিঃপ্রকাশ ঘটে। গোড়ার দিকে এনজিও'রা ক্ষুদ্রাকারের জনহিতকর কার্যক্রমে ব্রতী ছিলো। তখন তাদের কার্যক্রম ছিলো মূলতঃ স্বেচ্ছাসেবামূলক এবং সুসংগঠিত-সম্মিলিত প্রচেষ্টাই ছিলো এগুলোর চালিকাশক্তি। ক্রমে তারা সমাজের অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর অংশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করতে থাকে। কার্যক্রমের পরিসর ও জটিলতা বৃদ্ধির কারণে এনজিওদের সাংগঠনিক চরিত্রেরও মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। স্বেচ্ছাসেবামূলক ভূমিকা থেকে উন্নয়ন কর্মকান্ডে বেসরকারী কাঠামোতে পেশাদার ভূমিকায় উত্তরণ ঘটে। নবতর ভূমিকায় তুলনামূলক বৃহদাকার পরিসরে কর্মকান্ডে জড়িত হওয়ার কারণে অর্থের জন্য সংস্থা বহির্ভূত উৎসের সন্ধান কারও আবশ্যক হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পটভূমিতে এসব এনজিও স্বাভাবিকভাবেই বিদেশী দাতাসংস্থাসমূহের অথবা বিদেশী এনজিওদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে তাদের কাছ থেকে কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য অর্থ সাহায্য লাভে সক্ষম হয়।

গুরুত্ব : ব্যাপ্তি ও মূল্যায়ন

যতদিন গেছে বাংলাদেশে এনজিও'র সংখ্যা তত বেড়েছে, দাতা দেশগুলোর কাছ থেকে অর্থ সাহায্যের পরিমাণ তত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তত বেড়েছে এনজিও'র সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক শক্তি। দাতাদেশগুলোর সরাসরি সমর্থন ও সহায়তা দাতাদেশগুলোর আসল শক্তি-খুঁটির জোর। দাতাদেশগুলো পরিষ্কারভাবে দাবি করে যে, বাংলাদেশে এনজিকে কাজ করতে দিতে হবে-বৈদেশিক সাহায্যের অন্যতম শর্ত এনজিও'র স্বাধীনতা।

এনজিও'র প্রতি দাতাদেশসমুহের দুর্বলতা ও পক্ষপাতিত্বের কিছু কারণ আছে। আমাদের দেশে দীর্ঘসূত্রী আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতি, প্রশাসনিক অদক্ষতা এবং ক্ষেত্র বিশেষে দূর্নীতির পটভূমিতে দাতাদেশসমূহ সীমিত পর্যায়ে হলেও দাতাদেশগুলোর কাছ থেকে দ্রুত ফল পেয়েছে। এনজিওগুলোকে আমলাতান্ত্রিক জটিলতার ভেতর দিয়ে যেতে হয় না বলে তারা তাড়াতাড়ি কাজ সম্পন্ন করতে পারে।

তাছাড়া এনজিও'র মাধ্যমে দাতাদেশগুলো আমাদের সমাজে দ্রুত প্রবেশ করতে পারছে এবং তাদের বিশ্বাস, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি ও জীবনদর্শনেরও সহজ বিস্তার ঘটানো যাচ্ছে। সকল দেশের সকল সরকারেরই কোন না কোন রাজনৈতিক দর্শন থাকে, সমাজের মূল্যবোধ ও বিশ্বাস মেনেই তাদের চলতে হয়।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে অগণতান্ত্রিক শাসন বজায় থাকায় সাহায্য দাতাদেশগুলো বিকল্প চ্যানেল খুঁজছে। উন্নয়ন সাহায্যের কিছুটা অর্থ বেসরকারী সংস্থার হাতে তুলে দিয়ে দাতাদেশগুলো তৃণমূলে সাহায্য পৌঁছে দেবার প্রয়াস পেয়েছে। দাতাদেশগুলোর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ এনজিওদের দেশের প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতির বাইরে গিয়ে কাজ করার সুযোগ এনে দিয়েছে। এখানেই বেঁধেছে গোলমাল।

কোনো কোনো এনজিও বিদেশী সাহায্য এনে ছোটখাট কাজ দেখিয়ে স্রেফ কিছু টাকা-পয়সা উপার্জন করছে। কিন্তু কোনো কোনো এনজিও জীবনের সর্বস্তরে তাদের কার্যক্রম ছড়িয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে মাথা তোলার চেষ্টা করছে। তাদের রিয়েল এস্টেট আছে, বাড়ি-গাড়ি আছে, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও রেস্ট হাউসও আছে, আধুনিক মুদ্রণ কারখানা আছে, সংবাদপত্র আছে; কারখানা আছে, এমনকি এনজিও'র অধীনে ব্যাংক খোলার পদক্ষেপও নেয়া হয়েছে।

এনজিও সংক্রান্ত সরকার নির্ধারিত কার্যপ্রণালীতে বলা হয়েছে, যে সকল ব্যাংক এনজিওসমূহের বিদেশ থেকে প্রাপ্ত আর্থিক সাহায্যের হিসাব রাখবে তারা প্রতি ছয় মাস অন্তর এরূপ সকল সাহায্যের হিসাব বাংলাদেশ ব্যাংক ও এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালককে প্রদান করবে। কিন্তু খোদ এনজিওই যদি ব্যাংক খোলার অনুমতি পায় তাহলে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে? কিছু কিছু বেসরকারী ব্যাংকের নিয়মিত কার্যকলাপতো ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ ব্যাংককে বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

অনুসরণীয় কার্যপ্রণালীতে আরও বলা হয়েছে যে, 'এনজিওসমূহ জাতীয় উন্নয়নে সরকারের লক্ষ্যসমূহকে এগিয়ে নিয়ে যাবে ও সরকারী প্রচেষ্টার সম্পূরক হিসাবে কাজ করবে।' কিন্তু এনজিওগুলো জাতীয় উন্নয়নে সরকারের লক্ষ্যসমূহকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না নিজেদের লক্ষ্যসমূহকে অনুসরণ করছে? রিওডি জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত 'আর্থ সামিট'-এ বাংলাদেশ সরকারের উপস্থাপিত বক্তব্যের বাইরেও এনজিওগুলো নিজেদের প্রস্তাবপত্র পেশ করেছিলো, সম্পূরক হিসাব নয়, বরং বিকল্প হিসাবে।

সাবেক এরশাদ সরকারের আমলে একটি এনজিও এদেশের ওষুধনীতি ও স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়নে সফল ভূমিকা পালন করেছিলো, যা এদেশের অন্যান্য এনজিও এবং চিকিৎসক সমাজের পছন্দ হয়নি। তারা সবাই এরশাদ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি জোরের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এনজিও-এনজিওতেও যে রাজনৈতিক বিরোধ বাধে তার প্রমাণ ওই ঘটনা। অবশ্য অধিকাংশ এনজিও এখন ঐক্যবদ্ধ এবং তারা মিলিতভাবেই নীতি নির্ধারণ করছে।

এনজিওগুলো কখনও সুক্ষ্মভাবে, আবার কখনও সরাসরিভাবে জাতীয় রাজনীতিতে অংশ নিচ্ছে। ১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময়ে কয়েকটি এনজিও তাদের কাছ থেকে সাহায্য সুবিধা গ্রহণকারীদের একটি বিশেষ প্রতীকে ভোট দিতে উদ্বুদ্ধ করেছিলো। দৃষ্টান্ত আছে, বিদেশী সাহায্যপুষ্ট এনজিও স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলো।

www.pathagar.com

এছাড়াও কোনো কোনো এনজিও রাজনৈতিক বক্তব্য সম্বলিত বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়েছে। একটি বিশেষ ধরনের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে পৃষ্ঠপোষকতা করেছে কয়েকটি এনজিও।

সরকারের উন্নয়ন প্রচেষ্টার সম্পূরক হিসাবে এনজিওগুলো কাজ করে গেলে তাতে জনগণের সুবিধাই হত। কিন্তু বড় বড় এনজিও সরকারের মতই আচরণ করছে। অধিকাংশ এনজিও'র সাংগঠনিক কাঠামো এবং রাজনৈতিক প্রবণতা এদেশের জনগণের মূলধারার বিপরীত।

অর্থনৈতিক অনিয়মের অভিযোগ

এনজিওগুলোর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অনিয়মেরও বিস্তর অভিযোগ আছে। অভিযোগ হচ্ছে, এনজিওগুলো প্রকল্পের জন্য নির্দিষ্ট অর্থের শতকরা প্রায় ষাট ভাগ প্রশাসনিক খাতে ব্যয় করে এবং বাকি চল্লিশ ভাগ যায় কর্মসূচী খাতে। এনজিও নেতৃবৃন্দ বিপুল অঙ্কের অর্থ বেতন বা আনুষঙ্গিক ব্যয় হিসাবে পেয়ে থাকেন। তাদের নিত্য বিদেশ ভ্রমণে মূল্যবান বৈদেশিক সাহায্য ব্যয়িত হচ্ছে।

এনজিওগুলো এ পর্যন্ত যে পরিমাণ সাহায্য বরাদ্ধ পেয়েছে তাদের কার্যক্রম তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তার সঠিক মূল্যায়ন আজ পর্যন্ত করা সম্ভব হচ্ছে না। এনজিও বুরোরই তাদের কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করার কথা, কিন্তু ব্যুরো এখন এনজিওগুলোকে ঘাঁটাতে সাহস করে না। এনজিও'র অর্থ ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ তো তাদের ইচ্ছামতোই পরিচালিত হয়।

১৯৯১ সালের অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও কি দাতাদেশগুলোর এনজিও'র মাধ্যমে বৈদেশিক সাহায্য বিতরণের প্রয়োজনীয়তা রয়ে গেছে? এই নীতিগত প্রশ্নের জবাব সরকার ও দাতাদেশ উভয়কেই সন্ধান করতে হবে। গণতান্ত্রিক সরকারের বিকল্প কেন প্রয়োজন? জনগণের আরও প্রশ্ন, যে আমলা গোষ্ঠী নানা জটিলতা সৃষ্টি করে, উন্নয়নের গতিধারা মন্থর করে ফেলে, তারাই আবার অবসর গ্রহণের পর এনজিও'র আশ্রয় নিয়ে কিভাবে তৎপর হয়ে উঠেন? দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ কল্যাণের বিবেচনায় এ সকল প্রশ্নের সমাধান হওয়ার আবশ্যকতা রয়েছে।

এনজিওগুলো যদি নির্বাচিত সরকারের উন্নয়ন পলিসি, জনগণের বিশ্বাস ও মূল্যবোধ, এদেশের নিজস্ব সংস্কৃতির সম্পূরক শক্তি হিসাবে কাজ করে যায়, তাহলে মানুষের মনে কোনো অভিযোগই থাকতে পারে না। প্রতিবছর এনজিওগুলোর কাজের সঠিক ও নিরপেক্ষ মূল্যায়ন এনজিও ব্যুরোর মাধ্যমে হওয়া উচিত। অর্থ ব্যয়ের হিসাব-নিকাশও যথাযথভাবে করা দরকার। সম্পূরক শক্তি হওয়ার বদলে এনজিওগুলো সমান্তরাল শক্তি হিসাবে কাজ করলে রাজনৈতিক বিপর্যয় অনিবার্য বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন।

সাম্প্রতিক সময়ে এনজিওদের কার্যকলাপকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। একশ্রেণীর এনজিও'র কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মহল থেকে এমন

www.pathagar.com

জোড়েশোরে প্রতিবাদ উঠতে শুরু করেছে যে, সে প্রতিবাদ এখন ক্ষেত্রবিশেষে সক্রিয় প্রতিরোধে পরিণত হয়েছে। এ ধরনের বিরাজমান অবস্থার একটি নিরাপদমূলক সমাধানের বাঞ্চনীয়তা রয়েছে।

কিন্তু এই সমগ্র বিষয়ে কোথায় যেন একটি বিরাট ফাঁক রয়ে গেছে। যারা এনজিও কার্যক্রমের সমালোচক, তাঁরা এবং সমালোচকদের যারা বিরোধী তাঁরা, এই উভয় শিবিরই যেন একটি চরম অবস্থান গ্রহণ করেছেন। এর ফলে যেটা অবশ্যম্ভাবী সেটাই ঘটছে। শত শত এনজিও যেমন বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে অনুপ্রবেশ করেছে, তেমনি বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে আছেন মুসল্লী এবং ধর্মভীরু মুসলমান। এর ফলে মতলববাজ এবং বিদেশের এজেন্ট এনজিও'রা সেসব এনজিও, যারা দেশীয় এবং জাতীয় স্বার্থের ক্ষতিকর নয়, তাদেরও বেপথে চালিত করে তাদের দলে ভেড়ানোর অপচেষ্টা করছে। এর মধ্যে একশ্রেণীর মতলবাজ পত্র-পত্রিকায় তিলকে তাল করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে রঙ ছড়িয়ে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে এমন উস্কানিমূলক-ভাবে সংবাদ পরিবেশন করা হচ্ছে যে, এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও সামাজিক সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠেছে। এ পটভূমিতে আজ যেটা সবচেয়ে বেশী দরকার সেটা হলো, সমগ্র বিষয়টি নিরাসক্ত, নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠভাবে পর্যালোচনা করার। যদি সেটা করা সম্ভব হয়, তাহলে সাম্প্রতিককালে হঠাৎ করে সৃষ্ট সামাজিক উত্তেজনা অনেকখানি প্রশমিত হতে পারে।

এনজিওদের অবস্থান

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে যে, বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ৮০০ এনজিও কাজ করছে। এদের মধ্যে অন্তত ৬০০ এনজিও একান্তভাবে দেশীয় এনজিও। এরা হয়তো বিদেশ থেকে আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। তাই বলে তারা সম্পূর্ণভাবে বিদেশের অঙ্গুলী হেলনে পরিচালিত হয়- এমন ধারণা ঠিক নয়। এদের মধ্যে অন্তত ১২৫টি এনজিও সম্পূর্ণ বিদেশী। এখন কেউ যদি বলেন যে, ৮০০ এনজিও উন্নয়ন কাজ বাদ দিয়ে অন্য কিছু করছে, তাহলে সেটা সম্পূর্ণভাবে সত্যের অপলাপ হবে।

এ ব্যাপারে সম্যক ধারণা লাভের জন্য বেশ ক'টি মহলের সাথে কথা বলেছি। কথা বলেছি এমন সব ব্যক্তির সাথে যারা সুদীর্ঘকাল ধরে এনজিও কার্যক্রমের ওপর বিস্তর পড়াশোনা করেছেন, ব্যাপক গবেষণা করেছেন এবং তাদের সর্বশেষ কার্যক্রম সম্পর্কে ওয়াকেবহাল থাকার চেষ্টা করেছেন। কথা বলেছি এমন কয়েক ব্যক্তির সাথে যারা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সরকারের প্রশাসন যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং অনেক নিকট থেকে শত শত এনজিও'র কার্যক্রম অবলোকন করার দুর্লভ সুযোগ পেয়েছেন। কথা বলেছি সেসব ব্যক্তির সাথে, যারা বেশ ক'টি এনজিও'র গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কথা বলেছি আরও ক'ব্যক্তির সাথে, যারা এখনও কতিপয় এনজিও'র কর্ণধাররূপে দায়িত্ব পালন করছেন। বিভিন্ন শ্রেণীর এসব মানুষের সাথে কথা বলার

www.pathagar.com

পর বাংলাদেশের শত শত এনজিও সম্পর্কে যে ধারণা গড়ে উঠে সেটা অতি সংক্ষেপে এভাবে বর্ণনা করা যায়।

অধিকাংশ এনজিও ভাল কাজ করছে

এনজিও কার্যক্রম সম্পর্কে বিপুল তথ্য ও উপাত্তের অধিকারী একজন ভিআইপি জানিয়েছেন যে, সব এনজিওই খারাপ কাজ করছে, একথা ঠিক নয়। এ সূত্র সরাসরি উল্লেখ করেন যে, অত্যন্ত খ্যাতনাম এনজিও CARE সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কোনো বিরূপ সমালোচনা শোনা যায়নি। এ প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বিশেষ করে সাধারণ মানুষের মাঝে যে সেবামূলক কাজ করে যাচ্ছে, সেটা বিভিন্ন মহলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে যাচ্ছে। তার মতে, বৃটিশ এনজিও OXFAM-এর কোন বদনাম নেই। বাংলাদেশের অনেক উন্নয়নমূলক কাজে অবদান রেখেছে এই এনজিও। আরিচা বা নগরবাড়ী গেলে OXFAM-এর যান্ত্রিক ফেরিটি কার না চোখে পড়ে।

'এশিয়া ফাউন্ডেশন' নিঃসন্দেহে একটি স্কলারাল প্রতিষ্ঠান। এদেশের ইতিহাস এবং গবেষণায় প্রতিষ্ঠানটি অবদান রাখার চেষ্টা করেছে। তবে কেউ যদি বাংলাদেশের ইতিহাস এবং ঐতিহ্য নিয়ে বিকৃত তথ্য পরিবেশন করে থাকে অথবা অপব্যাখ্যা করে থাকে তার জন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে এশিয়া ফাউন্ডেশন দায়ী নয়। বরং দায়ী হলো সেসব বাংলাদেশী পন্ডিত, যারা এদেশে জন্মলাভ করে, এদেশের নুন খেয়ে, এদেশের আলো-হাওয়ায় মানুষ হয়ে ভিণ্দেশের ইতিহাসকে এদেশের ইতিহাস বলে চালিয়ে দিচ্ছেন। তারা হলেন সেসব তথাকথিত আঁতেল যারা সীমান্তের ওপারের ইতিহাসকে অথবা ওপারের সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মকে এপারের সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মের উপর শ্রেষ্ঠতর এবং উন্নততর ধর্ম হিসেবে চাপিয়ে দিচ্ছেন। এসব বুদ্ধিজীবী হলেন ভাড়াটিয়া বুদ্ধিজীবী। এরা যার নুন খান, তারই নিমকহালালী করেন। এদের মতলবী প্রচারণার জন্য প্রধানতঃ এশিয়া ফাউন্ডেশন দায়ী নন।

ঐ সূত্র প্রশ্ন করেন যে, 'রাবেতাতে আলেম ইসলাম' নামক যে এনজিওটি রয়েছে সেই এনজিওটি সম্পর্কে আপনারা কি বলবেন? তারা তো বরং ইসলাম সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ সৃষ্টি ও জ্ঞানের বিকাশে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ISRO (ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক রিলিফ অর্গানাইজেশন) নামক যে এনজিওটি রয়েছে রিলিফ সামগ্রীর সুষ্ঠু বিতরণের জন্য, এ সংস্থাটি ইতোমধ্যেই জনগণের বিপুল প্রশংসা কুড়িয়েছে। অনুরূপভাবে ISRA (ইসলামিক রিলিফ এজেন্সী) ত্রাণ সাহায্যের ক্ষেত্রে ইতোমধ্যেই যা করেছে, সেটা অন্যদের কাছে বিরল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

অপর একটি সূত্র মতে, অন্তত ৬০০টি মিডলেভেল এনজিও রয়েছে, যারা দেশীয় এনজিও এবং যারা উন্নয়ন ও সেবামূলক কাজকর্মে জড়িত। লক্ষ লক্ষ মানুষ এসব প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে দিন গুজরান করছেন। বেকারত্বের অবসান, নতুন কর্মসংস্থান

www.pathagar.com

সৃষ্টি এবং মানব সম্পদ উন্নয়নে তাদের ভূমিকা নিঃসন্দেহে মাইলফলক হয়ে থাকবে।

৫২টি এনজিও'র ক্ষেত্রে

বাংলাদেশে অন্তত ১২৫টি এনজিও রয়েছে যারা সরাসরি বিদেশী এনজিও। এদের মধ্যে এনজিও কার্যক্রম সম্পর্কে বিপুলভাবে অবগত একটি সূত্র জানিয়েছেন যে, এই ১২৫টি এনজিও'র মধ্যে অন্তত ৫২টি এনজিও রয়েছে, যারা এদেশের জন্য কাজ করছে না। তারা কাজ করছে তাদের বিদেশী প্রভুদের মিশন সফল করার জন্য। এদেশের মুসলমানদেরকে খৃষ্টান বানাবার কাজে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রসঙ্গত কয়েকটি এনজিও'র নাম করা যেতে পারে। এগুলো হচ্ছে- WORLD VISION, CARITAS, RDAS, CCDV ইত্যাদি। এসব এনজিও জানাবেন কি যে, তাদের এনরোলমেন্টে কতজন অফিসার এবং কর্মচারী রয়েছেন? এদের মধ্যে কজন মুসলমান এবং কজন খৃষ্টান? এরা কাজ করছেন বাংলাদেশে। কিন্তু তাদের কর্মচারীদের অর্ধেকেরও অনেক বেশী খৃষ্টান নয় কি? দারিদ্র্য বিমোচন যদি তাদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে বেছে বেছে মুসলমানদের বাদ দিয়ে খৃষ্টানদের তারা চাকরি দেয় কেন? না-কি দারিদ্র্য মোচন বলতে তারা শুধুমাত্র খৃষ্টানদের দারিদ্র্যরই অবসান চায়? অবস্থাটা যদি তাই হয়, তাহলে এ প্রবল ধর্মীয় বৈষম্যের বিরূদ্ধে দেশের মুসলমানরা যদি প্রতিবাদে গর্জে উঠে তাহলে তার জন্য দোষ দেবেন কাকে? সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়াচ্ছে তো ঐ খৃষ্টান এনজিওগুলো। মাঝখান থেকে যেসব দেশীয় এনজিও অসাম্প্রদায়িক এবং যারা ভাল কাজ করছে তারা ঐ খৃষ্টান দাতাদেশগুলোর অপকর্মের ভাগীদার হচ্ছে।

অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে, অন্ততঃ ২০টি এনজিও আছে যাদের কাছে দরিদ্র জনতার খেদমত বা সেবাটা বড় কথা নয়। তাদের কাছে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বড় কথা নয়। বরং তাদের কাছে প্রধান বিবেচ্য হলো, যে কোনো মূল্যে মালপানি কামাই করা এবং রাতারাতি আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হওয়া।

BRAC, প্রশিকা, নিজেরা করি প্রভৃতি এনজিও জানাবেন কি যে, জন্মের পর থেকে তারা কত টাকা বিদেশ থেকে এনেছেন? দেশের অভ্যন্তর থেকে কত টাকা পেয়েছেন। এর পাশাপাশি এ পর্যন্ত কোন খাতে কত টাকা খরচ করেছেন? তাদের বেতন বা সম্মানী তালিকায় কারা কারা রয়েছেন? এবং এ পর্যন্ত বেতন এবং সম্মানী বাবাদ কত টাকা খরচ করেছেন, এ সকল বিষয়ে হিসাব মেলানোর বাঞ্চনীয়তা রয়েছে।

ওরা রাজার হালে চলেন

বাংলাদেশের জনগণকে এমন একটি ধারণা দেয়া হচ্ছে যে, এনজিও'রা এদেশে থেকে গরীবী হটানোর মহান ব্রতে নিয়োজিত। বলা হয় যে, এনজিও'রা বিপন্ন মানবতার খেদমতে নিয়োজিত। আর্ত বা পীড়িতদের দারিদ্র্য দূরীকরণই যদি তাদের মহান ব্রত হয়, তাহলে একশ্রেণীর এনজিও'র কর্তাব্যক্তিদের চলন-বলন এবং আচার-আচরণেও

www.pathagar.com

দারিদ্র্য বিমোচনের সহায়ক হওয়া উচিত। কিন্তু অনেক এনজিও'র অনেক বড় কর্তা রয়েছেন যারা রাজার হালে চলাফেরা করেন। ওদের আচরণ জমিদারসুলভ। ওদের অনেকেরই সর্বনিম্ন বেতন ২৫ হাজার টাকা। উর্ধে কোন লিমিট নেই। তাদের খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি। বেতন যদি ২৫, ৩০ বা ৪০ হাজার টাকা হয় তবে তার সাথে রয়েছে নানান জাতের এ্যালাউন্স এবং ফ্রিঞ্জ বেনিফিট। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত তাদের অফিস। আর অনেকের ঘরেও চালু হয়েছে ঠান্ডার মেশিন। প্রাসাদোপম অট্টালিকায় এরা বাস করেন। সেই সাথে রয়েছে মানানসই হাল ফ্যাশানের গাড়ি।

একজন অতীব দায়িত্বশীল কর্মী জানালেন যে, এরা বাংলাদেশ বিমানে ভ্রমণ করে তৃপ্ত হন না। কেননা, বিমানে অনেক যাত্রীর ভিড়ে পরিবেশ তাদের কাছে সাফোকেটিং লাগে। তাই একা একা বিলাসবহুল নিরিবিলি ভ্রমণের জন্য ওরা মাঝে মাঝে হেলিকপ্টার চার্টার করেন। বাংলাদেশে মাঝে মাঝেই খুব বিশ্রী গরম পড়ে। তাই মাঝে মাঝেই শরীর জুড়াবার জন্য বছরে বেশ কবার ওরা বাইরে যান এবং লম্বা সময় কাটিয়ে আসেন। গরীব মানুষের গরীবী দূর করার কি মহান আদর্শ! কিন্তু কার টাকায় তাদের এই বিলাস? কাদের অর্থে তারা গড়ে তুলেছেন এ বিপুল বিত্ত-বৈভব? এসব নন-গভর্ণমেন্ট অর্গানাইজেশন বা NGO-র বড় সাহেবরা তাদের আয়েশী জীবনযাপন বাবদ ব্যয়িত অর্থ যদি এ দেশের লক্ষ কোটি বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির পেছনে ব্যয় করতেন তাহলে বাংলাদেশের সর্বত্র না হলেও অঞ্চল বিশেষের চেহারাই সম্পূর্ণ পাল্টে যেতো।

একটি সমান্তরাল সরকার

অত্যন্ত হাঁক-ডাক সহকারে প্রচার করা হয়ে থাকে যে, বাংলাদেশের বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা এনজিও'রা না-কি অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং সেবাই না-কি তাদের একমাত্র ধর্ম। কিন্তু এনজিওদের কার্যক্রম এবং তাদের যোগসূত্রগুলো গভীরভাবে অনুসন্ধান করলে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র পাওয়া যায়। লক্ষ্য করা যায় এক সুদূরপ্রসারী নেটওয়ার্ক। এনজিও'রা যে শুধুমাত্র বিত্তশালী তাই নয়, তারা অত্যন্ত ক্ষমতাশালীও বটে। সবগুলো এনজিও'র ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য হোক, আর নাই হোক, অন্ততঃ ক'টি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এটা দারুনভাবে প্রযোজ্য।

বাংলাদেশে একশ্রেণীর এনজিও'র কণ্ঠ দিয়ে আজকে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয়, আগামীকাল সেই ধ্বনি দিল্লী, প্যারিস এবং ওয়াশিংটনে প্রতিধ্বনিত হয়। তাই এদেশের মানুষ স্তম্ভিত, বিস্ময়ে লক্ষ্য করেন যে, বগুড়ার নন্দীগ্রাম বা কাহালুর মতো অজপাড়া গাঁয়ে আজ যা ঘটছে এবং সেটাকে কেন্দ্র করে একশ্রেণীর এনজিও এবং তাদের অনুচররা নারী নির্যাতন ও ফতোয়াবাজি বলে যে সমস্বরে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে আগামীকাল বাংলাদেশের সাহায্যদাতা কনসোর্টিয়ামের প্যারিস বৈঠকে সেই চিৎকার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তাই দেখা যায়, গত ২০ এপ্রিল কনসোর্টিয়ামের প্যারিস বৈঠকে বাংলাদেশকে ২১৫ কোটি ডলার সাহায্য অনুমোদনের সময় দাতাদেশগুলো একটি রিবাট শর্ত জুড়ে দিয়েছে। শর্তটি হলো এই যে, যদি সাড়ে ৪ হাজার কোটি টাকার সাহায্য পেতে হ

www.pathagar.com

তবে তাদের ভাষায় মহিলাদের ওপর অন্যায়, জুলুম ও আক্রমণ বন্ধ করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

কিন্তু এনজিওদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে দাতাদেশগুলো অর্থমন্ত্রীকে জানিয়েছেন যে, মহিলাদের উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার যা করেছে সেটা যথেষ্ট নয়। এনজিও এবং পশ্চিমা দেশগুলোর কি অদ্ভুত যোগসূত্র। প্যারিসের এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেছেন বিশ্ব ব্যাংকের দক্ষিণ এশিয় বিষয়ক প্রধান জোসেফ উড। বাংলাদেশের অজপাড়াগাঁয়ে যা ঘটে সেটা ১৫/২০ দিনের মধ্যেই জোসেফ উড সাহেবদের মুখ থেকে বের হয় কিভাবে? এরপরেও কি তাঁরা বলবেন যে, একশ্রেণীর এনজিও রাজনীতির সঙ্গে জড়িত নয়? বরং কঠোর বাস্তব হলো এই যে, একশ্রেনীর এনজিও ক্ষমতাবান এবং সম্পদশালী বিদেশী রাষ্ট্রের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের উপর অনবরত হুকুম জারি করে চলেছে। যারা একটি স্বাধীন-সার্বভৌম সরকারের ওপর এমনভাবে খবরদারি করতে পারে। সেই ক্ষমতাধর এনজিওগুলোকে যদি সমান্তরাল সরকার বলা হয় তাতে যথাযথ যৌক্তিকতা আছে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন।

নারী নির্যাতনের কথাই যখন উঠেছে তখন কথার-পিঠেই কথা বাড়বে। ভারতে কি কম নারী নির্যাতন হয়? সতীদাহ বা সহমরণের মতো বর্বর প্রথার কথা এখনও ভারতের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জানা যায়। ভারতের এখনও অনেক অঞ্চলে নারীকে শুধু ভোগ্যপণ্যই মনে করা হয় না, নারীদের সঙ্গে ক্রীতদাসীর মতো আচরণও করা হয়। হিন্দু ধর্মে 'নারীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার' বলতে গেলে কিছুই নেই। যে ভারতে নারীদের প্রতি আজও মধ্যযুগীয় আচরণ করা হয়, সেই ভারতে নারীদের ওপর দানবীয় আচরণের ব্যাপারে ঐসব এনজিও এবং তাদের বিদেশী মদদদাতারা নীরব কেন? ওরা যেটাকে ফতোয়াবাজি বলে তারস্বরে চিৎকার শুরু করে দিয়েছে সেই তথাকথিত ফতোয়াবাজির মাধ্যমে ক'জন নারীর ক্ষতি হয়েছে সেটা তারা বলবে কি? যদি খতিয়ান নেয়া যায় তবে দেখা যাবে যে, এসব তথাকথিত ফতোয়াবাজির মাধ্যমে যদি কোনো নারীর কোনো ক্ষতি হয়ে থাকে তাহলে তার সংখ্যা এতই নগন্য যে, সেটা হাতের আঙ্গুলে গোনা যাবে।

এনজিও সাহেবরা বলবেন কি যে, ফতোয়াবাজি ছাড়া বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের হার এবং সংখ্যা কতো? স্বামী ও শ্বশুরের যৌতুকের শিকার হয়েছেন হাজার হাজার মহিলা। কই ওদের ব্যাপারে তো একটি এনজিওকে একবারও মুখ খুলতে দেখা যায়নি। এসিড মেরে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে কত মহিলাকে? পরকিয়া প্রেমের অভিযোগে হত্যা করা হয়েছে কত গৃহবধূকে? এ ধরনের ক'টি জুলুমের খবর পত্রিকার পাতায় আসছে? গ্রামগঞ্জের খুটিনাটি খবর যারা রাখেন তারা জানেন যে, যেসব খবর পত্রিকার পাতায় আসে না সেগুলোর সংখ্যা লাখ লাখ। লাখ লাখ নারী তাদের অশিক্ষিত স্বামী, লোভাতুর শ্বশুর, সংকীর্ণমনা শাশুড়ী অথবা শহর এবং গ্রামের প্রভাবশালী মানুষের হাতে নিগৃহীত হচ্ছে। এসব অসহায় ছিন্নমূল স্বামী পরিতক্তা, মাস্তান কর্তৃক ধর্ষিতা লাখ লাখ নারীর পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে না কেন এসব এনজিও?

www.pathagar.com

শিক্ষা ক্ষেত্রে মুখোশ উন্মোচন

একশ্রেণীর এনজিও বিশেষ করে খৃষ্টান এবং পাদ্রী পরিচালিত এনজিও'রা এই মর্মে বড়াই করে যে, তারা শিক্ষা বিস্তারে বেজায় আগ্রহী। খৃষ্টান মিশনারীর মিশনে এরা অগাধ অর্থ ঢালছে। শিক্ষা এবং গবেষণা যদি এদের ব্রত হয়ে থাকে তাহলে অর্থাভাবে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের গবেষণা এবং প্রকাশনার কাজ বন্ধ হয়ে আছে কেন? ঢাকার আইসিটিভিটিআর তত্ত্বগত, প্রায়োগিক, কারিগরি এবং ইসলামিক শিক্ষার এক আদর্শ প্রতিষ্ঠান। অথচ অর্থাভাবে এ প্রতিষ্ঠানটির প্রয়োজনীয় বিস্তার এবং সম্প্রসারণ ঘটছে না। শিক্ষা এবং গবেষণায় এসব পশ্চিমা এনজিও যদি এতই আগ্রহী হয়ে থাকে তাহলে ইসলামী ফাউন্ডেশন বা আইসিটিভিটিআর-এ তারা অর্থ সাহায্য করে না কেন?

এনজিওদের জাল ধীরে ধীরে, সন্তর্পণে সমাজ ও প্রশাসনের অনেক দূর পর্যন্ত ছড়ানো হয়েছে। কয়েকটি দৈনিক পত্রিকা এনজিওদের সপক্ষে এবং ধর্মপ্রাণ মানুষদের বিপক্ষে আটসাট মেরে নেমেছে। ক'টি দৈনিক পত্রিকা হঠাৎ করে কোটি কোটি টাকার পুঁজি নিয়ে ময়দানে নেমেছে। কারা এসব পত্রিকার গৌরীসেন? এসব মতলববাজ পশ্চিমা এনজিও'রা নয় কি? আমলাতন্ত্রের মধ্যে যারা এদের রিক্রুট, তারা চাকরি থাকার সময় প্রায় ফাও পয়সা বা উপরি পয়সা, আর চাকরি চলে গেলে, রিটায়ার করলে এনজিও-তে প্রায় অর্ধ লাখ টাকা বেতনের চাকরি। সেই জন্যই তো দেখা যায় যে, বগুড়ায় ঐ প্রবাদ-প্রবচনের সার্থক প্রয়োগ- 'বাঘ লাফায় বারো হাত, ফেউ লাফায় তের হাত'। 'রাজা যাহা বলে, পরিষদ বলে তাহার শতগুণ।' তাই তো বগুড়ার ডিসি ইব্রাহীম মওলানাকে পাকড়াও করে আনে। তাই তো তথাকথিত ফতোয়াবাজির জন্য একশ্রেণীর আমলা বিদ্যুতগতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন আলেম, সমাজের উপর। স্বাধীনতার বিরূদ্ধে অথবা কোরআন শরীফ ও হাদীস শরীফের বিরূদ্ধে কুৎসা রটনা করেও একশ্রেণীর আঁতেল পার পেয়ে যায়।

ভাড়াটিয়াদের অপপ্রচার

মুসলিম বিরোধী ভিণদেশে নাড়ি পোঁতা একশ্রেণীর পরজীবী বুদ্ধিজীবী, গৌরীসেনের টাকায় গজিয়ে ওঠা একশ্রেণীর সংবাদপত্র এবং খৃষ্টধর্ম প্রচারে নিয়োজিত ঐ ৫২টি এনজিও এবং অর্থ উপার্জনের উদগ্র লালসায় অধীর ঐ ২০টি এনজিও আজ সমস্বরে কোরাস তুলেছে যে, বাংলাদেশের মৌলবাদীরা, না-কি উন্নয়নের বিরোধী। কারা এসব মৌলবাদী? তাদের নিবাস কোথায়? কি তাদে পরিচয়? এসব তথ্য এসব এনজিও এবং তাদের ভাড়াটিয়া দালাল বুদ্ধিজীবীদের প্রমান করতেই হবে। কারণ, মিথ্যার বেসাতিতেও এরা সকলকে টেক্কা মেরে যাচ্ছে।

কেননা, মুসলমানরা কোনদিন প্রগতির বিরূদ্ধে যায়নি। বাংলাদেশ তো পরের কথা, ইসলামী বিপ্লবের সাম্প্রতিক সূতিকাগার ইরানেও কিন্তু নারীরা তাদের নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত নয়। ইরান সম্পর্কে যারা খোঁজ-খবর রাখেন অথবা যারা ইরান গেছেন তারা দেখেছেন যে, সাত-সকালে অফিস সময়ে ইরানের মুসলিম রমণীরা হাজারে

www.pathagar.com

হাজারে স্কুল-কলেজে বা অফিস-আদালতে হাজির হন। পুরুষের পাশাপাশি দৃপ্ত কদমে এগিয়ে চলেছেন ইরানের নারী সমাজ। তবে একটি পার্থক্য আছে। এসব এনজিও'র মুরব্বী দেশের মতো মুসলিম দেশের রমণীরা বেলেল্লাপনা করেন না, নির্লজ্জভাবে চলাফেরা করেন না এবং প্রদর্শনীয় বস্তু হিসেবে নিজেদেরকে পুরুষের সামনে তুলে ধরেন না। পোশাক-পরিচ্ছদে ইরান তথা মুসলিম রমণীরা মুসলিম ঐতিহ্য মেনে চলেন। ইরানসহ মুসলিম রমণীরা গাড়ি চালান, বাস-ট্রাকেও চলাফেরা করেন, তবে সম্পূর্ণ পর্দাপ্রথা মেনে চলেন। বাংলাদেশেও তো অসংখ্য মহিলা গার্মেন্টসে চাকরি করছেন। রাস্তায় ইট ভাঙছেন। ছেলেদের সাথে স্কুল, কলেজে, ভার্সিটিতে লেখাপড়া করছেন। এনজিওদের ভাষায়, যারা মৌলবাদী তারা তো কোনদিন মেয়েদের এসব লেখাপড়া কিংবা চাকরিবাকরির বিরুদ্ধে কোন ফতোয়া জারি করেননি।

আত্মবিকৃত বুদ্ধিজীবীদের কথা

এনজিওদের সপক্ষে ইদানিং কতিপয় বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি ঘনঘন প্রকাশিত হচ্ছে। ভাবতে অবাক লাগে যে, ঐসব বিবৃতিতে স্বাক্ষরদাতাদের মধ্যে এমনসব ব্যক্তি রয়েছেন যাঁরা সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পূর্বে এসব এনজিও'র বা যে কোন রকম পশ্চিমা অর্থ সাহায্যের মাঝে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত আবিষ্কার করতেন। এরা সেসব বুদ্ধিজীবী যারা বেসরকারী খাতে ইন্দো-মার্কিন ফরাসী অর্থের অনুপ্রবেশ তো দূরের কথা, যারা সরকারী খাতে ও পশ্চিমা ফরেন এইড গ্রহণেরও বিরোধিতা করতেন। আজ সেই একই চিহ্নিত মুখগুলো, যারা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বামপন্থী বলে পরিচিত তারাই আজ এনজিওদের সাফাই গাইবার জন্য কোমরে শাড়ির আঁচল জড়িয়ে অথবা খদ্দরের পাঞ্জাবী গায়ে চাপিয়ে ময়দানে নেমে পড়েছেন। আমরা দেখি আর ভাবি, রূপচাঁদের কি বিরাট শক্তি! চাঁদির জুতার বাড়িও কি মিষ্টি হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর দুষ্টু লোকের মতে, ওদের না-কি মাসোহারা বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। এখন এনজিও'রাই ওদের বিরাট ভরসা! এনজিও'রা রূপচাঁদের থলি নিয়ে ওদের সামনে হাজির হলে সেই থলির ওপর ওরা হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।

এডাব : প্রতিনিধিত্ব সংস্থা

নাম এবং অবয়ব হিসেবে সংস্থাটিকে এনজিওসমূহের প্রতিনিধিত্ব সংস্থা হিসেবে মনে হলেও মূলত এটিও একটি রেজিস্টার্ড এনজিও। বাংলাদেশে কর্মরত প্রায় ১৬ হাজার এনজিওর মধ্যে মাত্র ৬শ'-এর মতো এনজিও এডাবের সদস্য। এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে নিবন্ধনকৃত বিদেশী সাহায্য গ্রহণকারী ৬৩৫টি এনজিও'র মধ্যে এডাবের সদস্য মাত্র ১৮০টি। অথচ এডাব সুপরিকল্পিতভাবে বিদেশী দূতাবাসসমূহ, দাতাসংস্থা, আন্তর্জাতিক সংস্থা, এমনকি সরকারের কোনো কোনো মন্ত্রণালয়ের কাছে নিজেদের এনজিওসমূহের একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা হিসেবে পরিচয় দিয়ে সুবিধা আদায় করে এসেছে।

www.pathagar.com

'প্যাক্ট প্রিপ' নামীয় এক সংস্থা, যার প্রধান মিঃ রিচার্ড হলওয়ে এডাবের অর্থ যোগানকারী প্রতিষ্ঠান। মিঃ হলওয়ে ১৪ বছর ইন্দোনেশিয়ায় কাজ করার পর বাংলাদেশে এসেছেন এবং এরশাদ সরকারের আমলে সরকারের সমর্থন নিয়ে এডাবকে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান হিসেবে তুলে ধরার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এডাব ১৯৮৮-৮৯ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট এরশাদকে ওসমানী মিলনায়তনে বিপুল সংবর্ধনা দেয় এবং সেই সুবাদে ১৯৮৮ সালের বন্যার সময় ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে সরকারের বিকল্প শক্তি হিসেবে তারা আত্মপ্রকাশ করে।

এছাড়া এডাব-এর অর্থনৈতিক অসততার অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে একাধিক ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে বিদেশী সাহায্য গ্রহণ। সরকারী বিধি অনুসারে যে কোনো এনজিও কেবলমাত্র একটি ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমেই বিদেশী সাহায্য গ্রহণ করবে। কিন্তু এডাব নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে অনির্দিষ্ট সংখ্যক একাউন্টের মাধ্যমে সরকারের অনুমতি ছাড়া প্রায় ১ কোটি ২৫ লাখ টাকার বিদেশী সাহায্য গ্রহণ করেছে। সংগত কারণেই প্রশ্ন থেকে যায়, এই রাখ-ঢাক কেন? তাদের ডায়েরী প্রকাশে ২০ লাখ টাকা অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। এছাড়াও এডাবের একজন কর্মকর্তা প্রায়ই সরকারের অনুমোদন ছাড়াই বিদেশে গমন করে বিভিন্ন সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন।

দ্য সালভেশন আর্মি

সংস্থার প্রধান কার্যালয় লন্ডনে। ১৯৭৭ সাল থেকে এই সংস্থা বাংলাদেশে কাজ করছে। এর কার্য এলাকা ঢাকার মিরপুর, যশোর এবং খুলনা জেলার কিছু অংশ এলাকা। সালভেশন আর্মি কর্তৃক ধর্মান্তকরণের প্রচেষ্টা সম্পর্কিত নানাবিধ অভিযোগ ইতোমধ্যে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, সংস্থা পরিচালিত শিশুদের বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলকভাবে খৃষ্টান ধর্ম পড়ানো হয় এবং রোববার দিন প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে বাধ্যতামূলকভাবে গির্জায় যেতে হয়।

প্রকল্পের শুরু থেকে সংস্থাটি একের পর এক শর্ত ভঙ্গ করে চলেছে। সরকারের সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করে সংস্থায় দু'জন বিদেশী কর্মকর্তা প্রায় ১ কোটি ২৫ লাখ টাকা গ্রহণ করেছে যা রীতিমতো শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচনায় আনা যায়। কিছুদিন আগে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর একজন পরিচালক যশোরে সংস্থার প্রকল্প দেখতে গেলে তাকে প্রকল্প এলাকায় ঢুকতে দেয়া হয়নি। প্রকল্পের কর্মচারীরা উক্ত পরিচালককে জানান যে, স্বয়ং বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট এলেও তাকে ঢাকার বসদের বিনা অনুমতিতে প্রকল্প এলাকায় ঢুকতে দেয়া হবে না। এক্ষেত্রে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক এদেশের আইন কি বিদেশীদের জন্য প্রযোজ্য নয়।

সপ্তগ্রাম নারী স্ব-নির্ভর পরিষদের লুডু খেলা

নারী উন্নয়নের জন্য নিয়োজিত এই সংস্থার অর্থনৈতিক অনিয়ম ও দুর্নীতির খতিয়ান

www.pathagar.com

একেবারে কম নয়। সংস্থা বিগত ঘূর্ণিঝড়ত্তোর ত্রাণকার্য পরিচালনার সময় সরকারী নীতি উপেক্ষা করে যত্র তত্র ভাবে বিপুল অর্থের ত্রাণসামগ্রী ক্রয় করেছে। সরকারের অনুমোদন ছাড়া প্রায় ১ কোটি টাকার বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করেছে। এছাড়া সরকারের অনুমোদন ছাড়া বিদেশী দাতাসংস্থার অর্থে সপ্তগ্রাম-এর প্রধান নির্বাহীর ঘন ঘন বিদেশ গমন অনেকের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করেছে।

নারী ধ্বজাধারী এই সংস্থা একটি হাস্যকর কর্মসূচী গ্রহণ করে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছে। লুডু খেলার মাধ্যমে নারী উন্নয়ন নামক একটি লুডুতে তারা পর্দাপ্রথাকে নারী সমাজের অবনতির প্রধান কারণ বলে চিহ্নিত করে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অনুভূতিতে আঘাত হেনেছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

এমসিসি : ধর্মান্তরে অভিযুক্ত

এ সংস্থার ধর্মান্তকরণের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে। সংস্থার কর্মচারী মোস্তাক হোসেন ও মাহমুদ হাসানকেও ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়। অবশ্য তারা তা প্রত্যাখ্যান করে। সংস্থার কর্মক্ষেত্র নিলফামারী জেলার সৈয়দপুর থানায় অবস্থানরত অবাঙালীদের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে এমসিসি ধর্ম প্রচার শুরু করে। স্থানীয় প্রশাসনের তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে বলে জানা যায়। স্থানীয় জনগণের ক্রমাগত প্রতিরোধের মুখে এমসিসি বর্তমানে সৈয়দপুর থেকে তার কর্মক্ষেত্র গুটিয়ে নিয়েছে। এই সংস্থা সরকারের অনুমোদন ব্যতিরেকে প্রায় ১০ লাখ টাকার বিদেশী অনুদান গ্রহণ ও ব্যয় করেছে।

গণসাহায্য সংস্থার শ্রেণী সংগ্রাম

সংস্থা সুকৌশলে তথাকথিত শ্রেণী সংগ্রামের আদর্শ প্রচার করছে। অথচ এর পাশাপাশি সংস্থার প্রধানের ২০ লাখ টাকা মূল্যের শীততাপ নিয়ন্ত্রিত নিশান গাড়িতে ভ্রমণ তার বক্তব্য ও কর্মের বৈপরীত্বের স্বাক্ষর বহন করছে। তাদের প্রকাশিত 'গরীবের লেখাপড়ার বই'-এর প্রধান বক্তব্য হলো ধনী মাত্রই শোষক এবং শোষণ ও প্রতারণা ছাড়া ধনী হওয়া যায় না। সমাজের বিভিন্ন মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে তারা গত ('৯২) ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের সময় নিলফামারী জেলায় আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটায়। সংস্থা বিদেশী প্রতিষ্ঠানের টাকায় এদেশের সংস্কৃতির নামে একটি বিশেষ ধর্মনির্ভর সংস্কৃতিচর্চাকে পৃষ্ঠপোষকতা করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

বাংলাদেশ লুথারেণ মিশন (ফিনিস)

এই সংস্থার বিরূদ্ধে ধর্মান্তকরণের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে। কিছুদিন পূর্বে প্রকল্প এলাকায় সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের একজন কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদনে প্রমাণিত হয়েছে যে, সংস্থার শিক্ষা প্রকল্পাধীন বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে:

ক. একটি নির্দিষ্ট ধর্মের অনুসারী ছাত্র ছাড়া কাউকে সিট দেয়া হয় না,

www.pathagar.com

খ. ধর্মান্তরিত হওয়ার পর হোস্টেলে সিট দেয়া হয়,

গ. বিদ্যালয়ে ওই নির্দিষ্ট ধর্মাবলম্বী ছাড়া অন্য ধর্মের শিক্ষক নিয়োগ করা হয়নি,

ঘ. বাংলাদেশের আদিবাসী ও অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর শ্রেনীর অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে সুকৌশলে ধর্ম প্রচার করছে।

সংস্থা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য বিদেশী সাহায্য গ্রহণ করেছে। অথচ কাজ করছে একটি বিশেষ ধর্ম প্রচারের জন্য।

উন্নয়ন প্রচেষ্টা

সংস্থাটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রকল্প এবং বিদেশী সাহায্য গ্রহণের ব্যাপারে সরকারী অনুমোদনের তোয়াক্কা না করে প্রায় ১৪ কোটি টাকা গ্রহণ ও খরচ করেছে। সংস্থার পরিচালক পুনের হাজার টাকা বেতন নেন এবং প্রকল্পের বাড়িতে বসবাস করেন। এরপরও তিনি বাড়ি ভাড়া বাবদ মাসে ১০ হাজার টাকা করে নিয়ে থাকেন।

পরিচালক নিজে লাভবান হয়েই সন্তুষ্ট নন। তিনি তার স্ত্রীকেও একটি প্রকল্পের সমন্বয়কারী হিসেবে নিয়োগ করে অর্থনৈতিক সুবিধা গ্রহণ করছেন। তার স্ত্রী প্রকল্প এলাকায় অবস্থান না করে ঢাকায় অবস্থান করেন। এছাড়া বিভিন্ন আয়বর্ধক প্রকল্প থেকে সংস্থার আয় ব্যাংক একাউন্টে জমা করা হয় না বলেও অভিযোগ রয়েছে।

সেবা : ক্ষমতার অপব্যবহার

সোসাইটি ফর ইকনমিক অ্যান্ড বেসিক অ্যাডভ্যান্সমেন্ট (সেবা) নামের এই সংস্থার প্রধান কার্যালয় ঢাকা হলেও তার কর্ম এলাকা মূলত ফেনী জেলার সদর ও সোনাগাজী এবং চট্টগ্রামের মিরেশ্বরাই থানায় বিস্তৃত। এই সংস্থা সরকারের অনুমতি ব্যতিরেকে প্রায় ১ কোটি ২৫ লাখ টাকা গ্রহণ করেছে। নির্বাহী পরিচালক তার ছোট ভাই আয়করের উকিলকে সংস্থার খন্ডকালীন অর্থ উপদেষ্টা নিয়োগ করে তাকে প্রতিমাসে বিপুল অর্থ ভাতা হিসেবে প্রদান করেছে। নির্বাহী পরিচালক মাসে ৩৫/৪০ হাজার টাকা বেতন-ভাতা বাবদ গ্রহণ করলেও সরকারকে এক পয়সা আয়কর দেননি। সংস্থার সভাপতির দায়িত্ব পালন করলেও কর্মচারী কল্যাণ তহবিল থেকে তিন লাখ টাকা নিজের চিকিৎসার জন্য নিজের ও তার স্ত্রীর যৌথ স্বাক্ষরে গ্রহণ করেছেন। ক্ষমতার অপব্যবহার, অর্থ আত্মসাৎ ইত্যাদির চরম উদাহরণ সৃষ্টি করেছে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'সেবা'।

কারিতাস : আদিবাসীদের সেবা

কারিতাস বাংলাদেশের একটি নেতৃস্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। সংস্থার পাঁচ বছর মেয়াদী প্রকল্পের বাজেট ১৩০ কোটি টাকা। এই সংস্থা মূলতঃ দেশের অনগ্রসর দরিদ্র জনগোষ্ঠী যেমন- নিম্নবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায় ও আদিবাসীদের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রমের ছদ্মাবরণে

www.pathagar.com

সুক্ষ্মভাবে ধর্ম প্রচারের কাজে লিপ্ত আছে। গত ২৯ এপ্রিল '৯১-এর প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের পর সংস্থার কৃষি পুনর্বাসনের নামে অর্থ আত্মসাৎ করা খেলায় মেতে উঠে। সংস্থা দরপত্র আহবান করে বাজার দরের চেয়ে বেশি দামে এক কোটি টাকায় ৬০০ মেট্রিক টন ধান বীজ ক্রয় করেছে। এই ধান বীজ কেনার মাধ্যমে সংস্থার কর্মকর্তাগণ না কি ৫০ লাখেরও বেশি টাকা আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এ সময়ে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর পরিচালক এটি তদন্ত করলেও পরবর্তীতে সংস্থার বিরূদ্ধে আর কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

ব্র্যাক : এনজিও সাম্রাজ্যের অগ্রদূত

এই সংস্থার বাংলাদেশের ২৪টি জেলায় কার্যক্রম রয়েছে। সংস্থা স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন বিদেশী দাতাসংস্থার কাছ থেকে প্রায় ৩০০ কোটি টাকা বৈদেশিক অনুদান গ্রহণ করেছে। যদিও প্রচলিত আইনে বিনা অনুমতিতে বৈদেশিক অনুদান গ্রহণ করা দন্ডনীয় অপরাধ। সরকারের অনুমতির তোয়াক্কা না করে বিদেশী প্রভুদের অর্থে বছরের অধিকাংশ সময়ে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক বিদেশে ভ্রমণে ব্যস্ত থাকেন, নিবেদিত প্রাণ স্বেচ্ছাসেবী ব্র্যাকের বিভিন্ন প্রকল্প থেকে লক্ষাধিক টাকা বেতন-ভাতা গ্রহণ করে থাকেন বলে জানা যায়।

ব্র্যাক দেশের ২৪টি জেলায় জমি ক্রয় ও ভবন নির্মাণের মাধ্যমে সারাদেশে 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর'র মতো ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করে চলছে। শুধুমাত্র গাজীপুরেই সংস্থা প্রায় বিশ একর জমির ওপর 'ট্রেনিং কমপ্লেক্স' প্রতিষ্ঠা করেছে। এছাড়াও ট্রেনিং সেন্টার ঢাকা শহরের মহাখালী এলাকাতেও রয়েছে চারতলা নিজস্ব ভবনে একটি অত্যাধুনিক মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান ও প্রকাশনাও রয়েছে এর মালিকানাধীনে।

সংস্থা রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বড় বড় শহরগুলোতে 'আড়ং' নামের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবী ভূমিকার পরিপন্থী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আড়ং-এর দ্রব্যসামগ্রী বিক্রি হয় গলাকাটা দামে। অথচ যারা এসব উৎপাদন করে তাদের ভাগ্যে জোটে হয়তো এর আয়ের মাত্র দশ ভাগের এক ভাগ।

সংস্থা কোল্ড স্টোরেজ ও প্রিন্টিং প্রেস স্থাপন করে প্রচুর অর্থ মুনাফা করেছে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নাম ব্যবহারের সুবাদে সংস্থা সরকারের বিভিন্ন বিভাগ থেকে মওকুফ সুবিধা নিচ্ছে। অথচ সরকারের কোনো বিভাগের কাছেই ব্র্যাক তার বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের হিসাব দাখিল করছে না। মুনাফালব্ধ কোটি কোটি টাকার হিসাব সম্পর্কে সংস্থার কোনো দায়বদ্ধতা নেই।

ব্র্যাক নিজেকে উন্নয়ন পদ্ধতিতে সরকারের বিকল্প বলে দাতাদের কাছে দাবি করে দেশের গণতান্ত্রিক সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করেছে। ব্র্যাক '৬১ সালের Voluntary

www.pathagar.com

Societies Act-এর অধীনে নিবন্ধিত নয়। ফলে ব্র্যাক কখনও অবলুপ্ত হলে এর সকল সম্পদ ৭ সদস্যের পরিচালনা কমিটির হাতে চলে যাবে।

আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশন-এর নারী উন্নয়ন

ব্র্যাকের কর্ণধার তার মৃত স্ত্রীর স্মরণে প্রতিষ্ঠা করেছেন 'আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশন' নামে আরেকটি এনজিও। মহিলাদের উন্নয়নের নামে এই ফাউন্ডেশন মহিলাদের শ্রমকে শোষণ করছে। দাতাসংস্থা থেকে জোগাড় করছে ফাউন্ডেশন নামের এই বাণিজ্যি প্রতিষ্ঠানের পুঁজি। ফাউন্ডেশন নাম হলেও মূলতঃ এটি মহিলাদের শ্রমভিত্তিক হস্ত ও টেক্সটাইলজাত সামগ্রীর উৎপাদন কেন্দ্র। ব্র্যাকের আরডিপি কর্মসূচীভুক্ত দলীয় সদস্যদের সকাল ৮-০০টা থেকে বিকাল ৫-০০টা পর্যন্ত প্রতিদিন মাত্র দশটাকা মজুরির বিনিময়ে কাজ করানো হয়। সংস্থার উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রি হচ্ছে ব্র্যাকের অভিজাত দোকান আড়ং-এ অত্যন্ত উচ্চ মূল্যে, রফতানি হচ্ছে বিদেশে। গ্রামীণ মহিলাদের শ্রম শোষণ করা হচ্ছে- তাদের বেকারত্ব ও অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে। এভাবেই চলছে 'আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশন'-এর তথাকথিত নারী উন্নয়ন কর্মসূচী।

প্রশিকা : লাভের ব্যবসায় নিয়োজিত

সংস্থা ১৯৬১ সালের স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংগঠন (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশের আওতায় নিবন্ধিত। এই আইন অনুযায়ী কোনো অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক কর্মকান্ড পরিচালনা করা নিষিদ্ধ কিন্তু সে নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও 'প্রশিকা' প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা নিয়ে গড়ে তুলেছে 'দ্রুতি' নামে একটি পরিবহন সংস্থা। দেড় কোটি টাকায় স্থাপিত হয়েছে অত্যাধুনিক ছাপাখানা, গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিজ মিনজন ফ্যাব্রিক্স ও রেডিওয়্যার এবং ৫০ লাখ টাকা ব্যয়ে গঠিত হয়েছে ভিডিও লাইব্রেরী। এ সকল ব্যবসা থেকে লাভের বিষয়টি সংস্থা কখনো কাউকে জানতে দেয়নি। প্রশিকার যানবাহনের মধ্যে রয়েছে কয়েকটি এসি পাঁজারো জীপ, কার, মাইক্রোবাস এবং ১৫৫টি মোটর সাইকেল। এসব কেনার ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগও রয়েছে।

১৯৯১ সালে সংস্থা ৩ কোটির বেশি টাকায় জরুরী ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। সংস্থার প্রধান সন্দেহজনক কারণে এই কার্যক্রমের প্রতিবেদন সরকারের কোনো এজেন্সির কাছে দাখিল করেনি। ১৯৯০-৯১ সালে সংস্থা প্রায় ১২ কোটি ২৫ লাখ টাকা সরকারের অনুমোদন ছাড়া দাতা সংস্থার কাছ থেকে গ্রহণ করেছে। সংস্থার প্রধান নির্বাহী মাসে প্রায় ৩০ হাজার টাকা বেতনসহ অর্ধলক্ষ টাকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করেন। বিভিন্ন প্রকল্পের প্রায় ৩০ শতাংশ অর্থ বেতন-ভাতা খাতে ব্যয় হয়ে থাকে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য এদের কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নেই। মানবিক উন্নয়নের নামে কাজ করলেও গঠিত দলসমূহ তাদের আয় বাড়ানোর জন্য মহাজনের মতো চড়া সুদে ঋণের ওপর টাকা বিনিয়োগ করে। ক্ষেত্র

www.pathagar.com

বিশেষে সুদের হার শতকরা ২৬.৫ ভাগ। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর গম খেয়াল খুশিমত ব্যবহার করার অভিযোগও রয়েছে সংস্থার বিরুদ্ধে।

নিজের করি : পল্লী উন্নয়নের নামে

সংস্থাটি ১৯৯০-৯১ সালে ১ কোটি ৪৬ লাখ টাকা সরকারের বিনা অনুমতিতে গ্রহণ করেছে। পল্লী উন্নয়নের নামে সংস্থা যে অর্থ ব্যয় করে থাকে এর মধ্যে বেতন-ভাতা খাতে শতকরা ৫৭ ভাগ, নির্মাণ, অফিস সরঞ্জাম, যানবাহন, রেস্ট হাউস, বাড়ী ভাড়া-এ সকল খাতে শতকরা ৩০ ভাগ, সেমিনার, প্রশিক্ষণে শতকরা ৮ ভাগ এবং শতকরা মাত্র ২ ভাগ অর্থ ঋণ তহবিল হিসাবে ব্যবহার করে। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য প্রতিটি ঘর নির্মাণে মাত্র ৪ হাজার টাকা ব্যয় করে দু'হাজার ঘর নির্মাণের মাধ্যমে বিপুল অর্থ আত্মসাৎ করেছে বলে জানা যায়। ভূমি পুনরুদ্ধার কর্মসূচীর আওতায় সংস্থা নেদারল্যান্ড দূতাবাসের মাধ্যমে প্রতিবছর কোটি কোটি টাকা সরকারের অনুমোদন ব্যতিরেকে গ্রহণ করে তা আত্মসাৎ করে আসছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

সেভ দ্য চিলড্রেন ফান্ড (ইউ.কে)

এই সংস্থা সুচতুরভাবে ধর্ম প্রচার করে যাচ্ছে। বয়েজ এ্যান্ড গার্লস হোমে অবস্থানরত প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীকে বাধ্যতামূলকভাবে গির্জায় যেতে হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। সংস্থার প্রকল্প ব্যয়ের ৬০ শতাংশ বেতন-ভাতা খাতে, ১২ শতাংশ যানবাহন খাতে এবং মাত্র ২৮ শতাংশ প্রকল্প খাতে ব্যয় করা হয়। অথচ বাংলাদেশের নির্বাহী কর্মকর্তা লন্ডন অফিস থেকে তার বেতন-ভাতা গ্রহণ করেন। যদিও বাংলাদেশের অফিস থেকে তাকে মাসে লক্ষাধিক টাকা বাসস্থান ও খাওয়ার জন্য প্রদান করা হয়। বেতন ছাড়াও থাকা-খাওয়ার জন্য আলাদা ভাতা প্রদানের এরকম দৃষ্টান্ত বিরল।

অস্ট্রেলিয়ান ব্যাপটিস্ট মিশনারী সোসাইটি

সংস্থা সরকারের আইন ভঙ্গ করে অনুমোদন ছাড়া ১১ কোটি ৩৫ লাখ টাকা দাতাসংস্থার কাছ থেকে গ্রহণ করে প্রকল্পের খরচ নির্বাহ করে। এ ব্যাপারে কৈফিয়ত তলব করলে সংস্থা ভুল স্বীকার করে সরকারের কাছে ক্ষমা পার্থনা করে। সরকার সংস্থাকে সতর্ক করে দিয়ে প্রকল্পের অনুমোদন দেয়, কিন্তু একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করে সংস্থা আবারও সরকারের অজ্ঞাতে প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা গ্রহণ করেছে বলে জানা যায়।

সেভেন্থ ডে এডভেন্টিস্ট চার্চ অব বাংলাদেশ

সংস্থার বিরুদ্ধে ধর্মান্তকরণের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে। সংস্থায় নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী বিশেষ ধর্মালম্বী। ১৯৮৮-৮৯ সালে সংস্থা ২,৩০,৩৫,৫৬৬.১৬ টাকা

www.pathagar.com

সরকারের অনুমোদন ছাড়া বিদেশী দাতার কাছ থেকে গ্রহণ করে খরচ করেছে বলে জানা যায়।

সংস্থার মেডিক্যাল প্রোগ্রামের আওতায় স্থাপিত 'এডভেন্টিস্ট ডেন্টাল ক্লিনিক'-এ চিকিৎসা খরচ বাংলাদেশের অন্য যে কোন ভাল ডেন্টাল ক্লিনিকের চেয়ে অন্তত তিনগুণ বেশি। গুলশান ২ নং ব্লকে ৯৯ নং সড়কে স্থাপিত এই ক্লিনিকে গলাকাটা খরচে চিকিৎসা দেয়া হয়ে থাকে। সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এই ক্লিনিকের প্রকৃত আয়-ব্যয়ের যথার্থ কোনো হিসাব সংস্থা অদ্যাবধি সরকারের কাছে দাখিল করেনি বলে অভিযোগ রয়েছে।

রাবেতা-আল-আলম-আল ইসলামী

সংস্থার কর্মকান্ড মূলতঃ চট্টগ্রাম এলাকায় সীমাবদ্ধ। চট্টগ্রামে এই সংস্থার ভূমিকার বিষয়টি সর্বজনবিদিত।

অভিজ্ঞ মহল বিষয়টিকে সন্দেহাতীত বলে মনে করেন। তাদের মতে সংস্থার অর্থ প্রদান না করলেও কেউ কেউ বিভিন্ন পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে ভারণ-পোষনের দায়িত্ব পালন করে থাকে। এর সেবা সর্বস্তরের মানুষের কাছে এখনো পৌছায়নি বলে জানা যায়।

কার প্রশ্রয়ে সাহস বাড়িয়েছে

এখানে মাত্র কয়েকটি এনজিও'র চালচিত্র উল্লেখ করা হলো। যথাযথ তদন্ত করা হলে এর চেয়ে অনেক বেশি অনিয়ম এবং অপকর্মের সন্ধান পাওয়া যাবে বলে ধারণা করা যায়। কিন্তু এরই পিঠে প্রশ্ন আসাই অবান্তর নয়, সরকারের নিয়ম-কানুন উপেক্ষা করে কাজ করার সাহস এনজিও'রা পেলো কিভাবে? আইন বহির্ভূত যে কোনো কাজ করার জন্য নিবন্ধন বাতিলসহ শাস্তির বিধান থাকা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত তার প্রয়োগের নজির দেখা যাচ্ছে না কেন?

এনজিও'রা প্রকৃতপক্ষে অবাধে কাজ করার সাহস, সুযোগ-সুবিধা লাভ করে পূর্বের স্বৈরাচারী সরকারের শাসন আমলে। এর কারণ হিসাবে বলা যায়:

১. সরকারের কোনো গণভিত্তি না থাকায় দাতা সংস্থাসমূহ সরকারী সংস্থাসমূহের বদলে বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমে অনুদানের অর্থ ব্যয় করতে উৎসাহী হয়,

২. সরকার জনগণের সমর্থন না পাওয়ার কারণে নিজের থেকেই বিকল্প শক্তি হিসেবে এনজিও'দের বেছে নেয় এবং তাদের মাধ্যমে কর্মকান্ড পরিচালনা করতে থাকে,

৩. পতিত স্বৈরাচার সরকার তার ক্ষমতার স্বার্থে জনগণের প্রতিষ্ঠানকে বাদ দিয়ে বিদেশী সাহায্যপুষ্ট সংস্থাকে আপন করে নিয়েছিলো,

৪. এরশাদ সরকারের ক্রমাগত প্রশ্রয়ের ফলে কিছু কিছু এনজিও একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং ক্রমান্বয়ে দেশে প্রচলিত সরকারকে উপেক্ষা করতে থাকে,

www.pathagar.com

৫. আর এ কারণেই প্রচুর অনিয়ম-অন্যায় করা সত্ত্বেও স্বৈরাচারের ৯ বছরের শাসনকালে কোনো এনজিও'র বিরুদ্ধে সরকারী নির্দেশ না মানা, অনুমোদন ছাড়া বিদেশী সাহায্য গ্রহণ প্রভৃতি কারণে মামলা দায়েরের উদযোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানা যায়।

বরং '৯০-এর জুন মাস থেকে শুরু করে বিগত দুই বছরে এনজিওসমূহ প্রায় ১৫০ কোটি টাকা বিদেশী সাহায্য সরকারের অনুমোদন ছাড়া গ্রহণ করেছে। অথচ এ জন্য মামলা হয়নি একটিও।

এই সময়ে এনজিও'রা প্রায় ১৮০০ কোটি টাকা বিদেশী অনুদান গ্রহণ করেছে। যার শতকরা ৬০ ভাগই বেতন-ভাতা ও প্রশাসনিক খাতে ব্যয় হয়েছে। বাকি ৪০ শতাংশ (প্রায় ৮০০ কোটি) টাকার মধ্যে কি পরিমাণ অর্থ জনগণের কল্যাণে ব্যয় হয়েছে তার যথাযথ মূল্যায়ন হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক।

কারিতাসের বার্ষিক রিপোর্ট ও নীতিমালা

সরকারী নীতিমালায় বলা হয়েছে যে, কোন এনজিও দেশের রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হলে তার বিরুদ্ধে এনজিও ব্যুরো ব্যবস্থা নিতে পারে ও রেজিস্ট্রেশন বাতিল করতে পারে। সম্প্রতি কারিতাস নামে একটি এনজিও তাদের কান্ট্রি রিপোর্ট নামে একটি রিপোর্টে ঠিক এ কাজটিই করে বসেছে।

তাদের রিপোর্টে বলা হয়েছে, ১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সামরিক শাসনের অধীনে ছিল। রিপোর্টটিতে আরো বলা হয়েছে রাষ্ট্র একটি বিশেষ ধর্মকে পৃষ্ঠপোষকতা করছে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক ভাল নয় তাদের মধ্যে ঘৃণা ও অবিশ্বাস বাড়ছে।

রিপোর্ট প্রমাণ করে যে, সংস্থাটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যাপারে নাক গলাচ্ছে এবং আপত্তিকর মন্তব্য করছে। এ ব্যাপারে সরকার আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারেন সহজেই।

কারিতাসের আরেক কীর্তি হচ্ছে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ না করায় দিনাজপুরের সহ মাঠ কর্মকর্তা মাহফুজা বেগমকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা। মাহফুজা বেগম কারিতাসের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে অভিযোগ করেছে যে, তাকে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণের জন্য চাপ দেয়া হয়েছিলো। তিনি রাজি না হওয়ায় তার চাকরি গেছে। তিনি তার আর্জিতে জনবেসার নামে মুসলমান, হিন্দু ও সাঁওতালদের খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করার অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। শুধু কারিতাস নয়; এ ধরনের অভিযোগ আরও কয়েকটি এনজিও'র বিরুদ্ধে শোনা যায়।

একটি সাপ্তাহিকের রহস্যজনক ভূমিকা

কিছু সংখ্যক এনজিও'র আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দেশের সকল মহল ধীরে ধীরে সরব হয়ে উঠেছে। কিন্তু একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা এখনো এনজিও'র সেবা করে যাচ্ছে। সবচেয়ে

www.pathagar.com

বিস্ময়কর ব্যাপার, সরকারী অর্থে এই সাপ্তাহিকীটি প্রকাশিত হয়। সুতরাং জনগণের অর্থে এনজিও'র মুখপাত্র প্রকাশ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের জাতীয় সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে এনজিও'র আগ্রাসী ভূমিকার কাহিনী আজ নানাভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। পল্লী উন্নয়নের নামে গ্রামের গরীব, নিরীহ ও সরল মানুষকে বিভিন্ন এনজিও বিদেশী অর্থ ও ভাবাদর্শে বিভ্রান্ত তখনই এই সরকারী সাপ্তাহিকীটি এনজিও'র সেবায় আত্মনিয়োগ করে। তারা ইতোমধ্যে গণস্বাস্থ্যের ডাক্তার জাফরুল্লাহ এবং ব্র্যাকের ফজলে হাসান আবেদের ওপর বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করে এনজিও-এর পক্ষ নিয়েছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটির রাজনৈতিক ভূমিকাও অত্যন্ত রহস্যজনক ও অস্পষ্ট। দেশে যখন রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয়, তখন এই পত্রিকাটি সংকটকে বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। ক্ষমতাসীন সরকারকে সমর্থন করার নামে এরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে সরকারের। রাজনৈতিক হানাহানি ও সহিংস বিক্ষোভ সৃষ্টিতে এরা অতীতে সব সময় উস্কানি দিয়েছে। এই সংকটের মধ্য দিয়ে দেশে যখন সামরিক শাসন জারি হয়েছে তখন সেই শাসনকে তারা সময়োপযোগী এবং স্বাধীন ও সার্বভৌমত্বের জন্য প্রয়োজনীয় বলে অভিনন্দন জানিয়েছে। শোনা যায়, সামরিক শাসন জারির আগেই সামরিক অফিসারদেও সঙ্গে তাদের যোগসূত্র সৃষ্টি হয়। ১৯৮২ সনের সামরিক শাসন জারির পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলো দেখলে এই যোগসূত্র স্পষ্ট হবে।

১৯৮২ সালে সামরিক শাসনের পর গোটা নয় বছর এরা প্রকৃত অর্থে স্বৈরাচারের সাফাই গেয়েছে। রাজনৈতিক প্রতিবেদনে তারা সব সময় বিরোধী দলের আন্দোলনের অন্তঃসারশূন্যতা তুলে ধরেছে। এমনকি '৯০-এর আন্দোলনের সময়তো এরা সুকৌশলে স্বৈরাচারকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছে।

সরকারী অর্থে লালিত বলে এরা সুর পাল্টাতে খুব একটা বিলম্ব করে না। '৯০-এর আন্দোলনের আগে ও পরে যে সংখ্যাগুলো প্রকাশিত হয়েছে তা পাঠ করলে এই বিরাট বৈপরীত্য চোখে পড়বে। এদের আর একটা সুবিধা আছে, এরা প্রগতিশীলতার ভড়ং দেখায়। স্বৈরাচারকে তারা প্রগতিশীলতার নামে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস চালায়।

এই পত্রিকাটি সেক্স এবং ভায়োলেন্সের পূজারি। আজকের বাংলাদেশের বিভিন্ন সাপ্তাহিক রহস্য পত্রিকায় যে রগরগে সাংবাদিকতা ব্যাধির মত ছড়িয়ে পড়েছে, তার সূচনা এদের হাতে। মানুষের রুচিকে এরা যৌনাভিমুখী করে তোলার চেষ্টা করছে।

সরকারী অর্থে এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। কিন্তু এদের মস্তিষ্ক কার অর্থে লালিত। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার ভড়ং আছে এদের। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে এরা সুনির্দিষ্টভাবে অক্সফাম, সিমিটার প্রভৃতি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের সাফাই গেয়েছে। বড় বড় ঠিকাদারী কাজ পাইয়ে দেয়ার জন্য এরা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কাজ করেছে। এরা যে স্বাধীনতার কথা বলে, তা হলো বাংলাদেশকে বিদেশী অর্থের কাছে বন্ধক দেয়ার স্বাধীনতা।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে ষাটের দশকে এনজিও'র অস্তিত্ব ছিলোনা। তখন ছিলো ক'টি হাতে গোনা জনকল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠান। ১৯৭০ সালের ভয়াবহ ঘুর্ণিঝড়ের পরে এবং ১৯৭১ সালে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে বিদেশী এবং বিদেশী সাহায্যপুষ্ট বাংলাদেশী এনজিওসমূহ বাংলাদেশে যুদ্ধোত্তর পূনর্বাসন ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ শুরু করে। ধীরে ধীরে এসব কর্মরত বিদেশী ও বিদেশী সাহায্যপুষ্ট বাংলাদেশী এনজিও'রা শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবার-পরিকল্পনা ইত্যাদি খাত কর্মকান্ডে সম্প্রসারণ শুরু করে।

বাংলাদেশে এখন রেজিষ্ট্রেশনভূক্ত এনজিও সংস্থার সংখ্যা ৮২৫টি। এর মধ্যে ১৩২টি বিদেশী সংস্থা। ২৮টি এনজিও সংস্থার রেজিষ্ট্রেশন সম্প্রতি বাতিল করা হয়েছে। এছাড়া বেনামেও প্রায় ৬ হাজার সংস্থা এনজিও'র হয়ে কাজ করছে।

স্বাধীনতার পর আশির দশক থেকে দেশে এনজিওদের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। ১৯৮৮ সালের বন্যার পর তাদের তৎপরতা আরও বেগবান হয়। ১৯৮৮ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত এনজিও সংস্থাগুলো কতগুলি প্রকল্পের অনুমোদন পেয়েছে এবং তাতে সম্ভাব্য অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ কত ছিল তাও সমীক্ষা রিপোর্টে দেখানো হয়েছে।

অনুমোদিত প্রকল্প সংখ্যাঃ

১৯৮৮-৮৯	১৯৮৯-৯০	১৯৯০-৯১	১৯৯১-৯২ (জুন)	মোট
১১৩	১৮১	৪৭১	৫৪০	১৩১৪

সম্ভাব্য অর্থ ব্যয় টাকাঃ

১৯৮৮-৮৯	১৯৮৯-৯০	১৯৯০-৯১	১৯৯১-৯২	মোট
২৭৯.৮ কোটি	১০৮৮.২ কোটি	৬৩৫.৫ কোটি	১১৪৮ কোটি	৩১৫১.৬ কোটি

অভিযোগ ও এনজিওদের টার্গেট

এনজিও ব্যুরোর তদন্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ১৯৮৮ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত প্রায় ৫০ টি বড় এনজিও প্রায় দেড়শ কোটি টাকার সাহায্য গ্রহণ ও খরচ করেছে। যার ব্যাপারে সরকারী অনুমোদন ছিলো না। নিয়ম বহির্ভূতভাবে অর্থ গ্রহণকারী এনজিওদের তালিকায় রয়েছে ব্র্যাক প্রায় ১৪ কোটি টাকা, প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র প্রায় ১০ কোটি টাকা, কারিতাস ২২ কোটি ৩ লাখ টাকা, নিজেরা করি ১১ কোটি টাকা, সুইডিশ মিশন ৭ কোটি টাকার বেশী, বাংলাদেশ পরিবার-পরিকল্পনা সমিতি প্রায় ৪ কোটি টাকা। এ তালিকায় আরও রয়েছে ওয়াইডাব্লুসিএ, সালভেশন আর্মি, বরিশাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি, এফসি ওয়ার্ল্ড মিশন প্রভৃতি।

তদন্তে আরও জানা গেছে যে, সাবেক এরশাদ সরকারের আমলে '৯০-এর জুন মাস থেকে বিগত দুই বছরে এনজিও সংস্থাগুলি সরকারের অনুমোদন ছাড়া ১৬০ কোটি

www.pathagar.com

টাকার বিদেশী সাহায্য গ্রহণ করেছে। এজন্য তাদের বিরুদ্ধে কখনও মামলা হয়নি। অভিযোগে আছে, দেশের বেশ ক'টি বড় এনজিও একাধিক একাউন্টে একাধিক ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা আনছে যা বিধিবহির্ভূত। এদিকে সম্প্রতি ব্র্যাককে একটি ব্যাংক স্থাপনের ব্যাপারে অনুমতি দেয়া হয়েছে। এখানে এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন ও বিস্ময় প্রকাশের অবকাশ রয়েছে।

এনজিও'রা বাংলাদেশের রাজনীতির সঙ্গেও ধীরে ধীরে নিজেদের জড়িত করছে এবং একটি প্রেসার গ্রুপে পরিণত হচ্ছে। এনজিও সংস্থাগুলি ১৯৯০ সালে সরাসরি আন্দোলনকে সমর্থন করে এবং এর সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। এছাড়া 'এডাব' কর্তৃক প্রকাশিত একটি পত্রিকা 'অধুনা'-কে পুরোপুরি রাজনৈতিক বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, রোহিঙ্গাদের মাঝেও রাজনৈতিক প্রচারণা চালানোর সঙ্গে জড়িত রয়েছে এনজিও'রা।

এনজিও ব্যুরো সরাসরি খৃষ্টান ধর্ম প্রচারের সঙ্গে জড়িত রয়েছে বলে ৫২টি এনজিওকে সনাক্ত করা হয়েছে। এরা দেশের ভেতর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে খৃষ্টান ধর্ম প্রচার করছে। প্রলোভনের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের ধর্মকে কিনে নিচ্ছে।

এনজিও পরিচালনার নীতিমালা

সরকারী বিধি অনুযায়ী জাতীয় স্বার্থ এবং নিরাপত্তার পরিপন্থী নয়, এরকম উন্নয়ন কর্মকান্ডে এনজিওসমূহ অংশগ্রহণ করতে পারবে। এনজিওসমূহ কিভাবে কর্মকান্ড পরিচালনা করবে এ ব্যাপারে রয়েছে সরকারের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা:

ক. সরকারের অনুমোদন প্রকল্পের মধ্যে এনজিওসমূহের কর্মকান্ড সীমাবদ্ধ থাকবে,

খ. সরকারের অনুমোদন ছাড়া এনজিওসমূহের কোন বিদেশী অনুদান গ্রহণ কিংবা খরচ করা যাবে না,

গ. সরকারের অনুমোদন ছাড়া এনজিওসমূহে কোনো বিদেশীকে নিয়োগ করা যাবে না,

ঘ. নিয়মিতভাবে এনজিওসমূহের কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রতিবেদন সরকারের কাছে দাখিল করতে হবে,

ঙ. আয়-ব্যয় সংক্রান্ত যথার্থ হিসেব সরকারের নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করতে হবে,

একটি স্বাধীন ও স্বার্বভৌম দেশে জনগণ ও সরকারের অস্তিত্বকে মেনে নিয়ে এনজিওসমূহ সরকারের উল্লিখিত বিধি-বিধান মানতে বাধ্য। আইন অনুসারে এসব নিয়ম-কানুন বহির্ভূত যে কোন কাজ করলে সংশ্লিষ্ট এনজিও-এর কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাবে এবং এনজিও'র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ শাস্তিপ্রাপ্ত হবে।

কিন্তু সাম্প্রতিককালে বেশ কয়েকটি এনজিও স্বার্বভৌম সরকারের আইন-কানুন ও বিধি-

www.pathagar.com

নিষেধ অমান্য করে তাদের কর্মকান্ড পরিচালনায় স্বেচ্ছাচারিতার এক মারাত্মক নজির স্থাপন করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। তারা স্বাধীন বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা করবে, কিন্তু সরকারের নিয়ম-নীতির ধার ধারবে না এ ধরনের মানসিকতার পরিচয় দিচ্ছে বিভিন্নভাবে। তাদের এ সকল কার্যকলাপ সামগ্রিকভাবে এনজিও কর্মকান্ডকে প্রশ্নের সম্মুখীন করেছে। হুমকির সম্মুখীন করেছে স্বাধীন দেশ ও গণতান্ত্রিক এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে। বিশেষ কিছু এনজিও-এর কর্মকান্ড পর্যালোচনা করলে এ বিষয়ে সার্বিক চিত্র পাওয়া যাবে।

বিদেশী সহায়তার শর্ত

এসকল জনহিতকর প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ১৯৬০ ও '৬১ সালে প্রণীত আইনে বিদেশী সাহায্য গ্রহণের বিষয়ে কোনো শর্তের উল্লেখ ছিল না। এনজিওসমূহের ক্রমবর্ধমান বিদেশী সাহায্য গ্রহণ ও ব্যবহার সংক্রান্ত 'দ্যা ফরেন ডোনেশন (ভলান্টারী এক্টিভিটিজ) রেজুলেশন রুলস ১৯৭৮' প্রণয়ন করে। এর পরে ১৯৮২ সালে স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রমে ব্যবহার্য নয় এমন বৈদেশিক সাহায্য বেসরকারী পর্যায়ে প্রদান ও গ্রহণ 'দ্যা ফরেন কন্ট্রিবিউশন রেজুলেশন অর্ডিন্যান্স ১৯৮২'-এর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণের বিধান প্রবর্তিত হয়। এসকল আইন অনুসারে বিদেশী অনুদান গ্রহণকারী এনজিওসমূহকে বাংলাদেশে তাদের কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য এ সকল শর্তসমুহ অবশ্য পালনীয়ঃ

ক. এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক সংস্থার নিবন্ধন;
খ. এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক প্রকল্প অনুমোদন;
গ. এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক বিদেশী অনুদান গ্রহণের ছাড়পত্র গ্রহণ ও
ঘ. বিদেশী নাগরিক নিয়োগের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি সাপেক্ষে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর ছাড়পত্র- গ্রহণ।

এনজিওসমূহ কেবলমাত্র অনুমোদিত প্রকল্পের দ্বারা আর্থ-সামাজিক অবস্থাটার উন্নয়নের ক্ষেত্রে কাজ করতে পারে। তাদের অধিকার নেই বাংলাদেশের প্রচলিত কৃষ্টি, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতিবিরোধী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার। মূলতঃ সমাজকল্যাণমূলক কাজে ব্রতী কিছু কিছু এনজিও সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের মানুষের ধর্মীয় ও সংস্কৃতিক চেতনার বিরূদ্ধে কর্মকান্ড সম্পন্ন করে সমালোচিত হয়েছে। দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে কেউ কেউ নিজেদের বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে উত্তরণের অপপ্রয়াসে লিপ্ত রয়েছে। এ অবস্থাটা যেন অনেকটা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মতো ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে আগমন করলেও কোম্পানীর মূল লক্ষ্য ছিলো ভারতবর্ষের রাষ্ট্রক্ষতা দখল। তেমনি কিছু কিছু এনজিও-এর বিতর্কিত কর্মকান্ড মানুষকে সেই আশংকাতেই ফেলে দিচ্ছে বলে ক্রমাগতভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে।

এনজিও সংক্রান্ত সরকারী বিধিমালা

এদেশে এনজিও সম্পর্কিত প্রথম আইন হয় ১৯৭৮ সালে। এর আগ পর্যন্ত স্বেচ্ছাসেবী

www.pathagar.com

সংস্থাসমূহ ১৯৬০ সালের 'সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট' এবং ১৯৬১ সালের স্বেচ্ছাসেবী সমাজ কল্যাণ সংস্থাসমূহের অধ্যাদেশের যে কোনো একটির আওতায় নিবন্ধন গ্রহণ করে কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছিল। এই দুই আইনে বিদেশী সাহায্য গ্রহণের বিষয়ে কিছু উল্লেখ ছিলো না। কিন্তু স্বাধীনতার পর প্রচুর পরিমাণে বিদেশী সাহায্য বাংলাদেশে আসতে শুরু করে এবং এই সংস্থাগুলো বিদেশী অর্থ সাহায্য নিয়ে কর্মকান্ড শুরু করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৮ সালে বিদেশী সাহায্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনার জন্য প্রণীত হয় 'দি ফরেন ডোনেশন (ভলানটারী একটিভিটিভ) রুলস'।

এরপর ১৯৮২ সালেই প্রণীত হয় 'দি ফরেন কন্ট্রিবিউশন রেগুলেশন অর্ডিন্যান্স'। এরপর ১৯৯০ সালের জুন মাসে প্রেসিডেন্টের সচিবালয়ের অধীনে গঠন করা হয় 'এনজিও বিষয়ক ব্যুরো'। এখন পর্যন্ত দাতাদেশগুলোর সমস্ত কর্মকান্ড দেখভাল করার কাজই এই ব্যুরোর প্রধান কাজ। কতগুলি বিষয়ে এনজিও ব্যুরো কতগুলি নির্দিষ্ট নীতিমালার উল্লেখ করেছেন তাদের পরিপত্রে।

এনজিওসমূহের প্রকল্প অনুমোদন, কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরীবিক্ষণের ক্ষেত্রে অনুসৃত নীতিমালা:

ক. সরকারী নীতি বা জাতীয় নিরাপত্তার পরিপন্থী না হলে উন্নয়ন কর্মকান্ডে এনজিওদের উৎসাহিত করা,

খ. এনজিও'রা যাতে সরকারের আইন ও নীতিমালার মধ্যে তাদের কর্মকান্ড সীমিত রাখে তা নিশ্চিত করা,

গ. সরকারের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভূক্ত প্রকল্প বা তার সুনির্দিষ্ট অংশ এনজিও'র মাধ্যমে সম্পন্ন করা যাবে,

ঘ. বিদেশী ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট এনজিও সংস্থার নিবন্ধন ১৯৭৮ সালের আইন মোতাবেক এনজিও ব্যুরোতে হবে। ১২০ দিনের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয়া হবে,

ঙ. বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট এনজিও তাদের কার্যক্রম সরকার অনুমোদিত প্রকল্পসমূহে সীমাবদ্ধ রাখবে। প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য এনজিও ব্যুরোতে জমা দিতে হবে,

চ. এনজিও বিষয়ক ব্যুরো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতামতের ভিত্তিতে বিদেশী পরামর্শদাতা উপদেষ্টা বা বিশেষ বিশেষ নিয়োগের ছাড়পত্র প্রদান করবে,

ছ. বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণ তাদের নিজ এলাকায় এনজিও কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবেন,

জ. যে সব ব্যাংক এনজিওসমূহের বিদেশ থেকে প্রাপ্ত অর্থের হিসাব রাখবে তারা প্রতি ছয় মাস অন্তর এ ধরনের সমস্ত সাহায্যের হিসাব বাংলাদেশ ব্যাংক ও এনজিও ব্যুরোর মহাপরিচালককে প্রদান করবে।

এই নীতিমালার মধ্যে আরও ক'টি স্থানে বলা হয়েছে প্রকল্প অনুমোদন ব্যতিরেকে

www.pathagar.com

কোনো এনজিও কোনোরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবে না। এবং তাদের কর্মকান্ড অনুমোদিত কর্মকান্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। হিসাবের সুবিধার জন্য প্রত্যেক এনজিও একটি মাত্র ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে সমুদয় বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করবে।

ফরেন ডোনেশন (ভলান্টারী অ্যাকটিভিটিস) রেগুলেশন অর্ডিন্যান্স ১৯৭৮-এর ৪ ও ৫ ধারা অনুযায়ী সংস্থাসমূহের হিসাব নিরীক্ষা ও পরিদর্শন করার ক্ষমতা এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে প্রদান করা হয়েছে। এনজিওসমূহের বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষণ করার জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বাংলাদেশ চাটার্ড একাউন্টেন্টস অর্ডার ১৯৭৩ অনুসরণে চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্টদের দিয়ে তাদের হিসাব-নিকাশ পরীক্ষা করাবে। তবে কোনো একাউন্টেন্ট ১০ বছরের বেশি সংস্থার অডিট করতে পারবে না।

আইন ভঙ্গ ও অর্থ আত্মসাতের ক্ষেত্রে নিবন্ধন বাতিল ও মামলা দায়ের প্রসঙ্গে নীতিমালায় বলা হয়েছে, দেশের প্রচলিত আইনের পরিপন্থী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকলে, রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হলে, দেশের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি সৃষ্টি করলে, ব্যাপক অর্থ আত্মসাতের সঙ্গে জড়িত হলে ব্যুরো সরকারের অনুমোদন নিয়ে প্রাসঙ্গিক সংস্থার নিবন্ধন বাতিল করতে পারবে। এছাড়া আরও ৮২টি প্রধান ও অপ্রধান নীতিমালা এনজিওসমূহকে মেনে চলতে হয়। কিন্তু অভিযোগ রয়েছে যে, কোন ক্ষেত্রে এসব নীতিমালা লংঘিত হচ্ছে এবং তা হচ্ছে সরকারের নাকের ডগাতেই।

এনজিও কার্যক্রম ও একটি সমীক্ষা রিপোর্ট

এ দেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল সর্বত্রই এখন এনজিওসমূহের অবাধ বিচরণ। '৭০-এর দশকে যাত্রা শুরু করে ধীরে ধীরে এই এনজিওগুলো আস্তে আস্তে শক্তি সঞ্চয় করে এখন সরকারের সমান্তরালভাবে এগুতে চাইছে। এদে পেছনে রয়েছে বড় বড় দাতা দেশগুলির প্রত্যক্ষ সমর্থন। ফলে এরা কোথাও কোথাও সরকারের ওপরেও চাপ প্রয়োগ করছে।

সাবেক এরশাদ সরকারের পতনের পর বাংলাদেশে এনজিও কার্যক্রমের ওপর প্রকাশিত এক সমীক্ষা রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'এনজিও কর্তৃক বিদেশী সাহায্য গ্রহণ ও ব্যবহারকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ১৯৮৭ সালে ফরেন ডোনেশন (ভলান্টারী অ্যাকটিভিটিস) রেগুলেশন অর্ডিন্যান্স জারি করেন। এ অধ্যাদেশ জারির ফলে বিদেশী অনুদান গ্রহণের জন্য বিদেশী ও বিদেশী সাহায্যপুষ্ট এনজিও গুলোকে এই অধ্যাদেশের আওতায় সমাজ সেবা অধিদফতরের নিবন্ধন গ্রহণ করতে হতো। বিদেশী অনুদান গ্রহণে দাতাদেশগুলোর অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রকল্প দাখিল করে অনুমোদন নিতে হতো। এছাড়া প্রকল অনুমোদন ও প্রকল্পের জন্য অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের স্ট্যান্ডিং কমিটির অনুমতির প্রয়োজন হতো বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

রিপোর্টে আরও অভিযোগ করা হয়েছে, এখন অডিট ফার্ম নির্ধারণের ক্ষমতা এনজিওদের

www.pathagar.com

হাতে ন্যস্ত হওয়ায় অডিট ফার্মগুলো এনজিওদের মনতুষ্টির জন্য অডিট করছে। ফলে প্রকৃত চিত্র প্রতিফলিত হচ্ছে না। একটি সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে এনজিও ব্যুরোর অডিট বিভাগে মাত্র দুই জন অডিট সুপারভাইজার রয়েছেন। কোনো অডিটর নেই। ফলে এনজিওদের পাঠানো হিসাব-নিকাশ ও অডিট রিপোর্ট যাচাই করার ক্ষমতাও সরকারের নেই। সূত্রটি জানায়, এখন রেনডাম সেম্পলিংয়ের মাধ্যমে ব্যুরোর অডিট বিভাগ কাজ করছে। সমীক্ষার আরেক জায়গায় বলা হয়েছে, প্রচলিত এ পদ্ধতিতে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের অংশগ্রহণের ফলে এনজিও'র কার্যক্রমের সুষ্ঠু সমন্বয় এবং নিয়ন্ত্রণ করা সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিলো। কিন্তু এর ফলে বড় এনজিওদের কোটারী স্বার্থ রক্ষিত হচ্ছিল না। ফলে নেতৃস্থানীয় এনজিও সমূহ তৎকালীন অগণতান্ত্রিক সরকারের সঙ্গে যোগসাজশে প্রেসিডেন্ট সচিবালয়ের অধীনে একজন যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাকে মহাসচিব নিয়োগ করে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করে। মূলতঃ তাদের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ দূর্লব করাই ছিল এর উদ্দেশ্য।

সমীক্ষার শেষে এনজিওদের কর্মকান্ডের ব্যাপারে সার্বিক মন্তব্য করতে গিয়ে বলা হয়েছে, এনজিওদের কর্মকান্ড সাম্প্রতিককালে একটি বিতর্কিত ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। তাদের বিরূদ্ধে রাজনৈতিক বক্তব্য বিবৃতি প্রদান রাজনৈতিক মত সম্বলিত পত্রিকা প্রকাশসহ অন্যান্য অভিযোগও রয়েছে প্রচুর।

বেসরকারি উন্নয়ন উদ্যোগ

একাত্তরের অনেক অরাজনৈতিক সংগঠক তখন ব্যস্ত গরিবদের সংগঠিত করতে। প্রকৃত প্রস্তাবে '৭১-এর মহান স্বাধীনতার সময়েই বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মুক্তিযুদ্ধের পাশাপাশি সামাজিক যুদ্ধেও অবতীর্ণ হলেন। তারা বিশেষ করে নারী, শিশু ও বিপর্যস্তদের কেন্দ্র করে কিছু পুনর্বাসনমূলক ও মানবিক কর্মকাণ্ড শুরু করেন। তারাই যুদ্ধকালীন তাদের এই সাংগঠনিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশে যুদ্ধপরবর্তী ত্রাণকার্য শুরু করলেন। এক পর্যায়ে তারা বুঝতে পারলেন যে শুধুমাত্র ত্রাণ দিয়ে একটা জাতি বা সমাজকে রক্ষা করা বা এর পরিবর্তন করা যায় না। এর জন্য দরকার উন্নয়ন ও উৎপাদনমুখী কাজ। আর এভাবেই বাংলাদেশে বেসরকারি উন্নয়ন উদ্যোগের গোড়াপত্তন হয়। এই উদ্যোগের সঙ্গে তাই মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনার গভীর সংযোগ রয়েছে।

এছাড়া তৎকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে এনজিওদের উদ্ভবের বাস্তবতাকেও অস্বীকার করার উপায় নেই। কেননা তখন সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশে সামাজিক সার্ভিসগুলো পূরণের ক্ষমতা আমাদের নতুন রাষ্ট্রের পক্ষে পুরোপুরি নিশ্চিত করা সম্ভবও ছিল না। রাষ্ট্রীয় কাঠামোও ছিল বিপর্যস্ত কিংবা বলা যায় তখনও সেভাবে গড়ে উঠেনি। আর একটি দিক লক্ষণীয় সেটা হচ্ছে স্বাধীনতার ঠিক পরবর্তীকালে মানুষের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষাও ছিল তুঙ্গে এবং সে আকাঙ্ক্ষা যে কোনো কারণেই হোক সেদিনের রাজনৈতিক নেতৃত্ব সম্পূর্ণভাবে পূরণ করতে পারছিলেন না। ফলে যে

www.pathagar.com

শূন্যতার সৃষ্টি হয় সেটা পূরণ করতে কিছু সংগঠক রাজনীতিতে না জড়িয়েও মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। এছাড়া তখন বিদেশ থেকে প্রচুর ত্রাণ সাহায্যও আসছিল। সেই সুযোগটাই অনেকে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। আর এটাকেই এনজিও উদ্ভবের বাস্তবতা হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। তবে বাইরের দিকটা বাদেও সাধারণ মানুষের যে দুঃখ-বঞ্চনার সঙ্গে একাত্তরে মুক্তিযোদ্ধারা খুব কাছে থেকেও পরিচিত হয়েছিলেন তার সঙ্গে আরেক দফা যুদ্ধে নামার ভেতরের সংকল্পের দিকটাও উপেক্ষা করার মতো নয়। প্রেরণা যেখান থেকেই আসুক না কেন সাতাশ বছরের এই বাংলাদেশের অগণিত দুঃখী মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে এনজিওদের সাফল্য কতটুকু সে প্রশ্ন করার সময় বোধহয় এসে গেছে।

এনজিও'র বিভিন্নমুখী কার্যক্রমের মূল্যায়ন করলে দেখা যায় যে গত সাতাশ বছরে তারা অন্তত চেষ্টা করেছেন তাদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালনের। দেশের ব্যাপক দারিদ্র্যের প্রকোপ কমাতে তারা যথেষ্ট তৎপরতা দেখিয়েছেন। তারা উন্নয়নের কিছু নতুন কনসেপ্ট বা ধারণা করেছেন যেটা সনাতনী রাষ্ট্রের মাথায় ছিল না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, এনজিওদের প্রথম কনসেপ্ট ছিল যারা দরিদ্র কিংবা যাদের সুযোগ-সুবিধা কম তাদেরকে নিয়ে কাজ করা। এতে কাজ হয়েছে। যারা দরিদ্র তাদের কাছে তারা সহজে পৌছাতে পেরেছেন।

বিশেষ করে সবচেয়ে অবহেলিত নারীকে উন্নয়ন উদ্যোগের মধ্যমণি করতে সচেষ্ট হয়েছেন। নারীর প্রয়োজন, তার সৃজনশীলতা, তার মর্যাদা ও সমতার আলোকে সেই সমাজ খুব ধীরে ধীরে হলেও নতুনভাবে বিন্যস্ত হতে শুরু করেছে। নারীর অধিকারের প্রশ্নে সোচ্চার সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর সম্পূরক ভূমিকাও এক্ষেত্রে অস্বীকার করা ঠিক হবে না।

আজকের এনজিওরা আগের চেয়ে অনেক বেশি সংগঠিত ও দক্ষ এবং এনজিও সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা অনেক দূর হয়েছে। এনজিওরাও যে আমাদের উন্নয়নের জন্য কাজ করছে এটা মূলধারার রাজনীতিবিদরা, বুদ্ধিজীবীরা আজকাল স্বীকার করছেন। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ক্ষুদ্র ব্যবসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে এনজিওদের অবদান যে গরিব মানুষের ক্ষমতায়ন ও আশায়নের ক্ষেত্রকে বিস্তৃত ও পোক্ত করেছে সে কথা না মেনে উপায় নেই।

তবে উভয়ের দিক থেকে এখনও দ্বিধা রয়ে গেছে, অংশীদার হবার কিছু শর্ত এখনও অপূর্ণ রয়ে গেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে বিদেশি সহযোগিতার প্রয়োজন দেখা দেয়ায় এই প্রক্রিয়া এখনও গতিশীল হতে পারছে না। তবে পরিস্থিতি দ্রুত বদলাচ্ছে।

ফতোয়াবাজ, ধর্মান্ধরা বারবারই এনজিওদেকে তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। তাদের একটাই দাবি, এনজিওদের কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে। আমরা এই অপতৎপরতাকে একটা সামাজিক দুর্যোগ হিসেবে আখ্যায়িত করেছি। এর প্রধান কারণ হল এনজিওরা যে কাজটি করেছে, যেটি তাদের জন্য অত্যন্ত অসহনীয় সেটি হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়ন।

www.pathagar.com

এছাড়া তারা আরও যে কাজটি করলেন সেটি হচ্ছে- শিক্ষিত মেয়েদের কর্মী হিসেবে গ্রামে পাঠালেন। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় এটা সম্পূর্ণ নতুন একটা ধারণা। পুরনো ঐতিহ্য ভেঙ্গে এই যে একটা সামাজিক ঝাঁকুনি এনজিওরা গ্রামে-গঞ্জে সৃষ্টি করলেন তাতে ঐসব ধর্মান্ধ প্রতিক্রিয়াশীল গ্রুপ ভাবল এখনই তারা যেভাবে নাকের ডগা দিয়ে মোটর সাইকেলে ধুলো উড়িয়ে যাচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে হয়ত আমাদের কোনো অস্তিত্বই থাকবে না।

অন্যদিকে, একে একটা নতুন ধারার রাজনীতির বীজ হিসেবেও আখ্যায়িত করা যায়। হঠাৎ যদি বাংলাদেশে এমন কোনো সংবেদনশীল রাজনীতির উদ্ভব ঘটে, যে রাজনীতি বলতে পারে গ্রামে যে মেয়েটি ঘুরছে, উন্নয়নের কাজ করছে, তার আদর্শের সঙ্গে আমার আদর্শের কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই, তাহলে কিন্তু এসব সুবিধাভোগী ধর্মান্ধ প্রতিক্রিয়াশীলরা অত্যন্ত কোণঠাসা হয়ে পড়বে। সেই ভয়ে তারা আগাম আক্রমণ করছে। রাজনীতি এবং উন্নয়ন কর্মীদের মধ্যে এখনও তেমনভাবে কার্যকর সংযোগ গড়েও ওঠেনি। তবে তা নিশ্চয় ঘটতে পারে। এটা যাতে না ঘটে সে জন্য প্রতিক্রিয়াশীলরা খুব সাবধানী আক্রমণটা করছে।

একটা সময় ছিল যখন মনে করা হতো ক্ষমতায় গিয়ে তবেই সমাজের পরিবর্তন করতে হবে। কিন্তু কথা হলো যে জমিটি আমি পরিবর্তন করব সেটা আবাদযোগ্য না হলে কিভাবে সেই পরিবর্তন আসবে। বর্তমানে এনজিওরা সেই কাজটি করছে। গ্রাম বাংলার সামাজিক চেহারাটা খানিকটা হলেও এনজিওরা বদলে দিচ্ছে। গ্রামে দরিদ্র মানুষের সংখ্যাও বেড়েছে। এর সুপ্রভাব সমাজের নানা অঙ্গে পড়ছে।

কারণ ইতোমধ্যে গ্রামে যত পরিবার আছে এর এক তৃতীয়াংশ পরিবার কোনো না কোনো এনজিও বা এনজিও জাতীয় কর্মসূচীর মধ্যে চলে এসেছে। এর কারণে বাকি এক তৃতীয়াংশও Side effect অর্থাৎ পরোক্ষ সহায়তা পাচ্ছে। যেখানে গরিবরা সংগঠিত হতে পেরেছে সেখানে কৃষি মজুরি বেড়েছে। গ্রামবাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্য সচল হচ্ছে। শুধু তাই নয়, এতদিন ধরে আমাদের গ্রাম-গঞ্জে সুদ ও মহাজনী প্রথার যে প্রকোপ ছিল তারও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। গ্রামের মধ্যে বিভিন্ন এনজিও, গ্রামীণ ব্যাংক এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক পুঁজি ঢুকে গিয়েছে। এই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো থেকে ঋণ ও পুঁজি গ্রামের মানুষের কাছে সহজলভ্য হওয়ায় অপ্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ছে।

এনজিওরা দেশে যে একটা উন্নয়নের ধাক্কা দিয়েছেন, সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা করেছেন একে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- 'দারিদ্র্য আসলে ভূতের ভয়।' মানুষ যখন একা হয়ে যায় তখন সে খুব ভয় পায়। দারিদ্র্য সেরকমই একটা ব্যাপার। সম্মিলিত না হলে উন্নয়ন ঘটে না। তিনি আরও বলেছেন, বালি একত্রিত হতে পারে না। কারণ এটি ছাড়া ছাড়া। কোনো সারজাতীয় কিছু ফেললে

www.pathagar.com

তার পরেই কেবল সেটি একত্রিত হয়, চাষযোগ্য হয়ে ওঠে। সে অর্থে এনজিওকে এখানে সার হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। সে অনেকগুলো বালিকে একত্রিত করার চেষ্টা করছে।

তার মনে এই নয় যে, এনজিওদের কোনো দুর্বলতা নেই। নিঃসন্দেহে এনজিওদের নিজেদের অবস্থান নিয়ে তাদেরই আত্মসমালোচনায় নামা উচিত। হতদরিদ্রদের পাশ কাটিয়ে, অভ্যন্তরীণ জবাবহিদিতা সুদৃঢ় না করে, সোস্যাল মোবিলাইজেশন বা সামাজিক সমাবেশকে কম গুরুত্ব দিয়ে মানবাধিকার তথা শিশু অধিকারের মতো স্পর্শকাতর বিষয় কম নাড়াচাড়া করে, ক্ষুদে এনজিওদের পেছনে ফেলে শুধুমাত্র সরকার ও দাতাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে বাংলাদেশের উন্নয়নের সংগ্রামে তাদের পক্ষে পুরোপুরি বিজয়ী হওয়া মুশকিল। *(ডাঃ আতিউর রহমান ঃ স্বাধীনতার ২৭ বছর ঃ প্রত্যাশা, প্রাপ্তি এবং ভবিষ্যৎ করণীয়)*

এনজিওদের নিয়ন্ত্রণ-এর বাঞ্ছনীয়তা

এনজিও'রা এখনো তাদের কর্মকান্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে পূর্বের সরকারের শাসন আমলে স্বেচ্ছাচারী প্রক্রিয়া অনুসরণ করার ক্ষেত্রেই বেশি আগ্রহী। বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে বেশ কিছু এনজিও এ ধরনের মনোভাবের প্রকাশ ঘটাচ্ছে। এনজিওদের বন্ধনহীনভাবে কাজ করতে দিলে দেশের অবস্থাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ফিলিপাইন্স। একটি সার্বভৌম দেশে জনগণ এবং নির্বাচিত সরকারের কর্মকান্ডকেই অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। আর তার জন্য সরকারকেও সুকঠিন হাতে এনজিও কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তাই বিদেশী অর্থ প্রকৃত অর্থেই জনগণের কল্যাণে ব্যয় করতে সরকার এ সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন:

১. এনজিও কর্মকান্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন অনুসরণের নিশ্চয়তা বিধান,
২. আইন অমান্যকারীদের বিরূদ্ধে যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এর প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন,
৩. এনজিও কর্মকান্ডের জন্য সর্বোচ্চ পর্যায়ে জবাবদিহির ব্যবস্থাকরণ,
৪. এনজিওসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য নির্দিষ্ট বেতন কাঠামো তৈরি,
৫. নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের স্ব-স্ব এলাকায় এনজিও কার্যক্রম তদারকির ব্যবস্থা,
৬. এনজিও-এর কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধা ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক পদ্ধতিতে নিয়োগকরণের ব্যবস্থা করা। যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হলে বিদেশী সাহায্য সংস্থার অবমাননাকর শর্তে আবদ্ধ থেকে এবং এনজিওদের স্বেচ্ছাচারী কর্মকান্ডের ঘুর্ণিপাকে ক্রমশ বিলীন হয়ে যাবে আমাদের আপন জাতিসত্ত্বা।

সূত্র : সাপ্তাহিক 'আগামী' আগস্ট ৭ ও ১৪, '৯২ সংখ্যা।

www.pathagar.com

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন : এনজিও কার্যক্রম

আমাদের জনঅধ্যুসিত, ভূমি বুভুক্ষ, দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্রের আবর্তের আওতাধীন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এনজিও সমূহের কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। দেশে কার্যরত সকল এনজিও যে কেবল আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমানভাবে দক্ষতা প্রদর্শন করতে সক্ষম হচ্ছে তা সঠিক নয়, বরং অনেক এনজিও তাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ সহ স্বার্থান্বেষী মহলের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করে থাকে। এমন অভিযোগও উত্থাপিত হয়ে থাকে, অনেক এনজিও ভিন্ন ধর্ম প্রচারের কর্মকান্ড পরিচালনের মাধ্যমে আমাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার কার্যক্রমে নিয়োজিত থেকে আমাদের সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটাচ্ছে। এই বিষয়ে এনজিও ব্যুরো সহ সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপ নেয়া অত্যন্ত বাঞ্চনীয়।

বিদেশী ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট বাংলাদেশী এনজিওসমূহ বৈদেশিক অর্থ দ্বারা তাদের প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট বাংলাদেশী এনজিওসমূহ বির্নাহী কমিটি দ্বারা পরিচালিত হয়। বিদেশী ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট এনজিওর সংখ্যা বর্তমানে ৯৯২টি। তন্মধ্যে বিদেশী এনজিও'র সংখ্যা ১৩৮টি এবং দেশীয় এনজিওস্বর সংখ্যা ৮৫৪টি। স্থানীয় এনজিও যাঁরা বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট নয় এরূপ এনজিও'র সংখ্যা প্রায় ২০,০০০।

সরকারের গৃহীত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সফলতার জন্যে এনজিও'র সহায়তার গুরুত্ব যে অপরিসীম সে বিষয়ে দ্বিমতের কোন অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। আমাদের দারিদ্র্য পীড়িত অর্থনীতিতে কর্মসংস্থান ও তৃণমূল পর্যায়ে ঋণ সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করে অনেক এনজিও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে যা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে 'গ্রামীণ ব্যাংক' ও 'ব্র্যাক'-এর নাম অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা যেতে পারে। এনজিওদের কাছ থেকে যথাযথ সহায়তা পেলে এবং এরা তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সচেষ্ট থাকলে সরকারী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে আরও ত্বরিৎ সফলতা আসবে।

এনজিওসমূহ আমাদের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে যে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ আছে বলে মনে হচ্ছে না। তাদের কার্যক্রম যত উন্নয়ন সহায়ক হবে ততবেশি আমাদের উন্নয়নের সংযোজন ব্যপ্তি লাভ করবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

বর্তমানে ১৪টি এনজিও গণশিক্ষা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। গণশিক্ষা কার্যক্রম আপামর জনসাধারণের কাছে চলে গিয়েছে, কিন্তু আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় জনগণই

www.pathagar.com

শিক্ষার কাছে যায়। যদিও আমরা শিক্ষিত হচ্ছি, কিন্তু আমাদের যথাযথ উন্নয়ন সাধিত হয়নি। সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কিত অর্থনৈতিক পরিব্যাপ্তি ক্লাস রুম থেকেই শুরু হয়ে থাকে। ২০০০ সালের মধ্যে 'সবার জন্য শিক্ষা' কার্যক্রমে সফলতা অর্জনের ক্ষেত্রে এই সময়ের মধ্যে ২ কোটি ৩৫ লক্ষ লোককে স্বাক্ষর জ্ঞান দান করার আবশ্যকতা রয়েছে। এই বিষয়ে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে সফলতা অর্জনের বিষয় প্রশ্নসাপেক্ষ বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। এনজিও সমূহকে গণশিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত করতে একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণের আবশ্যকতার কথা অত্যন্ত গভীরভাবে ভেবে দেখা দরকার। এমনকি প্রাথমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার বিস্তৃতি ও সফলতার ক্ষেত্রেও এনজিওসমূহ উল্লেখযোগ্য অবদান রাতে সক্ষম হবে। কিন্তু জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতার বাধ্যবাদকতা না থাকলে কোন প্রচেষ্টা কাঙ্ক্ষিত সফলতা বয়ে আনতে সক্ষম হবে বলে মনে হচ্ছে না।

'ব্র্যাক'-এর মতো অন্যান্য বড় বড় এনজিও সমূহ গণশিক্ষা সহ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হতে পারে। এ ছাড়া মসজিদ ভিত্তিক কমিউনিটি ডেভলেপমেন্ট কার্যক্রমের বিষয়েও আরও গুরুত্বের সাথে চিন্তা ভাবনা করা যেতে পারে। যা গাজীপুরে ৯০টি এবং রাঙ্গামাটিতে ৬০টি মসজিদের মাধ্যমে ইতোমধ্যে হাতে নেয়া হয়েছে এবং মোট ৪৫০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে এই ধরনের কর্মকান্ড অগ্রগতি লাভ করছে। যদিও বয়স্কদের শিক্ষাদান অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার, তথাপি তাদের সীমিত সম্পদ ও সামর্থ্যের মাধ্যমে কার্যক্রম অব্যাহত রাখছেন। যারা এ কার্যক্রম পরিচালনা করছেন, তারা যথাযথ আর্থিক সহায়তা লাভ করলে এ ক্ষেত্রে আরও সফলতা লাভ করা সম্ভব বলে প্রত্যাশা করা যেতে পারে, যেহেতু রাজধানী থেকে গ্রাম-গ্রামান্তর পর্যন্ত বাংলাদেশের ব্যাপক এলাকা জুড়ে মসজিদের বিস্তৃতি রয়েছে।

এনজিও'র দেয়া সহায়তার মাধ্যমে ভূমি সংস্কারসহ পরিবেশ সংরক্ষণ নীতি প্রণয়ন ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। যেমন নেয়া হয়েছিলো ঔষধ নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে। তাদের এনজিও'র কর্মকান্ড চারশত কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে এবং এর জন্য ইউরোপীয় সংস্থাসমূহের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা লাভ করে থাকে। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ মোঃ ইউনুস এর উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করা যায়, এ পর্যন্ত বৈদেশিক সংস্থাসমূহের মাধ্যমে ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এর সমপরিমান সহায়তা আমাদের দেশে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের জন্য এসেছে, যার অর্থ দাঁড়ায় আমাদের মাথাপিছু বৈদেশিক ঋণ/সাহায্যের পরিমান ১০,০০০ টাকা।

সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তের আলোকে পোশাক শিল্প থেকে শিশু শ্রমিক ছাটাইয়ের প্রেক্ষিতে ছাটাইকৃত মেয়েদের শিক্ষা প্রদানের জন্য মার্কিন সরকার এনজিওদের সন্ধান করছে। আমাদের দারিদ্র্যপীড়িত মেয়েরা দারিদ্র্যের করালগ্রাসে বিভিন্নভাবে মান-সম্ভ্রম বিকিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে, এমনকি অসামাজিক কর্মকান্ডে ক্রমান্বয়ে জীবন জীবীকার তাগিদে জড়িয়ে পড়ছে। এই অবস্থার আলোকে এবং ধর্মীয় ও মানবিক দৃষ্টিকোন থেকে এ সকল

www.pathagar.com

পোশাক শিল্পের চাকুরীচ্যুত মেয়েদের পুনর্বাসনের জন্য যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণের আবশ্যকতা রয়েছে। তাছাড়া পোশাক শিল্পে কর্মরত মহিলা কর্মচারী/শ্রমিকরা অত্যন্ত মানবেতর জীবন-যাপন করছে। সে বিষয়ে পদক্ষেপ নেবার আবশ্যকতা রয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে এনজিও'র মাধ্যমে সফলতা আনা যেতে পারে।

ব্র্যাক ও এমএমডি-এ'সহ এ ধরনের অনেক এনজিও জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর সাথে নিবন্ধীকৃত নয়। অনেক সময়ে দেখা যায়, একই বিষয়ের উপর বিভিন্ন এনজিও একই এলাকাতে কর্মকান্ডে নিয়োজিত রয়েছে, যার ফলে এদের কার্যকারিতার সুফল লাভ করতে অনেক ক্ষেত্রেই এলাকার জনসাধারণ অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে। এনজিও'র কার্যক্রমের আরো যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনসাধারণের জন্য সুযোগের ও সুবিধার বৃদ্ধি ঘটানো সম্ভব হতে পারে, যা আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ধনাত্মক সুফল আনয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতেও সক্ষম হতে পারে। এজন্য এনজিওদের মধ্যে জবাবহিদিতার ব্যবস্থা প্রবর্তন করার আবশ্যকতা রয়েছে।

৮৫টি দেশে এনজিও'র কার্যক্রম ব্যাপ্তি লাভ করেছে। আমাদের দেশের সাধারণ লোকেরা আর কতকাল 'দারিদ্যের দুষ্ট চক্রে'র সাথে সহ-অবস্থান করবে, তা আমাদের ভেবে দেখার সময় এসেছে। এনজিও আমাদের বিরাজমান আর্থ-সামাজিক সমস্যার উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিয়োজিত হতে পারে যথার্থভাবে। এনজিওদের জন্য একটি 'প্যাকেজ প্রোগ্রাম' থাকা অত্যন্ত বাঞ্চনীয় এবং এজন্য একটি সার্বজনীন গ্রহণযোগ্য সমঝোতা প্রবর্তনের আবশ্যকতা রয়েছে। এনজিও'র কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি/অবস্থান নিরূপনের ক্ষেত্রে এনজিওসমূহ পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা আরো জোরাদার করার ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যে সকল কার্যক্রম আমাদের দেশের স্বার্থ রক্ষায় অনুকূল নয় সে সকল বিষয়ে দাতাদের সাহায্য/অনুদান এনজিওদের গ্রহণ না করার ক্ষেত্রে উৎসাহিত করার আবশ্যকতা অনুমিত হচ্ছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এনজিও'র কার্যক্রমের স্বীকৃতিদানের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে 'উৎসাহব্যঞ্জক পদক' প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

ছ' থেকে বারো মাসের ব্যবধানে এনজিওদের কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম কিনা, তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। আমাদের নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকান্ড অত্যন্ত গুরুত্বের দাবীদার। এর সফলতার সাথে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি অনেকাংশে নির্ভরশীল। নিরক্ষরতা দূরীভূত করার কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থার নিরিখে '২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা' কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। এর সার্বিক অগ্রগতি ও সফলতার নিমিত্তে সরকারী কর্মকর্তাদের অত্যন্ত সুনামের সাথে তাঁদের দায়িত্ব সম্পাদনের ক্ষেত্রে সচেষ্ট থাকার আবশ্যকতা অনুমিত হচ্ছে।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সরকার ও এনজিও-এর সীমা নির্ধারণের জন্য যথাযথ নীতিমালা থাকা আবশ্যক। দাতা সংস্থা কর্তৃক এনজিওদের

www.pathagar.com

প্রদানকৃত অনুদান সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এনজিও ব্যুরোতে যথাযথভাবে এনজিওসমূহের ব্যয় কর্মকান্ড সম্পাদন তথা সমাজ উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ থেকে প্রাপ্তি বিষয়ে একটি 'রিসার্চ সেন্টার গঠনের মাধ্যমে মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্চনীয় আর এই মূল্যায়নের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে মূল্যবোধের সমন্বয় সাধন অপরিহার্য।

এনজিও কর্তৃক প্রকাশিত বহু পুস্তকেই সামাজিক মূল্যবোধের অবদমন হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে সকল অবস্থাসম্পন্ন লোকই খারাপ নয়। তাহলে সমাজের বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এ ভাবে বিস্তার লাভ করতে সক্ষম হতো না।

এনজিও সমূহের জন্য বিভিন্ন প্রকারের ফান্ড এর সরবরাহ হয়ে থাকে- বাড়তি অর্থ, ব্যক্তিগত ফান্ড, গুপ্ত ফান্ড, ব্যক্তিগত কর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প ফান্ড। এ সকল সরবরাহকৃত ফান্ডসমূহের অনেক সময়েই কোন প্রকার স্পষ্ট প্রমাণ বা স্বচ্ছ গতি পরিলক্ষিত হয় না। অনেক সয়ে নন-স্যালারাইড বিদেশী প্রতিনিধিও বহু এনজিওতে সম্পৃক্ত থেকে কর্মকান্ড সম্পন্ন করে থাকে, যাদের উদ্দেশ্য থাকে বিশেষ কোন মিশন সম্পন্ন করা। এনজিও'র এর সকল কার্যক্রম ব্যুরোর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে আনার পদক্ষেপ নেয়া অত্যন্ত জরুরী হিসাবে বিবেচিত হওয়ার দাবী রাখে। আবার অন্যদিকে দেখা যায় অনেক এনজিও ব্যক্তিগত উদ্যোগে ভাল ফল অর্জন করতে সফল হলেও মন্ত্রণালয় থেকে নিবন্ধীকরণের প্রক্রিয়া সম্পন্নের ক্ষেত্রে সফলতা লাভ সম্ভব হচ্ছে না।

পাকিস্তান এবং মালয়েশিয়াতে 'ওয়াকফো বোর্ড' ও 'যাকাত বোর্ডে'র দারিদ্র্য নিরসন প্রক্রিয়া গ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অবদান রাখার প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। এই ধরনের প্রক্রিয়া আমাদের দেশেও সুফল বয়ে আনতে পারে।

আমাদের সার্বিক সরকারী ব্যবস্থাপনার মধ্যে জবাবদিহিতা এবং দায়বদ্ধতার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে, বরং এ সকলের বিরাজমানতা এনজিওদের মধ্যে রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। তাছাড়া আমাদের সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে দায়বদ্ধতা নেই বললেই চলে। আমাদের ভৌগোলিক ভিন্নতার কারণেও অলসতা রয়েছে। সাম্প্রতিক আইএফএম-এর প্রতিবেদনে আমাদের উন্নয়ন কর্মকান্ডে আরও গতি আনয়নের লক্ষ্যে উৎপাদনশীল খাতে অর্থের সরবরাহ/বিনিয়োগ বৃদ্ধি করার উপর জোড় তাগিদ প্রদান করা হয়েছে।

যে সকল এনজিও আমাদের দেশে নিবন্ধীকরণের প্রক্রিয়া সম্পাদনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না, তাঁরা কিভাবে কাজ করার অনুমতি লাভ করে সে বিষয়ে প্রশ্নের অবকাশ রয়েছে। বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে কো-অর্ডিনেশন এবং মনিটরিং এর জন্য এনজিও'র অফিস থাকার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ড সরকারী মনিটরিং-এ সম্পাদিত হওয়া দরকার। এ ক্ষেত্রে এনজিওসমূহ কেবল প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে। সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রমে সফলতা লাভ করা আমাদের জন্য অত্যন্ত দূরূহ ব্যাপার। এ ধরনের কার্যক্রমের জন্য ইংল্যাণ্ডে কোনো প্রকার বিশেষ শিক্ষা বা উপকরণ নেই, কেবল গতানুগতিক দুই/ একজনের মেমোরি ও রিকলিং এর সহায়তার মাধ্যমে গণশিক্ষা বা ব্যাপক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

এনজিওদের উন্নয়ন কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে দারিদ্র্য দূরীকরণসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের সফলতা, তাদের দৃষ্টি ভঙ্গির উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। কিছু সংখ্যক এনজিও একদিকে যেমন সামাজিক তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে অন্যদিকে বহু সংখ্যক এনজিও তাদের নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও ফায়দা অর্জনের ক্ষেত্রেই অধিকভাবে উৎসাহী থাকে। অনেক এনজিও'র ভূয়া রেজিষ্ট্রেশন রয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। অনেকে আবার তাদের কর্মচারীদের নিয়মিত বেতন পর্যন্ত প্রদান করেন না, এ ধরনের অভিযোগ পাওয়া যায়। এমনকি তাদের চাকুরীর পর্যাপ্ত নিশ্চয়তা তো নেই এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের নিয়োগ পত্র পর্যন্ত প্রদান করা হয় না।

এনজিওসমূহ বর্তমানে আমাদের সরকারী উন্নয়ন কর্মকান্ডের সহায়তায় তাদের সমান্তরাল কার্যক্রম সম্পাদনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে, কিন্তু কোন এনজিও যাতে আমাদের ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের সহায়কমূলক কোনো কর্মকান্ড সম্পন্নের ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করতে না পারে সে বিষয়ে এনজিও ব্যুরোর মাধ্যমে মনিটরিং এর ব্যবস্থা থাকা অত্যন্ত বাঞ্চনীয়। এনজিওসমূহ যাতে বিদেশী দাতাদের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থের এজেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন না করে সে বিষয়েও সরকারের পক্ষ থেকে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মাধ্যমে সতর্ক দৃষ্টি রাখার ব্যবস্থা করাও অত্যন্ত আবশ্যক হিসেবে বিবেচনার দাবী রাখে। ❑

www.pathagar.com

সরকারী-বেসরকারী সংস্থা : দারিদ্র্য নিরসন

উন্নয়নশীল দেশসমূহের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এনজিও'র গুরুত্ব সম্পর্কে নতুন করে বলার কোনো অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। সত্তুরের উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড় ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকেই যুদ্ধ বিধ্বস্ত এই দেশের পুর্নবাসন ও পুনর্গঠনের সহায়তার জন্য এন. জি. ও সমূহ তাদের কর্মকান্ড শুরুর মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে অবস্থান করে নিতে থাকে। পুনর্বাসন কর্মকান্ড থেকে শুরু করে বর্তমানে দারিদ্র্য নিরসন সহ সামাজিক অবকাঠামোমূলক কর্মকান্ডেও এদের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করে অনেক ক্ষেত্রেই সফলতার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হচ্ছে। এটা আমাদের মতো জনঅধ্যুষিত, বেকার সমস্যা সংকুল আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের গতি সঞ্চারণের ক্ষেত্রে ধনাত্মক মাত্রা সংযোজন করতে সমর্থ হবে বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। এনজিওসমূহ যথাযথভাবে এদের কর্মকান্ড সম্পাদন করতে সফল হলে আমাদের অনুন্নত অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আরও গতি সংযোজিত হওয়ার অবকাশ থাকবে বলে প্রত্যাশা করা যেতে পারে।

স্বাধীনতার পূর্বে বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের (এনজিও) তৎপরতা তেমন লক্ষ্যণীয় ছিল না। ১৯৭০ সালের উপকূলীয় ঘূর্নিঝড় ও ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের পর এদেশের জনসাধারণের মধ্যে ত্রাণ, ঔষধ, স্বাস্থ্যসো ও আশ্রয়জনিত পুনর্বাসন কাজে নিয়োজিত হয় বেশ কিছু সংখ্যক দেশী ও বিদেশী এন.জি.ও। ব্র্যাক, গণস্বাস্থ্য-এর মতো বাংলাদেশী এনজিও সমূহ তখনই সংঘবদ্ধ হয়। আর গ্রামীণ ব্যাংক কোনো এনজিও না হলেও, কিন্তু এনজিও হিসাবে ব্যাপকভাবে এটি বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভ করেছে।

গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির মধ্যে শিক্ষা, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ সংরক্ষণ, দারিদ্র্য বিমোচনসহ সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এন.জি.ও কর্তৃক বহুমূখী কর্মসূচী গ্রহণ করে জনসাধারণের দোর গোড়ায় এদের সেবাধর্মী কার্যক্রম পৌছে দেয়ার ক্রমবর্ধমান মাত্রা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এনজিও ব্যুরোর সাথে নিবন্ধনকৃত ২,৪২৮টি এনজিও কর্মরত রয়েছে। এছাড়া সমাজ সেবা অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ সহ অন্যান্য সরকারী বিভাগের সাথে প্রায় ২০ সহস্রাধিক এনজিও নিবন্ধনকৃত হয়ে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নিয়োজিত আছে। ১৯৯০ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক স্থাপিত পল্লী সহায়ক ফাউন্ডেশন ইতোমধ্যে ১৩৫টি বাংলাদেশী এনজিও'র মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে সরাসরি অবদান রাখছে।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বর্তমান ধারাকে আরও যুগপোযোগী ও টেকসই রাখার লক্ষ্যে সরকারের ব্যাপক কার্যক্রমের পাশাপাশি এনজিওদের সক্রিয় ভূমিকা বাংলাদেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সুদূরপ্রসারী ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে প্রত্যাশা করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

বর্তমান যুগে উন্নয়নের গতিধারার প্রবাহের মাত্রা বৃদ্ধির জন্য এন.জি.ও সমূহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে বলে বিভিন্ন দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার চিত্র পর্যালোচনা করলে সহজেই অনুমান করা যায়। আমাদের দেশ অত্যন্ত দরিদ্র, যার রয়েছে বিশাল জনসংখ্যার ভার এবং এই বিশাল জনসংখ্যা নিয়ে আমরা নিপাতিত হচ্ছি দারিদ্র্যের দুষ্টু চক্রের মাঝে। আমাদের অর্থনীতি এখনও কৃষি নির্ভর। যদিও পৃথিবীর অনেক দেশ কৃষি নির্ভর হয়েও ২০/২৫ বছরের ব্যবধানে উন্নয়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ে পৌছে গিয়েছে। কিন্তু আমরা যেন ক্রমাগতভাবে সেই একই অবস্থানেই রয়ে যাচ্ছি। তাই আমাদের বিশাল জনগোষ্ঠীকে যদি আমরা সমস্যা না ভেবে এদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে সম্পদে পরিণত করতে পারি, তাহলে দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা সংযোজিত হওয়ার অবকাশ থাকবে বলে প্রত্যাশা করা যায়। এক্ষেত্রে আমাদের দেশের এন.জি.ও সমূহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হতে পারে, যার প্রতিফলন ইতোমধ্যে আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান থেকে অবলোকন করা যায়।

এনজিও সমূহ এদেশের বেকারদের এক বিরাট অংশকে চাকুরীর সুযোগদানের মাধ্যমে বেকার সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে কিছুটা সুযোগ সৃষ্টিতে সফল হচ্ছে বলে অনুমিত হচ্ছে। এনজিও'র সংখ্যা পরিবৃদ্ধির সাথে-সাথে এই সুযোগের ব্যাপকতা লাভের অবকাশ সৃষ্টি হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

এনজিও সমূহ কেবল যে চাকুরী সৃষ্টির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে তা নয়, বরং গ্রাম বাংলার আপামর দরিদ্র জনগোষ্ঠি, যাদের একমাত্র সম্পদ কায়িক শ্রম তা পূর্বে নিষ্ক্রিয় ছিলো, তখন ছিলো না কোনো সুযোগ, সামান্য মূলধন যা দিয়ে একটি জাল কিনে মাছ ধরে অথবা অল্প কোনো ছোটখাটো ব্যবসা পরিচালনা করে ঘরের অন্নের সংস্থান করতে পারে। সেক্ষেত্রে এনজিওসমূহ এ ধরনের লোকদের সামান্য পুঁজি প্রদান ও আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে অসহায়, বিধবা থেকে শুরু করে কামার, কুমার, তাঁতী, কৃষক, জেলের মতো ব্যাপক জনগোষ্ঠিকে কর্মের সন্ধান দিয়ে যাচ্ছে। যার প্রভাবে কয়েক কোটি লোকের ন্যুনতমভাবে বেঁচে থাকার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে বলে আমাদের বিরাজমান অবস্থার আলোকে প্রতীয়মান হচ্ছে। এই বিশাল জনগোষ্ঠী পূর্বে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের বাইরে অবস্থান করছিলো, কিন্তু এনজিওদের দেয়া প্রতিশ্রুতি ও প্রশিক্ষণ এদেরকে অর্থনৈতিক মূলধন সৃষ্টিতে সফল করে তুলছে। আমাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গতি সঞ্চারণের ক্ষেত্রে তা সহায়ক হিসাবে বিবেচনার দাবী রাখে।

স্বাধীনতা উত্তর এই ২৪ বছরে বাংলাদেশে ৪৩৪ জন কোটিপতির সৃষ্টি হয়েছে। জমির অপ্রতুলতা হেতু প্রতিনিয়ত বেড়ে যাচ্ছে ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা। কিন্তু এ সকল অবস্থা আমরা নিরসন করব, না প্রতিরোধ করবো তা আমাদের সামর্থ্য, প্রয়োজন ও বিরাজমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার আঙ্গিকে ভেবে দেখার অবকাশ রয়েছে। আমাদের বিরাজমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার আলোকে ট্রাইড ডাউন এ্যাফেক্ট-এর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনের ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করা সম্ভব হবে বলে মনে হচ্ছে না। দারিদ্র্যের জন্য প্রবর্তিত ঋণ কর্মসূচী, এর উদ্দেশ্যকে অনেকটা ব্যাহত করেছে বলে অনুমিত হচ্ছে।

www.pathagar.com

এনজিওদের সরকারের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দেখার কোনো যৌক্তিকতা আছে বলে মনে হচ্ছে না। পূর্বে এক সময়ে আমাদের বাম রাজনৈতিক দলের ভায়েরা এনজিও সমালোচনায় সরব হয়ে উঠতেন। পল্লী সহায়ক কর্মসূচীর মাধ্যমে বেশ কিছু সম্পদ গরীবের কাধে যাচ্ছে বলে তাদের কর্মকান্ডের ব্যাপ্তিও বাস্তবতার আলোকে প্রতিভাত হচ্ছে।

বর্তমানে বিভিন্ন মহল থেকে উচ্চারিত এনজিও কর্তৃক বিকল্প সরকার গঠন সম্পর্কিত সন্দেহের কোনো যৌক্তিকতা আছে বলে মনে হচ্ছে না। বরং একে এনজিও কার্যক্রম পিছিয়ে রাখার কৌশল হিসাবে বিবেচিত হবার দাবী রাখে। বর্তমান রাজনৈতিক অচলাবস্থা নিরসনের ক্ষেত্রে এনজিওসমূহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হতে পারে। এনজিও কার্যক্রমের আরও ব্যাপ্তি লাভ ও দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রাখার সফলতার জন্য এনজিওদের আরও স্বাধীনতা দেয়ার আবশ্যকতা রয়েছে। এরই সাথে তাদের স্বীয় বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে সফলভাবে কর্মকান্ড পরিচালনের ক্ষেত্রেও সুযোগ থাকা অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় হিসাবে বিবেচনার দাবী রাখে। উন্নয়নের আরো সফল অংশীদারিত্বের সুযোগ সৃষ্টির প্রত্যাশার মাঝে ব্যাংক, এনজিও ও সরকারের মধ্যে সেমিনারের আয়োজন সুফল বয়ে আনতে পারে বলে বিরাজমান অবস্থার আলোকে অনুমিত হচ্ছে।

যে কোনো ধরনের উন্নয়ন প্রকল্পের ধ্যান ধারণার অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সামঞ্জস্যতা থাকা বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে NGO-দের Total Coverage থাকার আবশ্যকতা রয়েছে।

আমাদের সরকারী খাতসমূহের কার্যক্রম তেমন সন্তোষজনক নয় বলে ব্যাপক জনশ্রুতি রয়েছে। এনজিও-সরকারের সম্পর্ক, এনজিও-জনগণের সম্পর্ক, সরকার-এনজিও সম্পর্ক-এই তিনটি বিষয়ের সফল সামঞ্জস্যতার মাধ্যমে উন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখা সম্ভব হতে পারে। ছোট এনজিওসমূহ কি ধরনের কর্ম সম্পাদন করছে তা সহ বড়-বড় এনজিওদের ভূমিকা ও তাদের কর্মদক্ষতা বিবেচনায় নেয়ার আবশ্যকতা রয়েছে। তাছাড়া আরো প্রয়োজন রয়েছে স্থানীয় সরকারের ও এন.জি.দের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের। কমিউনিটি সাপোর্ট ও পার্লামেন্ট সাপোর্টের নিশ্চয়তার মাধ্যমে এন.জি.ও. কর্মকান্ডের ব্যাপ্তি ঘটিয়ে দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে আরও ধনাত্বক অবদান রাখা সম্ভব হতে পারে।

আমাদের সমাজের বিভিন্ন সমস্যার কারণে বহু সম্পত্তি বিনষ্ট হচ্ছে, যার সুরাহা অনেক ক্ষেত্রে ফ্যামিলি কোর্টের মাধ্যমেও সমাধান করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। ডিভোর্স-এর ক্ষেত্রে ভরণ পোষণের সমঝোতায় পৌঁছানোর জন্য একটি সম্মানজনক সমাধান আনয়নের আবশ্যকতা দেখা যায়। এক্ষেত্রে এনজিওসমূহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক ও পারিবারিক অস্থিরতা দূর করতে সক্ষম হতে পারে।

উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প নেয়া বাঞ্ছনীয়। যদিও অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার কারণে প্রকল্পসমূহ বন্ধ বা পরিত্যক্ত হওয়ার প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। বর্তমানে বিএডিসি'র কার্যক্রমে পরিবর্তন আনয়নে ৬০০ গোডাউন খালি অবস্থায় পড়ে আছে। আমাদের দেশে

www.pathagar.com

বর্তমানে বিরাজমান ভূমিহীনদের অবস্থা খতিয়ে দেখার আবশ্যকতা রয়েছে। এক্ষেত্রে এনজিও এবং সরকারের মধ্যে সহযোগিতামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হবার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, সমাজের অধিকাংশ 'এলিট' নারীদের ভাগ্যোন্নয়নের পক্ষে নন।

বর্তমান সরকার ও এনিজিও'র মধ্যে দ্বন্দ্ব বিরাজমান। আমাদের সরকারী পরিসংখ্যানের মধ্যে মিথ্যার সমন্বয় থাকায় প্রকৃত আর্থ-সামাজিক অবস্থার চিত্র পাওয়া যায় না। দেশের মাত্র ১৭ শতাংশ লোক সরকার ও এনজিও ঋণ কর্মকান্ডের আওতাভুক্ত রয়েছে। বর্তমানে শহরের ১/৩ অংশ লোক বস্তিতে বসবাস করে। দারিদ্র্যের অনুকূলে ঋণ কার্যক্রমের পরিচালনার মাধ্যমে 'ব্র্যাক' ৪০ শতাংশ এবং 'গ্রামীণ ব্যাংক' ৬০ শতাংশ মুনাফা অর্জন করছে বলে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায়।

আমাদের প্রেক্ষিত পরিকল্পনার আওতায় দারিদ্র্য নিরসনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে। দারিদ্র্য নিরসনের ক্ষেত্রে Big Push-এর কার্যক্রম গ্রহণের আবশ্যকতা রয়েছে। দারিদ্র্য নিরসনের সহায়তার ক্ষেত্রে ঋণ কর্মসূচী সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করে গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডঃ মোঃ ইউনুস উল্লেখ করেছেন, আমাদের দেশে ঋণ পাওয়া মৌলিক অধিকার হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে।' ঋণ বিতরণের মাধ্যমে দরিদ্র জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এনজিওসমূহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে। এক্ষেত্রে আরো সফলতা লাভের প্রত্যাশায় গরীবদের সহায়তা দানের জন্য 'ভিন্ন ফান্ডের' ব্যবস্থা রাখার আবশ্যকতা রয়েছে।

এনজিওসমূহ সরকারের সহায়ক অংগ হিসাবে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত হ'তে পারে। এদের কার্যক্রম স্বভাবতই: Cost Effective হওয়া আবশ্যক। এক্ষেত্রে TTDC এবং অন্যান্য মডেলসমূহ ব্যবহৃত হবার অবকাশ রয়েছে। এনজিও'র অর্থ অবমুক্তির ক্ষেত্রে নিম্ন পর্যায়ের (Bottom level) সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা থাকা অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়।

আমাদের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ সামাজিক নেতা হিসাবে দারিদ্র্য নিরসন সহ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হতে পারে। মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ায় 'মক্তব' ভিত্তিক, বার্মা, শ্রীলংকাতে 'প্যাগোডা' ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসারতা লাভ করেছে। এর সফল ব্যবহার আমাদের দেশেও করা যেতে পারে এবং এতে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভের সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল বলে প্রত্যাশা করা যেতে পারে।

আমাদের দারিদ্র্য নিরসনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য মাত্রা অর্জনের প্রত্যাশায় ঋণের ব্যবহারকারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করণের আবশ্যকতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। যুব অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত THARDEP প্রকল্পের ক্ষেত্রে কোনো বয়স সীমার বাধ্যবাদকতা না থাকাতে এক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সুফল পাওয়া যাচ্ছে।

এ সকল কার্যক্রমে অনেকেই অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে আগ্রহী রয়েছেন, কিন্তু যথাযথ যোগাযোগের অভাব হেতু সে সুযোগ তারা গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছে না। আমাদের

www.pathagar.com

পাবলিক মানির সিংহভাগই অপব্যবহার হয়ে থাকে। পাবলিক মানির সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করা সম্ভব হতে পারে। বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ, সেমিনার-এর মাধ্যমে এ সকল কার্যক্রমের সফলতার জন্য যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তোলা যেতে পারে। যে কোনো কার্যক্রমের দ্রুত সফলতার জন্য ডায়নামিক নেতৃত্বের আবশ্যকতা রয়েছে।

দারিদ্র্য নিরসন কর্মকান্ডে এনজিও সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে সহায়তার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংক থেকে স্থানীয়ভাবে অর্থের সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এই প্রেক্ষিতে অগ্রণী ব্যাংক থেকে 'আশা'-কে ১ কোটি টাকার ফান্ড প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকাতে এন.জি.ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে টিএনও ও জেলা প্রশাসকদের নিয়মিত তদারকি ও সমন্বয় সাধনের গুরুত্ব অপরিসীম।

আমাদের এ দারিদ্র্য— হাজার বছরের বঞ্চনা, নিষ্পেষণ ও শোষণের ফল। সহজেই তা নিরসন সম্ভব নয়, বরং বর্তমানে কেবল তার উপশমের ব্যবস্থা নেয়াই যুক্তি সংগত। এক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃসম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকার আবশ্যকতা রয়েছে। কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে আর্থ-সামাজিক সহ যে কোনো সমস্যার সমাধান বাইরে থেকে চাপিয়ে দেয়ার প্রবণতা, যা অধিক ক্ষেত্রে বিরাজমান। ❑

www.pathagar.com

এনজিও'র মাধ্যমে কৃষি ঋণ

তিনশ' কোটি টাকার বার্ষিক কৃষি ঋণ বিতরণের নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে এনজিওদের হাতে ছেড়ে দেবার দাবী জানানো হয়েছে। জানুয়ারী ৮,১৯৯৭ ঢাকায় কৃষি মন্ত্রণালয় এবং এডাব আয়োজিত এক কর্মশালায় এ দাবী জানানোর পাশাপাশি সরকার ঘোষিত কৃষি ভর্তুকির ১শ' কোটি টাকার বাজেটও এনজিওদের সুপারিশেই ব্যয় করার পরোক্ষ আহবান জানানো হয়েছে।

কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয় প্রধানতঃ কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে। সারা দেশে কৃষি ব্যাংকের নেটওয়ার্ক রয়েছে এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীও রয়েছে। এবার থেকে কৃষি ঋণ বিতরণের পুরো ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ যদি সম্পূর্ণভাবে এনজিওদের হাতে তুলে দেয়া হয়; তাহলে, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক দু'টির হাজার হাজার কর্মকর্তা ও কর্মচারীরাই বা কোন্ কর্মকান্ডে জড়িত থাকবে, এই প্রশ্ন কোনভাবেই এড়িয়ে যাওয়ার মত নয়। কারণ, এ সাথে জড়িত কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি ঋণ বিতরণের জন্য প্রতিষ্ঠিত দেশব্যাপী অবকাঠামোর অস্থিত্বের প্রশ্নটি। একটি প্রতিষ্ঠিত অবকাঠামোকে বর্জন করার যেমন যথেষ্ট যুক্তি থাকা আবশ্যক; তেমনি, কৃষি ঋণ বিতরণের প্রক্রিয়াটি যে ব্যবস্থায় ন্যস্ত করার দাবী ওঠেছে, সেই ব্যবস্থার সাধারণ গ্রহণযোগ্যতাও নিরপেক্ষভাবে বিবেচিত হওয়া উচিত।

এনজিওদের মাধ্যমে কৃষি ঋণ বিতরণের দাবী যখন এনজিওদের পক্ষ থেকে উচ্চারিত হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই এ প্রশ্ন জাগে যে, কৃষি ঋণ বিতরণের প্রচলিত পদ্ধতি কি সত্যি ব্যর্থ হয়ে গেছে? উল্লেখিত কর্মশালায় পঠিত এক প্রবন্ধে বলা হয়েছে, দেশে ব্যাংকগুলো তাদের দূর্নীতি ও নানা সীমাবদ্ধতার কারণে দরিদ্রদেরকে বর্তমানে ঋণ দিতে এবং আদায় করতে ব্যর্থ হচ্ছে। এক কথায় এ বক্তব্য কেউ মেনে নেবেন না। কেননা, এ ধরনের মন্তব্য বিতর্কাতীত হতে পারে না। বলার অপেক্ষা রাখে না, ব্যর্থতা বা সাফল্যের পেছনে কিছু কারণ নিহিত থাকে এবং এ কারণগুলোর বিবেচনাই জরুরী বিষয়। এই বিবেচনায় না নেমে ঢালাওভাবে দেশের ব্যাংকগুলোকে ব্যর্থ বলে দেয়ার পেছনে কোনো গূঢ় উদ্দেশ্য লুকায়িত থাকলেও থাকতে পারে; তবে, এতে করে, দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ব্যাংকিং সেক্টরের কার্যকর তৎপরতা গ্রহণের ব্যাপারে কোনো আলোকপাত করা যাবে না। কৃষি ব্যাংকের কথাই যদি ধরা যাক; তাহলে দেখা যাবে, কৃষি ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে গ্রাম্য টাউট-বাটপারদের সাথে ব্যাংকের একশ্রেণীর অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীর যোগসাজশের দরুণ প্রকৃত ঋণ প্রাপকদের ক্ষেত্রেও শৈথিল্য ও উদাসীনতা লক্ষ্য করা গেছে। অর্থাৎ, নানাভাবে অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রশ্রয় এক্ষেত্রে দেখা গেছে। কিন্তু, এই অনিয়ম ও দূর্নীতি দূর করে কৃষি ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রমকে সব ধরনের প্রভাবমুক্ত এবং অনাবিল ও সক্রিয় করে তোলার কার্যকর উদ্যোগ কখনো গ্রহণ করা হেয়েছে কিনা সে বিষয়ে প্রশ্নের অবকাশ রয়েছে।

কৃষি ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম অতি জরুরী, এ প্রশ্নের ইতিবাচক

www.pathagar.com

জবাব দেয়া যাবে না। কাজেই, কৃষি ব্যাংকের কার্যক্রমকে দোষারোপ করার মধ্যে কোনো উদ্দেশ্য নিহিত থাকলেও তা যথেষ্ট যুক্তি শানিত ও বাস্তবোচিত নয়।

দ্বিতীয়তঃ এনজিওদের ঋণ দান কার্যক্রম একেবারে বিতর্কাতীত একথাও কেউ বলতে পারবে না। এছাড়া, উল্লেখিত কর্মশালায় এক প্রবন্ধে একথাও বলা হয়েছে যে, 'সরকার মাত্র ৪ শতাংশ হারে সুদে এনজিওদেরকে প্রতিবছর ৩শ' কোটি টাকার উক্ত ঋণ হস্তান্তর করবে এবং তারা ঋণ গ্রহণকারী কৃষকদের থেকে যুক্তিসঙ্গত সুবিধানজক হারে সুদ আদায় করবে।' এই হারটা কত তা কিন্তু বলা হয়নি। এনজিওদের বিতরণকৃত ঋণের সুদের উচ্চ হার নিয়ে ইতোমধ্যে যথেষ্ট অভিযোগও উত্থাপিত হয়েছে। ৩শ' কোটি টাকার বার্ষিক কৃষি ঋণ নিয়ে এনজিওগুলো যে প্রকৃতপক্ষে এক ধরনের ব্যবসায় নেমে পরতে পারে- এই সন্দেহ থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ কোথায়? আর এ কারণেই যে, কৃষি ঋণ এনজিওদের মাধ্যমে বিতরণের দাবী জানানো হচ্ছে তা-ও অবিশ্বাস্য নয়।

কর্মশালায় উপস্থিত কৃষিমন্ত্রী কিন্তু বলেছেন, কৃষি ক্ষেত্রে সরকারের সহযোগিতা যাতে এনজিও'র মাধ্যমে কৃষকদের হাতে পৌঁছে দাতা সংস্থাগুলো তা পছন্দ করে। আবার তিনিই বলেছেন, কৃষি উন্নয়নের সরকারী প্রচেষ্টার সাথে এনজিওগুলোর ভূমিকা কার্যকরভাবে বাড়ানোর লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা যাবে। কারণ, কৃষি ক্ষেত্রে বিরাট সমস্যার বোঝা সরকার একা বইতে অক্ষম। কৃষিমন্ত্রীর এই উভয় বক্তব্যেরই বিশেষ অর্থ আছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। তবে, কৃষি ব্যাংক কৃষি ঋণ বিতরণে ব্যর্থ হয়ে গেছে- এমন আভাস নেই। আর দাতা সংস্থার পছন্দ অপছন্দের চাপ নতুন বিষয় নয়। তবে, আমাদের কৃষিকে রক্ষা করতে হলে, নয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষায় না গিয়ে বিদ্যমান অবকাঠামোকেই যুৎসই ও কার্যকর করে তোলার পদক্ষেপ নিতে হবে এবং কৃষি ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রেও এই ধারার অনুসরণই হবে অধিকতর কার্যকর। ❑

www.pathagar.com

ইউএনডিপি'র এনজিও কাহিনী

ইউএনডিপি'র সদ্য প্রকাশিত রিপোর্ট-এ বাস্তব জরিপের ভিত্তিতে বাংলাদেশের এনজিও তৎপরতার মূল্যায়নে বলা হয়েছে- এনজিওদের প্রদত্ত ঋণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর তেমন উপকারে আসছে না। অন্যদিকে, এ ঋণ সহজে ফেরত দেয়া যায় না। এছাড়া, এনজিওদের ঋণের পরিমাণ অল্প। কিন্তু সুদের হার, ঋণদাতাদের দুর্ব্যবহার এবং ঋণ গ্রহীতাদের হয়রানি অধিক। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিককালে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থাসহ দাতা দেশ ও সংস্থাগুলো বাংলাদেশের উন্নয়নে এনজিও'র ভূমিকার উপর খুব বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। বহু ক্ষেত্রেই সরকারী পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রমকে এনজিও পর্যায়ে প্রবাহিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহের সাহায্যদাতা দেশ ও সংস্থার জোর তাগিদেই। বাস্তব ক্ষেত্রে, পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে, এদেশে উন্নয়ন প্রকল্প মানেই এনজিওদের প্রকল্প। এনজিও তৎপরতা ছাড়া যেন উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা সম্ভব নয়। এনজিওদের পক্ষ থেকে যে ধরনের প্রচার-প্রচারনা চালানো হচ্ছে, তাতে পরিস্থিতি এখন এরকমই দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ দেশের উন্নয়নে সরকারের আর কিছু করার নেই এবং যাদের জন্য উন্নয়ন কর্মকান্ড- সেই জনগণেরও যেন কিছু করার নেই। শুধু এনজিওদের অস্তিত্ব থাকলেই যেন দেশটি তরতরিয়ে উন্নয়নের শীর্ষ সোপানে গিয়ে হাজির হবে।

কিন্তু, বাস্তব ক্ষেত্রে এনজিওদের তৎপরতা দেশের উন্নয়ন, দেশের মানুষের উন্নয়ন কতটুকু করছে, এই প্রশ্ন বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে আলোচিত হয়েছে। তাদের তৎপরতা যে বিশেষ ইতিবাচক ফল দিচ্ছে না এবং যেসব কারণে দিচ্ছে না- তাও কম-বেশি আলোচিত হয়েছে। কিন্তু, রূঢ় বাস্তবতাকে অগ্রাহ্য করে আর যাই হোক, জনগণের এবং দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। এতদিন এনজিও কার্যক্রম সম্পর্কে ওসব কথা বা মূল্যায়ন এনজিওদের বিরাগের কারণ হতো।

এখন ইউএনডিপি ভিন্ন সূত্রে জরিপ চালিয়ে যে রিপোর্ট তৈরী করেছে, তাতে আরো সুবিন্যস্তভাবে সেই মূল্যায়নই স্থান পেরেছে। আর এ মুল্যায়ন ইউএনডিপি'র নিজস্ব বাস্তব জরিপ অভিজ্ঞতারই ফসল। ইউএনডিপি তো এনজিওদের ভুমিকাকে অন্যান্য দাতা দেশ ও সংস্থাগুলোর মতই খুব বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। কাজেই, ইউএনডিপি যে পক্ষপাতমূলক কারণে এই জরিপ চালিয়েছে বা এই মূল্যায়ন করেছে- এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। তাদেরই বড় সমর্থক জাতিসংঘ সংস্থার পক্ষ থেকে প্রকাশিত এই জরিপ মূল্যায়নও বাংলাদেশের এনজিওদের বিরাগের কারণ হবে কিনা জানি না। তবে, ইউএনডিপি'র এই মূল্যায়ন বাংলাদেশে এনজিও তৎপরতার মৌলিক, ফাঁক-ফাঁকি ও বিচ্যুতির এক বড় অংশকেই তুলে ধরেছে- একথা সত্য। এ প্রসঙ্গে ইউএনডিপি'র আলোচ্য রিপোর্টের কিছু অংশ উদ্ধৃত করতে হয়। এতে বলা হয়েছে: "এনজিওগুলো গরীব জনমানুষের কাছে বেশি পরিচিত তাদের ঋণদান কর্মসূচীর কারণেই। কিন্তু, যাদের জন্য এই ঋণ তারাই অনেক সময় এনজিওদের সেবার মান সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশ

www.pathagar.com

করেছেন। এর কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ খুব কম। এতে দরিদ্র মানুষের প্রয়োজন মিটে না। এই অর্থ কোন উৎপাদনশীল কাজে ব্যয় করা যায় না। ঋণ ফেরত দেয়ার শর্তগুলো কঠিন। সুদের মহাজনসুলভ চড়া হার এবং সাপ্তাহিক কিস্তি তো আছেই, তার ওপর বিভিন্ন স্থানে এনজিও'র মাঠকর্মীরা দরিদ্র জনসাধারণের সাথে খারাপ আচরণ করে থাকে। এত সব হয়রানির ফলে ঋণদাতা হিসেবে এনজিও'র ভূমিকা সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না।.... দরিদ্র জনগোষ্ঠী মনে করে ঋণ সহায়তা প্রদান করা সরকারের দায়িত্ব, এনজিওদের নয়।' এতো গেল ঋণ প্রসঙ্গে এনজিওদের ভূমিকার রূঢ় বাস্তব সত্যের বিবরণ।

এছাড়াও রিপোর্টেই রয়েছে, উন্নয়ন প্রকল্পের অংশীদার হিসেবে দরিদ্র মানুষের মতামত কেউ নেয় না কিংবা এর গরজও বোধ করে না। ফলে, দরিদ্র বৃদ্ধি পায়।" এতে দু'টি বিষয় পরিষ্কার হয়ে ওঠেছে যে, দরিদ্র মানুষকে ঋণদানের ব্যাপারে এনজিও'র নয়; বরং সরকারই সকল দিকের বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য এবং যাদের উন্নয়ন তাদের মতামত না নেয়ায় দারিদ্র্য কমছে না' বরং বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রথমতঃ সরকারের উন্নয়ন তৎপরতাকে হেয়পতিপন্ন করানোর পেছনে যে বাস্তব কারণ নেই; বরং রয়েছে এনজিওদের ভান্তিকর তৎপরতা-এটা যথেষ্ট স্পষ্ট।

দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশের জনগণের আবেগ-অনুভূতিকেও ধসিয়ে দিচ্ছে।

ফলে, একদিকে দরিদ্র লোকের বৃদ্ধি পাচ্ছে; অন্যদিকে, ধর্মীয়-সামাজিক মূল্যবোধ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ায় মানসিক পীড়নেরও শিকার হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষ।

ইউএনডিপি'র রিপোর্টে প্রকাশিত এই বাস্তবতা এদেশের কর্মরত এনজিও এবং তাদের সমর্থনকারী দাতা দেশ ও সংস্থাগুলোর কতটুকু চৈতন্যোদয় ঘটাতে পারবে তা অনুমান করা সম্ভব হচ্ছে না। এরপ্রেক্ষিতে এনজিও'র তৎপরতা সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকারের বাস্তবোচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে ওঠছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। ❑

www.pathagar.com

এনজিও'র কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

বিশ্বব্যাংক এনজিও'র তৎপরতা সম্পর্কে তথ্য প্রকাশের প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে উল্লেখ করেছে, তাদের অর্থ সরবরাহের স্বচ্ছতা জবাদিহিতার উন্নতি ঘটাবে। 'অভিন্ন লক্ষ্যের সন্ধানে সরকার ও উন্নয়নকামী এনজিওদের মধ্যকার সম্পর্ক জোরদারকরণ' শীর্ষক সাম্প্রতিক এক রিপোর্ট-এ বিশ্বব্যাংক বলেছে, জবাবদিহী ও স্বচ্ছতার মধ্যে থাকতে হবে তাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও অর্থ কাজে লাগানোর বিশদ বিবরণ প্রকাশ। বিশ্বব্যাংক রিপোর্ট-এ সুপারিশ করেছে যে, সরকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে এনজিও'র কর্মসূচীতে অর্থ প্রদানের বিষয় বিবেচনা করতে পারে। সরকার ও এনজিও'র মধ্যকার ভবিষ্যৎ সহযোগিতায় পারস্পরিক কাজকর্মে আরও খোলা মন থাকতে হবে।

১৯৭৪-এর মন্বন্তরকে কেন্দ্র করে এনজিওগুলো এদেশে ব্যাপকভাবে কর্মতৎপরতার সূচনা করে। এরপর এনজিওগুলো গ্রামীণ উন্নয়নের নামে তাদের কর্মতৎপরতা সম্প্রসারিত করে। গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের নিকট ঋণ বিতরণ, সচেতনতা সৃষ্টি, শিশু শ্রমের অবসান ও মানবতার নামে তারা কর্মকান্ড চালাতে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশে সহস্রাধিক এনজিও- বাংলাদেশ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয় যে, দেশের আনাচে-কানাচে গড়ে ওঠা এনজিওদের অধিকাংশই দারিদ্র্য বিমোচনের জন্যে দরিদ্র জনগণকে ঋণ দেয়ার নামে প্রতারণা করে থাকে। তাছাড়া এনজিও সম্পর্কে প্রশাসনিক এককেন্দ্রিকতা, আর্থিক অনিয়ম, দুর্নীতি ও চাকরি দেয়ার নামে প্রতারণার যথেষ্ট অভিযোগ রয়েছে।

'৮৫-৮৬ অর্থবছরে সাহায্য সংস্থা 'কারিতাস'-এর বার্ষিক রিপোর্টর মুখবন্ধে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জেকরি এস পেরেরা বলেছেন, বাংলাদেশে বিদেশী সাহায্য সংস্থাগুলো বছরে ২শ' কোটি টাকা ব্যয় করে থাকে। সরকারের বহিঃসম্পদ মন্ত্রণালয়ের '৮৪-৮৫ সালের হিসেবে বলা হয়েছে যে, ওই বছরে এনজিওগুলো ২৭৭ কোটি টাকা অনুদান পেয়েছে। ১৯৮৫ সালের বাংলাদেশ ব্যাংকের এক হিসেবে দেখা যায় যে, ওই বছর ১৩২টি এনজিও সেবার নাম করে বিদেশ থেকে ২৫ কোটি ৪৬ লাখ টাকা সাহায্য এনেছে। অভিযোগ রয়েছে যে, এনজিওরা সামাজিক মূল্যবোধ ভেঙ্গে দিচ্ছে, স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে দাঁড় করাচ্ছে, মৌলবাদ বিরোধী আন্দোলনের নামে সুকৌশলে ইহুদী ও খৃষ্ট ধর্মের মাহাত্ম প্রচার করতে চাইছে।

সমাজসেবা অধিদফতরের আইনে এনজিও'র জন্য রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকলেও গত পাঁচ বছরে তারা সরাসরি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছে। তারা অনেকটা সরকারের মুখোমুখি

www.pathagar.com

দাঁড়িয়েছে। সাবেক সরকারের আমলে সরকারের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতেও দেখা গেছে। বিশ্ব ব্যাংক সরকার ও এনজিও'র মধ্যকার ভবিষ্যৎ সহযোগিতা বৃদ্ধির যে পরামর্শ দিয়েছে তাতে একটি দ্বৈত সরকার কাঠামোর ইঙ্গিত রয়েছে। বর্তমানে এনজিও বাংলাদেশে একটি অলিখিত রাজনৈতিক গোষ্ঠী। ধীরে ধীরে এই গোষ্ঠী সরকার ও প্রশাসনে একটি শক্ত ভিত্তি তৈরি করে চলছে। ১২ই জুনের ১৯৯৬-এর নির্বাচনেও এরা অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল।

বিশ্বব্যাংক এনজিওগুলোর অর্থের হিসাব ও স্বচ্ছতা প্রকাশের যে পরামর্শ দিয়েছে, তা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব। সেবা ও উন্নয়নের নামে প্রতিমাসে যেহারে এনজিও জন্ম নিচ্ছে এবং তারা এত কোটি কোটি টাকা কোথায় পাচ্ছে তা সরকার ও দেশবাসীর জানা উচিত। বিদেশীরা কেনই বা কোটি কোটি টাকা সাহায্য দিচ্ছে? কি তাদের স্বার্থ? দেখা যায় যে, এনজিওরা ২০ থেকে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত সুদে টাকা খাটায় গরীব মানুষের মধ্যে। অথচ ব্যাংগুলো ঋণ দিচ্ছে ১০ শতাংশ হারে। এই সুদের ব্যবসাকে তো আর সেবা বোঝায় না। সাহায্যদাতা দেশ বা গোষ্ঠীর বাংলাদেশের জন্য এত মায়া মহব্বত থাকলে ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে গরবীদের মধ্যে স্বল্প সুদে ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা করতে পারে। এনজিও করার নামে বিদেশী অর্থ মেরে দিয়ে যারা রাজনীতিতে শেকড় গাড়তে এবং মানুষের দারিদ্র্যতা নিয়ে ব্যবসা করতে চায় তাদের সম্পর্কে বিশ্বব্যাংকের পরামর্শ থাকা উচিত। এনজিওগুলো বাংলাদেশকে গরীব, নিঃস্ব, দরিদ্র হিসেবে বহির্বিশ্বে প্রচার করে যে সাহায্য আনছে, তাতে বাংলাদেশের সম্মানহানি ঘটছে। বাংলাদেশ সম্পর্কে এনজিওগুলোর এই হীনমনোবৃত্তিসম্পন্ন প্রচার প্রোপাগান্ডার জন্য বিদেশীরা পুঁজি বিনিয়োগ করতে দ্বিধান্বিত। বিদেশীরা এনজিও'র হীন তৎপরতায় বিভ্রান্ত এবং তারা মনে করছে যে, বাংলাদেশের দারিদ্র্যক্লিষ্ট জনগণ যদি কখনো অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে তাহলে ব্যবসায়ের নিরাপত্তা থাকবে না। ফলে তাদের পুঁজি ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। এনজিওগুলোর এই হীন তৎপরতা বন্ধ করার জন্য সরকারকে এখনই কার্যকর ভূমিকা গ্রহণের আবশ্যকতা রয়েছে অত্যন্ত গভীরভাবে। ❑

www.pathagar.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

নম্বর ঃ ২২.৪৩.৩.১.০.৪৬.৯৩-৪৭৮, তারিখ ঃ ১২-৪-১৪০০বাং / ২৭-৭-১৯৯৩ইং

পরিপত্র

বিষয় : বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট বাংলাদেশী বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের (এনজিও) ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালী

বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট বাংলাদেশী বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের (এনজিও) কার্যাবলী সমন্বয় ও পরিচালনার জন্য বিগত ১/৩/৯৩ইং তারিখে জারীকৃত পরিপত্র নং ২২.৪৩.৩.১.০.২৯.৯৩ (অংশ-১)-১৫৫ সংশোধনক্রমে সরকার বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম-এর ক্ষেত্রে The Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Ordinance, 1978 ও The Foreign Contribution (Regulation) Ordinance, 1982-এর আওতাধীনে সরকারের সকল দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্থ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর উপর অর্পণ করছে।

২। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো নিম্নবর্ণিত দায়িত্বসমূহ পালন করবে:

ক. একধাপে (One-stop service) এনজিও নিবন্ধন ও প্রকল্প প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
খ. এনজিও কর্তৃক দাখিলকৃত প্রকল্পসমূহ অনুমোদন, অর্থ ছাড়করণ ও বিদেশী কর্মকর্তা/পরামর্শক নিয়োগের অনুমতি প্রদান ও নিয়োগের মেয়াদ নির্ধারণ;
গ. এনজিও কর্তৃক দাখিলকৃত বিভিন্ন প্রতিবেদন, বিবরণ ও মূল্যায়ন;
ঘ. এনজিও কার্যক্রমের সংযোগ, সমন্বয়, পরিবীক্ষণ (monitoring) পরিদর্শন ও মূল্যায়ন;
ঙ. সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত বিভিন্ন ফি/সার্ভিস চার্জ আদায়;
চ. মাঠ পর্যায়ে এনজিও কার্যক্রম পরিদর্শন এবং তাদের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষণ;
ছ. দাতা সংস্থা/এনজিওসমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা;
জ. এনজিও কার্যক্রমের উপর প্রতিবেদন পরীক্ষা এবং তার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঝ. এনজিওসমূহের হিসাব নিরীক্ষার জন্য চাটার্ড একাউন্টেন্ট তালিকাভুক্তকরণ;
ঞ. এনজিওসমূহের এককালীন অনুদান গ্রহণ অনুমোদন;
ট. এনজিও সংক্রান্ত অন্যান্য সকল বিষয়াবলী।

৩। উপরোক্ত বিষয়ে সরকারের বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থার সাথে যোগাযোগ-এর মাধ্যমে তাদের মতামত গ্রহণের দায়িত্ব ব্যুরো পালন করবে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে

www.pathagar.com

উপরোক্ত দায়িত্ব পালনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং তাদের অধীনস্থ অধিদপ্তর/পরিদপ্তর ইত্যাদি এবং বিভাগীয় কমিশনারগণ ও জেলা প্রশাসকগণ যথাযথ সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।

৪। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধীনস্থ দপ্তরসমূহ বিদেশী ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট বাংলাদেশী এনজিওসমূহের সাথে কোনরূপ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর বা চুক্তিতে উপনীত হওয়ার পূর্বে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর সাথে পরামর্শ করবে। এই ধরনের চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পূর্বে বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটিকে অবশ্যই The Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Ordinace, 1978 এর 3(2) ধারা অনুযায়ী নিবন্ধনপ্রাপ্ত হতে হবে।

৫। এনজিওসমূহের প্রকল্প অনুমোদন, কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নীতিমালা অনুসৃত হবে:

ক. এনজিওসমূহ যাতে সরকারের আইন ও নীতিমালার গণ্ডীর মধ্যে তাদের কার্যপ্রণালী সুষ্ঠুভাবে অনুসরণ করে কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে পারে তা নিশ্চিত করা হবে।

খ. সরকারের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প অথবা উহার সুনির্দিষ্ট অংশ এনজিওর মাধ্যমে সম্পন্ন করা যাবে। সরকার মনে করে যে এনজিওসমূহ জাতীয় উন্নয়নে সরকারের লক্ষ্যসমূহকে এগিয়ে নিয়ে যাবে ও সরকারী প্রচেষ্টার সম্পূরক শক্তি হিসেবে কাজ করবে।

গ. বিদেশী ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট এনজিওসমূহের নিবন্ধন ও নিবন্ধন নবায়ণ-এর দায়িত্ব The Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Rules, 1978-এর বিধান মোতাবেক এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর উপর ন্যস্ত থাকবে। এইরূপ প্রতিষ্ঠানসমূহের বিনন্ধনের পূর্বে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মতি অবশ্যই গ্রহণ করা হবে। নিবন্ধন নবায়ণের ক্ষেত্রে সংস্থার অতীত কার্যকলাপ বিবেচনা করা হবে।

ঘ. বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট এনজিওসমূহ তাদের কার্যক্রম সরকার অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবে। প্রকল্প প্রস্তাবসমূহ অনুমোদনের জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে প্রদান করতে হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মতামত নিয়ে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো প্রকল্পসমূহ প্রাপ্তির ৪৫ দিনের মধ্যে অনুমোদন করবে।

ঙ. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মাধ্যমে প্রাপ্ত এনজিওসমূহের প্রস্তাবিত প্রকল্প ছক তাদের নিজস্ব পরিকল্পনা সেল দ্বারা অথবা অন্য কোন প্রকারে পরীক্ষা করে তাদের মতামত এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে জানাবে। প্রকল্পে কোন বিষয়ে আপত্তি থাকলে তার যথাযথ কারণ উল্লেখ এবং কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের প্রস্তাব থাকলে তা বিশদভাবে বর্ণনা করতে হবে। অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় তাদের অধীনস্থ অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/দপ্তর-এর মাধ্যমে পরিবীক্ষণ করবে এবং

www.pathagar.com

কোন প্রকল্পের কার্যক্রম প্রকল্প ছকের গণ্ডী অতিক্রম করলে বা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী কোন কাজ নজরে এলে তা এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর দৃষ্টিগোচর করবে।

চ. বিভাগীয় কমিশনারগণ তাদের বিভাগের মধ্যে কর্মরত এনজিওসমূহের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় করবেন। বিভাগীয় কমিশনারের পক্ষে একজন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার এ কাজটি সম্পাদন করবেন।

ছ. জেলা প্রশাসকগণ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর পক্ষে তাদের নিজ নিজ এলাকায় এনজিওদের কার্যক্রম পরিবীক্ষণের দায়িত্ব পালন করবেন। জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকগণ প্রতি মাসের সমন্বয় সভায় জেলার এনজিওসমূহের কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করবেন।

জ. যে সকল ব্যাংক এনজিওসমূহের বিদেশ থেকে প্রাপ্ত আর্থিক সাহায্যের হিসাব রাখবে তারা প্রতি ছয় মাস অন্তর সাহায্যের হিসাব (বৈদেশিক মুদ্রা সাহায্য এবং বিদেশ হতে আগত অথচ এ দেশীয় মুদ্রার প্রাপ্ত সাহায্য) বাংলাদেশ ব্যাংক ও এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালককে প্রদান করবে।

ঝ. বাংলাদেশ ব্যাংক এনজিওসমূহের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিদেশী অনুদানের বিবরণ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালককে এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রতি ছয় মাস অন্তর প্রেরণ করবে।

ঞ. কোন ব্যাংক এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর অর্থ ছাড়ের অনুমোদনপত্র ব্যতীত বৈদেশিক অনুদানের অর্থ সংশ্লিষ্ট এনজিও-কে প্রদান করতে পারবে না।

ট. কোন সংস্থার বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাৎ, অর্থ অপব্যবহার ও অননুমোদিত কার্যক্রমের অভিযোগ প্রমাণিত হলে দেশের আইনানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ও সংশ্লিষ্ট দাতা সংস্থাকে অবহিত করা হবে।

ঠ. ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকার উপরের ব্যয়সমূহ অবশ্যই ব্যাংক চেক মারফৎ প্রদেয় হবে। তবে কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতন-ভাতা আবশ্যিকভাবে ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে।

৬। বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী এবং বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের (এনজিও) নিবন্ধন, প্রকল্প অনুমোদন ও বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ এবং ব্যবহার ইত্যাদির ক্ষেত্রে অনুকরণীয় কার্যপ্রণালী নিম্নরূপ হবে:

৬.১ নিবন্ধন

ক. বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ ও ব্যবহারের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আগ্রহী সংস্থা/ব্যক্তিকে The Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Rules, 1978-এর 3(1) ধারা অনুযায়ী এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালকের নিকট নিবন্ধনের আবেদন করতে হবে।

খ. নিবন্ধের আবেদন এফডি-১ ফরমে (সংলগ্নী-১) ৯টি অনুলিপিসহ দাখিল করতে হবে। আবেদন ফরমের সাথে সংস্থার গঠনতন্ত্র, নির্বাহী কমিটির

www.pathagar.com

সদস্যবৃন্দের তালিকা, কর্মকাণ্ডের রূপরেখা (Plan of operation), কর্মক্ষেত্রের অবস্থান ও বিবরণ, Location & area of operation এবং সাহায্য প্রদানেচ্ছুক সাহায্য সংস্থা/সংস্থাসমূহের সম্মতিপত্র (Letter of intent) আবশ্যিকভাবে প্রদান করতে হবে।

সরকারের পূর্বানুমতি ছাড়া সংস্থার নির্বাহী কমিটিতে কোন সরকারী কর্মচারী অন্তর্ভূক্ত হতে পারবেন না। নিবন্ধনের ফি বাবদ সরকারের প্রধান খাত '৬৫ কর ব্যতীত বিবিধ প্রাপ্তি'-এর অধীন 'এনজিওদের রেজিস্ট্রেশন, রেজিস্ট্রেশন নবায়ণ, সার্ভিস চার্জ আদায়' এই গৌণ খাতে নির্ধারিত হারে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে টাকা জমা করতে হবে এবং চালানের দুই কপি আবেদনপত্রের সাথে জমা দিতে হবে। নিবন্ধনের জন্য বিদেশী এনজিওসমূহের ক্ষেত্রে ১,০০০ ডলারের সমপরিমাণ স্থানীয় মুদ্রা এবং বাংলাদেশী এনজিওসমূহের ক্ষেত্রে ৫,০০০ টাকা ফি হিসাবে প্রদেয় হবে।

গ. এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বিভিন্ন এনজিওসমূহকে আবেদন ফরম পূরণের ব্যাপারে পূর্ব পরামর্শ (Pre-Counselling) প্রদান করবে, যাতে সঠিকভাবে তথ্যাবলী সন্নিবেশিত করে আবেদনপত্র দাখিল করা যায়।

ঘ. নিবন্ধনের আবেদন বিবেচনাকালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অভিমত গ্রহণ করা হবে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো হতে আবেদনটির উপর অভিমত প্রদানের অনুরোধ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিম্নলিখিত নীতির আলোকে তাদের মতামত এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে জানিয়ে দেবে:

১. সংস্থা বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, রাষ্ট্র/সমাজ বিরোধী কাজে লিপ্ত কিনা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ রাষ্ট্র বা সমাজ বিরোধী বা নৈতিকতা বিরোধী অপরাধের জন্য দণ্ডিত হয়েছিলেন কিনা;

২. সংস্থার নির্বাহী কমিটির সদস্যগণের পরিচিতি, পারস্পরিক সম্পর্ক ও সমাজে অবস্থান;

৩. সমাজকল্যাণমূলক কাজে সংস্থার পূর্ব অভিজ্ঞতা;

৪. সংস্থার নির্দিষ্ট কার্যালয় রয়েছে কিনা তৎসম্পর্কে তথ্য।

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অভিমত না পাওয়া গেলে নিবন্ধনের আবেদনটির প্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কোন আপত্তি নাই বলে ধরে নেয়া হবে। অবশ্য প্রতিটি ক্ষেত্রে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে ৩০ দিন পর তাগিদপত্র জারী করবে যাতে নিবন্ধনের আবেদনটি সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সচেষ্ট হতে পারে। সঠিকভাবে পেশকৃত আবেদন প্রাপ্তি ৯০ দিনের মধ্যে ব্যুরোসহ সকল কর্তৃপক্ষের যাবতীয় জিজ্ঞাসা ও আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে আবশ্যকীয়ভাবে নিবন্ধনের সিদ্ধান্তপ্রদান করতে হবে। এই নিবন্ধন ইতোমধ্যে বাতিল করা না হলে পাঁচ বছরের জন্য তা বলবৎ থাকবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিবন্ধন প্রদান সম্ভব না হলে তা অবশ্যই প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়ের গোচরীভূত করতে হবে।

www.pathagar.com

ঙ. বৈদেশিক সাহায্য স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে সংস্থা কর্তৃক পালনীয় শর্তাবলী নিবন্ধন পত্রে বিশদভাবে বিধৃত থাকবে এবং নিবন্ধন পত্রের অনুলিপি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগীয় কমিশনার, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণকে প্রদান করা হবে।

চ. সংস্থার কর্মকান্ডের রূপরেখা, উদ্দেশ্য, গঠনতন্ত্র ও কার্যক্রমের প্রতিবেদনে যদি প্রতীয়মান হয় যে, সংস্থার কর্মসূচী The Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Ordinance, 1978-এর 2(d) ধারার সংজ্ঞানুসারে Voluntary Activities নয় তা হলে ব্যুরো সংস্থার নিবন্ধনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করবে ও পত্র দ্বার তা সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে অবহিত করবে।

৬.২ নিবন্ধন নবায়ণ

ক. এনজিওসমূহ নিবন্ধন প্রাপ্তির পাঁচ বছর অতিক্রমের ছয় মাস পূর্বে আরও পাঁচ বৎসরের জন্য নিবন্ধন নবায়ণের নিমিত্তে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালকের নিকট আবেদন করবে। আবেদনের সঙ্গে নবায়ণের জন্য ফি বাবদ বিদেশী এনজিও ৫০০ ডলারের সমপরিমাণ টাকা ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট বাংলাদেশী এনজিও ২,৫০০ টাকা ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে উপরোক্ত ৬.১ (খ) অনুচ্ছেদে উল্লেখিত খাতে জমা দিবে ও চালেনের ২টি প্রতিলিপি আবেদনের সঙ্গে সংযুক্ত করবে।

খ. নিবন্ধন নবায়ণের পূর্ববর্তী ৫ বছরের কর্মকান্ড সন্তোষজনক ছিলো কিনা তা ব্যুরো কর্তৃক যাচাই করা হবে।

গ. আবেদনকারী সংস্থাকে গঠনতন্ত্র, নির্বাহী কমিটির সদস্যদের তালিকা ও বার্ষিক সাধারণ সভার কার্য বিবরণী ব্যুরোতে জমা দিতে হবে।

৬.৩ The Foreign Donations (Volunraty Activities) Regulation Ordinance, 1978-এর আওতায় নিবন্ধিত বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যে কোন বাংলাদেশী বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে নিম্নলিখিত শর্তসমূহ পূরণ করে তাদের সংগৃহীত বৈদেশিক সাহায্য প্রদান করতে পারবে:

ক. সাহায্য প্রদানকারী সংস্থাকে The Voluntary Social Welfare Agencies (Registration & Control) Ordinance, 1961-এর আওতায় নিবন্ধিত হতে হবে।

খ. সাহায্য প্রদানকারী সংস্থা প্রণীত প্রকল্প ও প্রস্তাবিত কার্যক্রমের রূপরেখা এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। প্রকল্প প্রস্তাবে সাহায্য গ্রহণকারী সংস্থা/সংস্থাসমূহের বিস্তারিত বিবরণ ও অর্থ ব্যয়ের রূপরেখা থাকতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রকল্প অনুমোদনের শর্ত মোতাবেক হয়েছে কিনা অর্থ প্রদানকারী সংস্থা তার নিশ্চয়তা বিধান করবে।

www.pathagar.com

৭। প্রকল্প অনুমোদন

ক. The Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Rules, 1978-এর 4(2) ধারার বিধান মোতাবেক অনুমোদিত প্রকল্পের বিপরীতে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ/ব্যবহারের জন্য এনজিওসমূহকে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালকের নিকট আবেদন করতে হবে। অনুমোদিত প্রকল্পের কার্যক্রম ও বাজেট পরীক্ষা, চলতি প্রকল্পের অগ্রগতি ও বাস্তবায়ন এবং বৈদেশিক অর্থ প্রাপ্তির কাগজপত্র বিবেচনাপূর্বক এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বৈদেশিক মুদ্রা অবমুক্তির আদেশ জারী করবে এবং এই আদেশের অনুলিপি অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও সংশ্লিষ্ট সাহায্য সংস্থার জ্ঞাতার্থে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে প্রেরণ করবে। বহুবর্ষী প্রকল্পের ক্ষেত্রে পূর্বতন বৎসরের কাজের অগ্রগতি বিবেচনা করে পরবর্তী বৎসরের অর্থ ছাড় করা হবে। প্রকল্পের ধারাবাহিকতার খাতের অগ্রগতি প্রতিবেদন পাওয়া সাপেক্ষে বছরের প্রথমার্ধের অর্থ ছাড় করা যাবে।

খ. প্রকল্প অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন এনজিও কোনরূপ কার্যক্রম (প্রোগ্রাম) গ্রহণ করতে পারবে না এবং এনজিওসমূহের কর্মকাণ্ড অনুমোদিত প্রকল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। যে সকল বিদেশী দাতা সংস্থা/স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সরাসরি প্রকল্প বাস্তবায়ন না করে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে অনুদান প্রদান করে থাকে সে সকল ক্ষেত্রে দাতা সংস্থা/স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে প্রশাসনিক ব্যয় বৈদেশিক অনুদানের নির্বাহের জন্য এফডি-৬ ফরমে প্রকল্প প্রস্তুত করে অর্থ ছাড়ের জন্য এফডি-২ ফরমের ৩টি অনুলিপিসহ অনুমোদনের জন্য ব্যুরোতে দাখিল করতে হবে।

গ. প্রকল্পসমূহে অনুমোদন লাভের জন্য এনজিওসমূহ নির্ধারিত ছকে (সংলগ্নী-২) এফডি-৬ ফরমে প্রকল্প প্রস্তাবটির ৯টি অনুলিপি সহকারে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালকের নিকট আবেদন করবে। প্রয়োজনে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এনজিওসমূহকে সরকারী নীতি অনুসারে প্রকল্প গ্রহণ এবং প্রকল্পের নির্ধারিত ছক পূরণের ব্যাপারে সহায়তা, পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করবে। কোন প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য ব্যুরোতে দাখিল করার সময় সংস্থা তাদের ইতিপূর্বে বাস্তবায়িত একই প্রকার প্রকল্পের (যদি থাকে) খাতওয়ারী নির্ধারিত অর্থ ব্যয়ের নিরিখে স্থিরীকৃত লক্ষ্যমাত্রার বাস্তব অগ্রগতি কি ছিল তার বিবরণ সংযুক্ত করবে। কোন জেলায় ও থানায় কত টাকা খরচ করা হবে তার সুনির্দিষ্ট বিভাজন এবং প্রকল্পে যে সব কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগের সংস্থান আছে তাদের প্রত্যেকের বিস্তারিত বিবরণী (যথা-বেতনের স্কেল, ভাতাদি, শিক্ষাগত যোগ্যাতা ও অভিজ্ঞতার বিবরণ ইত্যাদি) প্রকল্প প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঘ. এনজিও বিষয়ক ব্যুরো প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ প্রাথমিক পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা

www.pathagar.com

করে তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ২১ দিনের মধ্যে এ সম্পর্কে তাদের মতামত প্রদান করবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মতামত পাওয়া না গেলে বিবেচ্য প্রকল্পের ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের আপত্তি নাই বলে ধরে নেয়া হবে।

ঙ. যদি প্রকল্পের উপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের আপত্তি থাকে অথবা প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাপেক্ষে প্রকল্প অনুমোদনের সুপারিশ থাকে তবে আপত্তি বা পরিবর্তনের কারণসমূহ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে বিস্তারিত অবহিত করবে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো উক্ত আপত্তি বা সুপারিশসমূহ গ্রহণ করতে পারে অথবা আপত্তি বা পরিবর্তনের কারণসমূহ পর্যালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তা অগ্রহণযোগ্য মনে হলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করে প্রকল্প অনুমোদন করতে পারবে।

চ. এনজিও বিষয়ক ব্যুরো প্রয়োজনবোধে প্রস্তাবিত প্রকল্প পরিবর্তন বা সংশোধন করে তা অনুমোদন করতে পারবে। তবে অনুরূপ ক্ষেত্রে দাতা সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট এনজিও-এর মতামত ও সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করতে হবে।

ছ. এনজিও বিষয়ক ব্যুরো যথাযথ তথ্য সম্বলিত প্রকল্প প্রাপ্তির ৪৫ দিনের মধ্যে প্রস্তাবিত প্রকল্পের উপর সিদ্ধান্ত প্রদান করবে।

জ. প্রকল্পসমূহ একবর্ষী বা বহুবর্ষী হতে পারে। এনজিওসমূহ সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় চিহ্নিত অগ্রাধিকার ক্ষেত্রসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ৫ বছর মেয়াদী প্রকল্প দাখিল করতে পারবে। উল্লেখিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে ব্যুরো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থ ছাড়করণের ব্যবস্থা করবে। প্রকল্প প্রস্তাবে স্তিরীকৃত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই অর্জন করতে হবে। বহুবর্ষী প্রকল্প একবারে অনুমোদন করা হবে। প্রতি বছর প্রকল্পের বাস্তবায়ন কৌশল ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পরিমাণ সন্তোষজনক কিনা তা এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক পর্যালোচনার পর সন্তোষজনক বিবেচিত হলে পরবর্তী বছরের প্রকল্প অর্থ ছাড় করা হবে।

ঝ. লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে প্রকল্প প্রস্তাবসমূহ দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে অবদান রাখে এবং সরকারী ও বেসরকারী কার্যক্রমের সাথে দ্বৈততা সৃষ্টি না করে।

৭.১ পুনর্বাসন প্রকল্প

ক. দুর্যোগ ক্ষতিগ্রস্ত পুনর্বাসন প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ছকে (সংলগ্নী-২) এফডি-৬ ফরমে যথাযথ তথ্য সম্বলিত প্রকল্প প্রস্তাব প্রাপ্তির ২১ দিনের মধ্যে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করবে।

খ. আবেদনকারীর নিকট হতে প্রকল্প প্রস্তাব প্রাপ্তির পর এনজিও বিষয়ক ব্যুরো তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মতামতের জন্য প্রেরণ করবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রেরিত প্রকল্পের উপর ১৪ দিনের মধ্যে মতামত/সুপারিশ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে প্রেরণ করবে।

www.pathagar.com

গ. কোন পুনর্বাসন প্রকল্পের বাস্তব প্রয়োজন নেই প্রতীয়মান হলে ব্যুরো তা পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে প্রত্যাখ্যান করবে।

৭.২ দূর্যোগকালীন ও দূর্যোগোত্তর জরুরী ত্রাণ কর্মসূচী

ক. বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, খরা প্রভৃতি প্রাকৃতিক ও বিভিন্ন মনুষ্য সৃষ্ট দূযোগকালীন/ দূর্যোগোত্তর সময়ে বৈদেশিক সাহায্যের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক ত্রাণকার্য পরিচালনা করতে উদ্যোগী এনজিওসমূহ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নির্ধারিত এফডি-৭ ফরমে (সংলগ্নী-৩) সরাসরি ত্রাণ কর্মসূচী পেশ করবে এবং ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে অনুলিপি দিয়ে অবহিত রাখবে।

খ. প্রস্তাবিত কর্মসূচী/প্রকল্প প্রাপ্তির ২৪ ঘন্টার মধ্যে ব্যুরো ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত প্রাসঙ্গিক দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নীতিমালা অনুসরণে সিদ্ধান্ত প্রদান করবে এবং তা সংশ্লিষ্ট এনজিও, ত্রাণ মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসনকে অবহিত করবে।

গ. এনজিও বিষয়ক ব্যুরো প্রকল্প অনুমোদনের ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা বা সামগ্রী অবমুক্তির আদেশ জারী করবে।

ঘ. মাঠ পর্যায়ে ত্রাণ কর্মসূচীর প্রয়োজনীয় সমন্বয়ের স্বার্থে এনজিওসমূহ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক-এর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করবে। জেলা প্রশাসকগণ এনজিওসমূহকে ত্রাণ কার্যে সম্ভাব্য সব রকম সহযোগিতা প্রদান করবেন।

ঙ. এনজিওসমূহ ত্রাণ কর্মসূচী সম্পন্ন করার ৬ সপ্তাহের মধ্যে সমাপনী প্রতিবেদন এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এবং তার অনুলিপি তাণ মন্ত্রণালয় ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগকে প্রদান করবে।

৮। বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ ও ব্যবহার

ক. প্রকল্প প্রস্তাব দাখিল করার সময় এনজিওসমূহ প্রকল্প প্রস্তাবের সংগে প্রথম বছরের বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের আবেদন এফডি-২ (সংলগ্নী-৪) ফরমে ৩টি অনুলিপি সহকারে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে দাখিল করবে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো প্রকল্প অনুমোদনপত্রের সাথে প্রথম কিস্তির বৈদেশিক মুদ্রার ছাড়পত্র প্রদান করবে। ব্যুরো এ ছাড়পত্রের অনুলিপি অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসককে প্রদান করবে।

খ. অনুমোদিত প্রকল্পের জন্য পরবর্তী বছরের বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের আবেদন এফডি-২ ফরমে পূরণ করে ৩টি অনুলিপিসহ ব্যুরোতে দাখিল করতে হবে এবং পূর্ববর্তী বছরের গৃহীত বৈদেশিক অনুদানের বিবরণী ও অনুদান ব্যয়ের বিবরণী এফডি-৩ (সংলগ্নী-৫) পরমে ৩টি অনুলিপিসহ একই সাথে দাখিল করতে হবে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো প্রকল্পটির কার্যক্রম বাস্তবায়ন, অগ্রগতি বিষয়ক বার্ষিক প্রতিবেদন ইত্যাদি পরীক্ষা করে আবেদন প্রাপ্তির ১৪ দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করবে।

www.pathagar.com

গ. হিসাবের সুবিধার জন্য প্রত্যেক এনজিও একটি মাত্র ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে সমূদয় বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করবে। প্রকল্পটি এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর অনুমোদনের পূর্বে কোনোক্রমের উক্ত ব্যাংক একাউন্ট হতে প্রাসঙ্গিক টাকা উত্তোলন করা যাবে না। প্রকল্পওয়ারী পৃথক ব্যাংক হিসাব থাকতে পারে। তবে প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বে প্রকল্পের অর্থ কোন অবস্থাতেই খরচ করা যাবে না।

ঘ. বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের তারতম্যের কারণে ব্যুরো কর্তৃক ছাড়কৃত অর্থের অতিরিক্ত অর্থ এবং ব্যাংক হিসাবে রক্ষিত অনুদানের উপর প্রাপ্ত সুদের অর্থ ব্যবহারের জন্য এনজিওসমূহ সংশোধিত বাজেট অনুমোদন করিয়ে নেবে। এ জন্য প্রকল্প প্রস্তাবের ৩টি অনুলিপি এফডি-৬ ফরমে দাখিল করবে। ব্যুরো ৩০ দিনের মধ্যে প্রস্তাব অনুমোদন ও অর্থ ছাড়পত্র জারী করবে। তবে প্রকল্প প্রস্তাব মূল প্রকল্প থেকে ভিন্নধর্মী হলে প্রচলিত অনুমোদন প্রক্রিয়া অনুসরণ করে প্রস্তাবটি অনুমোদন করবে।

৮.১ স্থাপিত তথা চলতি প্রতিষ্ঠনসমূহ যথা: শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উপাসনালয়, হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয়, মিশনসমূহ ইত্যাদির রক্ষাণাবেক্ষণ ও পরিচালনা ব্যয় বৈদেশিক সাহায্যে মিটাতে হলে এনিজওসমূহকে এফডি-৮ (সংলগ্নী-৬) ফরমে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের আবেদন সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে ৯টি অনুলিপিসহ পেশ করতে হবে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো সঠিকভাবে প্রাপ্ত আবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মতামতের জন্য প্রেরণ করবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ২১ দিনের মধ্যে মতামত প্রদান করবে। এনজিও হতে প্রস্তান প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো সিদ্ধান্ত প্রদান করবে।

৮.২ বৈদেশিক সাহায্যের হিসাব সংরক্ষণ

ক. প্রতিটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা/ব্যক্তি বৈদেশিক মুদ্রায় প্রাপ্ত অথবা বিদেশ হতে প্রেরিত কিন্তু এ দেশীয় মুদ্রায় প্রাপ্ত সকল অর্থ সাহায্য যে কোনো সিডিউল্ড ব্যাংকের একটি মাত্র নির্দিষ্ট ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে গ্রহণ করবে।

খ. বাংলাদেশ ব্যাংক প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা/ব্যক্তি কর্তৃক প্রাপ্ত এই প্রকার বৈদেশিক মুদ্রার ষান্মাসিক হিসাব প্রতি বছর জুলাই ও জানুয়ারী মাসে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রেরণ করবে।

গ. খরচের ভাউচারসমূহ সংস্থার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ৫ বৎসর সংরক্ষিত থাকবে। মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহ তাদের খরচের ভাউচারের অনুলিপি ৫ বছর সংরক্ষণ করবে।

ঘ. স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা/ব্যক্তি বৈদেশিক সাহায্যের হিসাবের বইসমূহ (Book of Accounts) নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করবে:

১. বৈদেশিক সামগ্রী সাহায্যের ক্ষেত্রে এফডি-৫ (সংলগ্নী-১১) ফরমে, এবং

www.pathagar.com

২. বৈদেশিক অর্থ সাহায্যের ক্ষেত্রে দু-তরফা দাখিলা পদ্ধতি (Double Entry System) ক্যাশ বই এবং লেজার বইয়ের মাধ্যমে।

ঙ. উপরের 'ঘ'তে বর্ণিত হিসাব অর্ধ-বাৎসরিক ভিত্তিতে সংরক্ষিত হবে। একটি ১লা জুলা হতে ৩১ ডিসেম্বর এবং অপরটি ১লা জানুয়ারি হতে ৩০শে জুনের ভিত্তিতে সংরক্ষিত হবে।

৮.৩ বিদেশী বিশেষজ্ঞ/উপদেষ্টা/কর্মকর্তা নিয়োগ

ক. নিয়োগ প্রস্তাবসমূহ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর অনুমোদিত জন মাস (Man-Month) এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। তাদের বেতনের বিবরণ (বেতন বাংলাদেশের বাইরে থেকে গ্রহণ করলেও) প্রতি বছর ব্যুরোতে প্রদান করতে হবে।

খ. অনুমোদিত প্রকল্পের বিদেশীদের চাকুরীতে নিয়োগের/নিযুক্তিকাল বৃদ্ধির আবেদন সংশ্লিষ্ট এনজিও নির্ধারিত এফডি-৯ (সংলগ্নী-৭) এ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে ৫টি অনুলিপিসহ পেশ করবে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এ বিষয়ে ৫০ দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করবে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো আবেদনপত্রটি প্রাপ্তির পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে মতামতের জন্য প্রেরণ করবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই বিষয়ে আপত্তি থাকলে আপত্তির কারণ বিস্তারিত উল্লেখ করে মতামত ২৫ দিনের মধ্যে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে প্রেরন করবে। উল্লেখ্য যে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন না হলে কোন ব্যক্তিকে বিশেষজ্ঞ হিসাবে নিয়োগের অনুমতি প্রদান করা হবে না।

৯। বৈদেশিক কন্ট্রিবিউশন (এককালীন) গ্রহণ ও ব্যবহার

ক. The Foreign Contribution (Regulation) Ordinance, 1992-এর বিধান অনুযায়ী বৈদেশিক কন্ট্রিবিউশন (নগদ বা সামগ্রী) গ্রহণ এবং প্রদান উভয় ক্ষেত্রেই ব্যুরোর/সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

খ. কন্ট্রিবিউশনটি স্বেচ্ছাসেবামূলক (Voluntary Activities) কর্মকান্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট হলে কন্ট্রিবিউশন প্রাপ্তির জন্য আবেদন মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নিকট করতে হবে। কন্ট্রিবিউশন প্রাপক সংস্থাটি ব্যুরোতে নিবন্ধিত হলে এ জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তদন্ত আবশ্যক হবে না।

গ. এনজিও বহির্ভূত কন্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রচলিত নিয়ম মোতাবেক আবেদন প্রক্রিয়াজাত করবে।

ঘ. কন্ট্রিবিউশন গ্রহণকারী এফসি-১ ফরমে (সংলগ্নী-৮) এবং প্রদানকারী এফসি-২ ফরমে (সংলগ্নী-৯) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো/সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে (যেখানে প্রযোজ্য) ৫টি অনুলিপি সহকারে আবেদন করবে।

ঙ. এনজিও বিষয়ক ব্যুরো/সংশ্লিষ্ট আবেদন প্রাপ্তির পর দুই সপ্তাহের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করবে। কন্ট্রিবিউশন অবমুক্তির অনুলিপি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক

www.pathagar.com

সম্পর্ক বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রত্যাশী সংস্থা/ব্যক্তিকে প্রদান করবে। কন্ট্রিবিউশন গ্রহণকারী কন্ট্রিবিউশন ব্যবহারের ৬ সপ্তাহের মধ্যে অনুমোদন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করবে।

১০। এনজিও কর্তৃক রক্ষিত হিসাব পরিদর্শন ও নিরীক্ষা

ক. The Foreign Donation (Voluntary Activities) Regulation Ordinance, 1978-এর 4 ও 5 ধারা অনুসারে সংস্থাসমূহের হিসাব নিরীক্ষা ও পরিদর্শন করার ক্ষমতা এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে প্রদান করা হয়েছে।

খ. এনজিওসমূহের বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষণের জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বাংলাদেশ চার্টার্ড একাউটেন্টস অর্ডার-১৯৭৩ অনুসরণে চার্টার্ড একাউটেন্টগণের একটি তালিকা প্রস্তুত করবে। এনজিওসমূহ অবশ্যই তালিকাভুক্ত চার্টার্ড একাউটেন্ট দ্বারা সংস্থার হিসাব নিরীক্ষা করবে। নিরীক্ষার যাবতীয় ব্যয় এনজিওসমূহ তাদের প্রকল্প ব্যয় থেকে নির্বাহ করবে।

গ. এনজিওসমূহ অর্থ বছর সমাপ্তির ২ মাসের মধ্যে হিসাব নিরীক্ষা নিশ্চিত করবে। সংস্থাসমূহ অডিট রিপোর্টের ৩টি অনুলিপি ব্যুরোতে দাখিল করবে। এতে ব্যুরো কর্তৃক অনুমোদিত নীতিমালার আলোকে প্রকল্পের ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ থাকবে।

ঘ. নিরীক্ষক তার প্রতিবেদনের সাথে সংলগ্নী-১০ এ প্রদত্ত ডি-৪ ফরমে সার্টিফিকেট প্রদান করবেন।

ঙ. যে সকল নিরীক্ষক যথাযথভাবে সংস্থার হিসাব নিরীক্ষা করবে না তাদের ব্যুরোর নিরীক্ষক তালিকা থেকে বাদ দেয়া হবে ও তাদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনের আওতায় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

১১। বার্ষিক রিপোর্ট

এনজিওসমূহ তাদের কার্যক্রমের বার্ষিক রিপোর্ট অর্থবছর সমাপ্তির ৩ মাসের মধ্যে প্রণয়ন করবে এবং তার প্রতিলিপি এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও বাংলাদেশ ব্যাংককে প্রদান করবে। এ প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত তথ্য/বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত থাকবে হবে:

ক. বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রতিটি প্রকল্পের বিষয় সম্পূর্ণ আলাদাভাবে চিত্রায়িত করতে হবে। প্রকল্পভিত্তিক এ সব প্রতিবেদনের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হবে অংগভিত্তিক নির্ধারিত ব্যয়-এর বিপরীতে স্থিরীকৃত লক্ষ্যমাত্রার বাস্তব সাফল্যের ছককৃত বিবরণ। বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকল্পের থানা ও জেলাওয়ারী ও অংগভিত্তিক ব্যয় সুস্পষ্টরূপে দেখাতে হবে।

খ. যানবাহনসহ সংস্থার স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা।

গ. সংস্থার নিজস্ব আয়ের উৎস ও ব্যয়ের বিবরণ (অংশ ভিত্তিক)।

ঘ. সংস্থার ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিলের অর্থ বিনিয়োগের খাতভিত্তিক বিভাজন সহ বিবরণ।

www.pathagar.com

ঙ. কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের সাথে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থে বাস্তবায়িত প্রকল্পের বিবরণ।

চ. বার্ষিক রিপোর্টে ঐ সংস্থায় নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের (যাদের মাসিক বেতন ও ভাতা ৫,০০০ টাকা বা তার উর্ধ্বে অথবা এককালীন প্রাপ্তি ১০,০০০ টাকা বা তার উর্ধ্বে) নাম, পদবী, যোগ্যতা, বয়স, জাতীয়তা, মোট বেতন, ভাতা এবং সংস্থায় চাকুরীকাল উল্লেখ করে একটি বিবরণ সংযুক্ত থাকবে।

১২। **আইন ভংগ এবং অর্থ আত্মসাতের কারণে নিবন্ধ বাতিল এবং মামলা দায়ের**

ক. দি ফরেন ডোনেশন (ভলান্টারী একটিভিটিজ) রেগুলেশন অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৮-এ ৬(১) ও ৬(এ) ধারায় বর্ণিত ক্ষমতা এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালকের উপর থাকবে। ব্যুরোর পরিচালক, মহাপরিচালকের অনুমোদনক্রমে অধ্যাদেশের ৬(১) ও ৬(এ) ধারা বলে নিবন্ধন বাতিল, প্রকল্পের কার্যক্রম বন্ধ এবং আদালতে মামলা দায়ের করবেন।

খ. দেশে প্রচলিত আইনের পরিপন্থী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকলে ব্যুরো সরকারের অনুমোদনক্রমে প্রাসংগিক সংস্থার নিবন্ধন বাতিল করতে পারবে।

১৩। নিবন্ধন, প্রকল্প অনুমোদন অথবা বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ ও ব্যবহার বিষয়ে পর্যালোচনার (Review) পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটলে এনজিওসমূহ ঐ বিষয়ে পর্যালোচনার প্রস্তাব এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নিকট উপস্থাপন করতে পারবে।

ডঃ কামাল উদ্দিন সিদ্দিকী
প্রধানমন্ত্রীর সচিব

সূত্র ঃ বাংলাদেশে এনজিও ঃ হারুন-অর রশিদ

www.pathagar.com

[1]The Societies Registration Act, 1860

Contents

Preamble

Sections

1. Societies formed by memorandum of association and registration.
2. Memorandum of association.
3. Registration Fees.
4. Annual list of managing body to be filed.
5. Property of society how vested.
6. Suits by and against societies.
7. Suits not to abate.
8. Enforcement of judgement against society.
9. Recovery of penalty accruing under bye-law.
10. Members liable to be sued and strangers.
    Recovery by successful defendant of costs adjudged.
11. Members guilty of offence punishable as strangers.
12. Societies enable to alter, extend or abridge their purposes.
13. Provision for dissolution of societies and adjustment of their affairs.
    Assent required.
    Government consent.
14. Upon a dissolution no member to receive profit.
    Clause not to apply to Joint-stock Companies.
15. Member defined.
    Disqualified members.
16. Governing body defined.
17. Registration of Societies formed before Act.
    Assent required.
18. Such societies to file memorandum, etc., with Registrar of Joint-stock Companies.
19. Inspection of documents. Certified copies.
20. To what societies Act applies.

---

[1] Short title was given by the Short Titles Act, 1897 (XIV of 1897).

www.pathagar.com

[1]Act No. XXI of 1860

[21st May, 1860]

An Act for the Registration of Literary, Scientific and Charitable Societies.

Preamble.

Whereas it is expedient that provision should be made for improving the legal condition of societies established for the promotion of literature, science, or the fine arts, or for the diffusion of useful knowledge. [2][the diffusion of political education] or for charitable purposes; It is enacted as follows :—

Societies formed by memorandum of association and registration.

1. Any seven or more persons associated for any literary, science of charitable purpose, or for any such purpose as is described in section 20 of this Act, may, by subscribing their names to a memorandum of association and filing the same with the Registrar of Joint-stock Companies [3] * * * form themselves into a society under this Act.

Memorandum of association.

2. The memorandum of association shall contain the following things (that is to say)—

the name of the society :

the objects of the society :

---

1 The Act (with the exception of the first four sections) imbased on the Literary and Scientific Institutions Act, 1854 (17 & 18 Vict., c. 112), ss. 20 site *seq*.

It has been declared to be in force in all the Provinces and Capital of the Federation, except the Sheduled District, by s. 3 of the Laws Local Extent Act, 1874 (XV of 1874).

It has been declared, by notification under s. 3(a) of the Scheduled District Act, 1874 (XiV of 1874), to be in force in the Scheduled Districts, namely:

The District of Sylhet. *see* Gazette of India, 1879, Pt.i, p. 61.

2 These words were added by the Societies Registration (Amendment) Act, 1927 (XXII of 1927).

3 The words and figures "under Act XIX of 1857" were repealed by the Repealing Act, 1874 (XVI of 1874), *See* now the Companies Act, 1913 (VII of 1913) s. 288.

www.pathagar.com

the names, addresses and occupations of the governors, council, directors, committee or other governing body to whom, by the rules of the society, the management of its affairs is entrusted.

Registration Fees.

A copy of the rules and regulations of the society, certified to be a correct copy by not less than three of the members of the governing body, shall be filed with the memorandum of association.

3. Upon such memorandum and certified copy being filed the registrar shall certify under his hand that the society is registered under this Act. There shall be paid to the registrar for every such registration a fee of fifty [4][taka], or such smaller fee as the [5][Government] may from time to time direct; and all fees so paid shall be accounted for to the [5][Government].

Annual list of managing body to be filed.

4. Once in every year, on or before the fourteenth day succeeding the day on which, according to the rules of the society, the annual general meeting of the society is held, or, if the rules do not provide for and annual general meeting, in the month of January, a list shall be filed with the Registrar of Joint-stock Companies of the names, addresses and occupations of the governors, council, directors, committee or other governing body then entrusted with the management of the affairs of the society.

---

4. This word was substituted for the word "rupees" by Act VIII of 1973, s. 3 and 2nd Sch. (w.e.f. 26-3-1971).

5 Subs. *ibid*, for the word, "Provincial Government".

www.pathagar.com

Property of society how vested.

5. The property, moveable and immoveable, belonging to a society registered under this Act, if not vested in trustees, shall be deemed to be vested, for the time being in the governing body of such society, and in all proceedings, civil and criminal, may be described as the property of the governing body of such society by their proper title.

Suits by and against societies.

6. Every society registered under this Act may sue or be sued in the name of the president, chairman, or principal secretary, or trustees, as shall be determined by the rules and regulations of the society, and, in default of such determination, in the name of such person as shall be appointed by the governing body for the occasion :

Provided that it shall be competent for any person having a claim or demand against the society, to sue the president or chairman, or principal secretary or the trustees thereof, if on application to the governing body some other officer or person be not nominated to be the defendant.

Suits not bate

7. No suit or proceeding in any Civil Court shall abate or discontinue by reason of the person by or against whom such suit or proceedings shall have been brought or continued, dying of ceasing to fill the character in the name whereof he shall have sued or been sued, but the same suit or proceedings shall be continued in the name of or against the successor of such person.

Enforcement of judgement against society

8. If a judgement shall be recovered against the person or officer named on behalf of the society, such judgement shall not be put in force against the property, moveable or immoveable, or against the body of such

www.pathagar.com

person or officer, but against the property of the society.

The application for execution shall set forth the judgement, the fact of the party against whom it shall have been recovered having sued or having been sued, as the case may be, on behalf of the society only and shall require to have the judgement enforced against the property of the society.

Recovery of penalty accruing under bye-law

9. Whenever by any bye-law duly made in accordance with the rules and regulations of the society, or, if the rules do not provide for the making of bye-laws, by any bye-law made at a general meeting of the members of the society convened for the purpose (for the making of which the concurrent votes of three-fifths of the members present at such meeting shall be necessary) any pecuniary penalty is imposed for the breach of any rule or bye-law of the society, such penalty, when accrued, may be recovered in any Court having jurisdiction where the defendant shall reside, or the society shall situate, as the governing body thereof shall deem expedient.

Members liable to be sued as strangers.

10. Any member who may be in arrear of a subscription which, according to the rules of the society he is bound to pay or who shall possess himself of or detain any property of the society in a manner or for a time contrary to such rules, or shall injure or destroy any property of the society may be sued for such arrear or for the damage accruing in the manner herein-before provided.

Recovery by successful defendent of cost adjuged.

But if the defendant shall be successful in any suit or other proceeding brought against him at the instance of the society, and shall be adjudged to recover his costs, he may elect to proceed to recover the same from the officer

www.pathagar.com

in whose name the suit shall be brought, or from the society, and in the latter case shall have process against the property of the said society in the manner above described.

Members guilty of offences punishable as strangers.

11. Any member of the society who shall steal, purloin or embezzle any money or other property, or wilfully and maliciously destroy or injure any property of such society, or shall forge any deed, bond, security for money, receipt, or other instrument, whereby the funds of the society may be exposed to loss, shall be subject to the same prosecution, and if convicted shall be liable to be punished in like manner as any person not a member would be subject and liable to in respect of the like offence.

Societies enabled to alter, extend or abridge their purposes

12. Whenever it shall appear to the governing body of any society registered under this Act, which has been established for any particular purpose of purposes, that it is advisable to alter, extend or abridge such purpose to or for other purposes within the meaning of this Act., or to amalgamate such society either the meaning of this Act., or to amalgamate such scoiety either may submit the proposition to the members of the society in a written or printed report and may convene a special meeting for the consideration thereof according to the regulations of the society :

But no such proposition shall be carried into effect unless such report shall have been delivered or sent by post to every member of the society ten days previous to the special meeting convened by the governing body for the consideration thereof, nor unless such proposition shall have been agreed to by the votes of three-fifths of the members delivered in person or by proxy, and confirmed by the votes of three-fifths of the members present at

www.pathagar.com

a second special meeting convened by the governing body at an interval of one month after the former meeting.

Dissolution of societies and adjustment of their affairs.

13. Any number not less than three-fifths of the members of any society may determine that it shall be dissolved, and thereupon it shall be dissolved forthwith, or at the time then agreed upon and all necessary steps shall be taken for the disposal and settlement of the property of the society, its claims and liabilities, according to the rules of the said society applicable hereto, if any, and if not, then as the governing body shall find expedient, provided that, in the event of any dispute arising among the said governing body or the members of the society, the adjustment of its affairs shall be referred to the principal Court of original civil jurisdiction of the district in which the Chief building of the society situate; and the Court shall make such order in the matter as it shall deem requisite :

Assent required;

Provided that no society shall be dissolved unless three-fifths of the members shall have expressed a wish for such dissolution by their votes delivered in person, or by proxy, at a general meeting convened for the purpose :

Government consents.

Provided that [1][whenever the Government] is a member of or a contributor to, or otherwise interested in, any society registered under this Act, such society shall not be dissolved [2][without the consent of the Government] [3] * * *

---

[1] The words within square breackts were substitued for the words "whenever any Government" by the Bangladesh Laws (Revision and Declaration) Act, 1973 (Act VIII of, 1973). Second Sechedule (w.e.f. 26th March, 1971).

[3] The words "without the consent of the Government of the Province of registration" were substituted for the words "without the consent of Government" by A.O. 1937.

www.pathagar.com

Upon a dissolution no member to receive profit.

14. If upon the dissolution of any society registered under this Act there shall remain after the satisfaction of all its debt and liabilities any property whatsoever, the same shall not be paid to or distributed among the members of the said society or any of them, but shall be given to some other society to be determined by the votes of not less than three-fifths of the members present personally or by proxy at the time of the dissolution, or in, default thereof, by such Court as aforesaid :

Clause not to apply to joint-stock companies.

Provided, hawever, that this clause shall not apply to any society which shall have been founded or established by the contributions of shareholders in the nature of a Joint-stock Company.

Member defined. Disqualified members.

15. For the purposes of this Act a member of a society shal be a person who, having been admitted therein according to the rules and regulatons thereof, shall have paid a subscription or shall have signed the roll or list of members thereof, and shall not have resigned in accordance with such rules and regulations; but in all proceedings under this Act no person shall be entitled to vote or to be counted as a member whose subscription at the time shall have been in arrear for a period exceeding three months.

Governing body defined.

16. The governing body of the society shall be the governors, council, directors, committee, trustees or other body to whom by the rules and regulations of the society the management of its affairs is entrusted.

Registration of societies formed before Act. Assent required.

17. Any company or society established for a literary, scientific or charitable purpose, and registered under [1]Act XLIII of 1850, or any such society established and constituted previously

www.pathagar.com

to the passing of this Act but not registered under the said [2]Act XLIII of 1850, may at any time hereafter be registered as a society under this Act, subject to the proviso that no such company or society shall be registered under this Act unless an assent to its being so registered has been given by three-fifths of the members present personally, or by proxy, at some general meeting convened for that purpose by the governing body.

In the case of a company or society registered under [1]Act XLIII of 1850, the directors shall be decemed to of such governing body.

In the case of a society not so registered if no such body shall have been constituted on the establishment of the society, it shall be competent for the members thereof, upon due notice to create for itself a governing body to act for the society thenceforth.

Such societies to file memorandum etc., with Registrar of Joint-stock Companies.

18. In order to any such society as is mentioned in the last preceding section obtaining registry under this Act, it shall be sufficient that the governing body file with the Registrar of Joint-stock Companies[2]*** a memorandum showing the name of the society, the objects of the society, and the names, addresses and occupations of the governing body, together with a copy of the rules and regulations of the society certified as provided in section 2, and a copy of the report of the proceedings of the general meeting at which the registration was resolved on.

Inspection of documents. Certified copies.

19. Any person may inspect all documents filed with the registrar under this Act on payment of a fee of one [3][taka] for each inspection, and any person may require a

www.pathagar.com

copy or extract of any document or any part of any document, to be certified by the registrar, on payment of two annas for every hundred words of such copy or extract; and such certified copy shall be *prime facie* evidence of the matters therein contained in all legal proceedings whatever.

To want societies Act applies.

20. The following societies may be registered under this Act :

Charitable societies,[3]*** societies established for the promotion of science, literature, or the fine arts, for instruction the diffusion of useful knowledge, 4[the diffusion of political education], the foundation or maintenance of libraries or reading rooms for general use among the members or open to the public, or public museums and galleries of painting and other works of art, collections of natural history, mechanical and philosophical inventions, instruments, or designs.

---

1 The words "of the Province of registration" were omitted by Act VIII of 1973.

2 Rep. by the Indian Companies Act, 1866 (X of 1866), s. 219.

3 The words and figures "under Act, XIX of 1857, repealed by the Repealing Act, 1874 (XVI of 1874), *see* now the Companies Act, 1913 (VII of 1913), s. 288.

4 Subs. by Act VIII of 1973, s. 3 and 2nd Sch. (w.e.f. 26th March, 1971).

www.pathagar.com

[Published in the Dacca Gazetee, Extraordinary, dated Dacca, December 8, 1961]

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL WELFARE
(Labour and Social Welfare Division)
Dacca, the 2nd December, 1961

ORDINANCE NO, XLVI OF 1961
AN ORDINANCE

To provide for the registration & control of voluntary social welfare agencies.

WHEREAS it is expedient to provide for the registration & control of Voluntary Social Welfare Agencies, and for matters ancillary thereto.

Now, THEREFORE, in pursuance of the declaration of the seventh day of October 1958 & in exercise of all powers enabling him in that behalf, the President is pleased to make & promulgate the following Ordinance :

1. **Short title, extent & commencement.**— (1) This ordinance may be called Voluntary Social Welfare Agencies (Registration & Control) Ordinance, 1961.

(2) It extends to the whole of Bangladesh.

(3) It shall come into force on such date as the Government may by notification in the official Gazette, appoint in this behalf.

2. **Definitions.**— In this Ordinance, unless there is anything repugnant in the subject or context,—

(a) "Agency" means a Voluntary Social Welfare Agency, & includes any branch of such agency;

(b) "Governing body" means the council committee, trustees or other body, by whatever name called, to whom by the constitution of the agency, its executive functions the management of its affairs are entrusted ;

www.pathagar.com

(c) "Prescribed" means prescribed by rules made under section 19;

(d) "Register" means the register maintained under section 4, & registered shall mean registered under this Ordinance;

(e) "Registration Authority" means the Director of Social Welfare, Government of Bangladesh, & includes an officer authorized by the Government, by notification in the official Gazette, to exercise all or any of the powers of the Registration Authority under this Ordinance;

(f) "Voluntary Social Welfare Agency" means an organisation, association or undertaking established by person on their own free will for the purpose of rendering Welfare services in any one or more of the field mentioned in the schedule & depending for its resources on public subscriptions, donations of Government aid.

3. **Prohibiting against establishing or continuing an agency without registration.-** No agency shall be established or continued except in accordance with the provisions of this Ordinance.

4. **Application for registration etc.**— (1) Any person intending to establish an agency, and any person intending that an agency already in existence should be continued as such, shall in the prescribed from on payment of the prescribed fees, make an application to the Registration Authority accompanied by a copy of the constitution of the agency, & such other documents as may be prescribed.

(2) The Registration Authority may, on receipt of the application make such enquiries as it considers necessary & either grant the application, or, for reasons to be recorded in writing, reject it.

(3) If the Registration Authority grant the application, if shall issue, in the prescribed form, a certificate of registration to the applicant.

(4) The Registration Authority shall maintain a register, containing such particulars as may be prescribed, of all certificates issued under section (3).

www.pathagar.com

5. **Establishment & continuance of agency.**— (1) An Agency not in existence on the coming into force of this Ordinance shall be established only after a certificate of registration has been issued under sub-section (3) of Section 4.

(2) An agency already in existence shall not be continued for more than six months from the date on which this Ordinance comes into force, unless an application for its registration has within thirty days of such date, been made under sub-section (1) of Section 4.

(3) Where an application as aforesaid has been made in respect of an existing agency & such application is ejected, then not with standing the period of six months provided in sub-section (2) the agency may be continued for a period of thirty days form the date on which the application is rejected, or if an appeal is preferred under section 6, until such appeal is dismissed.

6. **Appeal.**—If the Registration Authority rejects an application for registration the applicant may, within thirty days from the date of the order of the Registration Authority, prefer an appeal to Government & the order passed by the Government shall be final & given effect by the Registration Authority.

7. **Conditions to be complied with by registered agencies.**— (1) Every registered agencies shall—

(a) maintain audited accounts in the manner laid down by the Registration Authority;

(b) at such time & in such manner as may be prescribed, submit its Annual Report & Audited Accounts to the Registration Authority & publish the same for general information.

(c) pay all moneys received by it into a separate account kept in its name at Bank or Banks as may be approved by the Registration Authority, &

(d) furnish to the Registration authority such particulars with regard to accounts & other records as the Registration Authority may from time to time require.

(2) The Registration Authority, or any Officer duly authorized by it in this behalf, may at all reasonable times inspect the books of account & other records of the agency, the securities,

www.pathagar.com

cash & other properties held by the agency, & all documents relating thereto.

8. **Amendment of the constitution of registered agency.**— (1) No amendment of the constitution of a registered agency shall be valid unless it has been approved by the Registration Authority, for which purpose a copy of the amendment shall be forwarded to the Registration Authority.

(2) If the Registration Authority is satisfied that any amendment of the constitution is not contrary, to any of the provisions of this Ordinance or the rules made thereunder, it may, if it thinks fit approve the amendment.

(3) Where the Registration Authority approves an amendment of the constitution, it shall issue to the agency a copy of the amendment certified by it, which shall be evidence that the same is duly approved.

9. **Suspension or dissolution of governing bodies of registered agency.**— (1) If after making such enquiries as it may think fit, the Registration Authority is satisfied that a registered agency has been responsible for any irregularity in respect of its funds or for any mal-administration in the conduct of its affairs or has failed to comply with the provisions of this Ordinance or the rules made thereunder, it may by order in writing, suspend the governing body.

(2) Where a governing body is suspended under sub-section (1) the Registration Authority shall appoint an administrator, or a care taker body consisting of not more than five persons, who shall have all the authority & powers of the governing body under the constitution of the agency.

(3) Every order of suspension under sub-section (1) shall be placed by the Registration Authority before a Board, consisting of not more than five persons, constituted by the Government for the purpose, which shall have the power to make order within six months as to the reinstatement: or the dissolution & reconstitution, of the governing body, as it may think fit.

(4) The Government body constituted after of dissolution & reconstitution is made under sub-section (3) may appeal to the Government within thirty days from the date of such order, & the decision of the Government shall be final & shall not be called in question in any court.

www.pathagar.com

10. **Dissolution of registered agency.**— (1) If at any time Registration Authority has reason to believe that a registered agency is acting in contravention of its constitution, or contrary to any of the provisions of this Ordinance or the rules made thereunder, or in a manner prejudicial to the interest of the public, it may after giving such opportunity to the agency of being heard if it thinks fit, make a report thereon to the Government.

(2) Government, if satisfied after considering the report that it is necessary or proper to do so, may order that the agency shall stand dissolved from the date mentioned therein.

11. (1) No registered agency shall be dissolved by its governing body or members thereof.

(2) If it is proposed to dissolve any registered agency, not less than three-fifths of its members may apply to the Government in such manner as may be prescribed, for making an order for the dissolution of such agency.

(3) The Government, if satisfied after considering the application that it is proper to do so, may order that the agency shall stand dissolved on & from such date as may be specified in the order.

12. **Consequences of dissolution.**— (1) Where any agency is dissolved under this Ordinance, its registration thereunder shall stand cancelled on & from the date the order of dissolution takes effect, & the Government may—

(a) Order any Bank or other person who holds money, securities or other assets on behalf of the agency not to part with such money, securities & assets without the previous permission in writing of the Government.

(b) appoint a competent person to wind up the affairs of the agency, with power to institute & defend suit & other legal proceedings on behalf of the agency, & to make such orders & take such action as may appear to him to be necessary for the purpose; and

(c) Order any money, securities & assets remaining after the satisfaction of all debits & liabilities of the agency to be paid or transferred to such other agency, having objects similar to the objects of the agency, as may be specified in the order.

www.pathagar.com

(2) Orders made by the person appointed under clause (b) of sub-section (1) shall on application, be enforceable by any Civil Court having local jurisdiction in the matter as a degree of such court.

13. **Inspection of documents etc.** — Any person may, on payment of the prescribed fee inspect at the office of the Registration Authority an document relating to a registered agency, or obtain a copy of or an extract from any such document.

14. **Penalties & procedure.** — (1) Any person who—

(a) contravenes any of the provisions of this Ordinance or any rule or order made thereunder ; or

(b) in any application for registration under this Ordinance, or in any report or statement submited to the Registration Authority or published for general information thereunder, makes any false statement or false representation;

(c) shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both.

(2) Where the person committing an offense under this Ordinance is a company, or other body corporate, or an association of persons, every director, manager, secretary & other officer thereof shall, unless proved that the offense was committeed without his knowledge or consent be deemed to be guilty of such offense.

(3) No Court shall take cognizance of an offense under this Ordinance except upon complain in writing made by the Registration Authority or by an officer authorized by it in this behalf.

15. **Indemnity.**—No suit, prosecution or other legal proceeding shall be filed against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Ordinance.

16. **Power to amend schedule.**—The Government may by notification in the official Gazette, amend the schedule so as to include therein or exclude therefrom any field of Social Welfare Service.

www.pathagar.com

17. **Power to exempt.**— The Government may by notification in the official gazette, exempt any agency or class of agencies from the operation of all or any of the provisions of this Ordinance.

18. **Delegation of powers.**—The Government may, by notification in the official Gazette, delegate all or any of its powers under this Ordinance either generally, or in respect of such agency or class of agencies as may be specified in the notification to any of its officers.

19. **Rules.**—The Government may, by notification in the official Gazette, make rules for carrying into effect the provisions of this Ordinance.

THE SCHEDULE

(SEE SECTION 2F)

(i) Child Welfare.
(ii) Youth Welfare.
(iii) Women's Welfare.
(iv) Welfare of the physically & mentally handicapped.
(v) Family Planning.
(vi) Recreational programmes intended to keep people away from anti-Social Activities.
(vii) Social Education, that is, education of adult aimed at developing sense of civic responsibility.
(viii) Welfare & rehabilitation of released prisoners.
(ix) Welfare of Juvenile delinquents.
(x) Welfare of the beggars & destitutes.
(xi) Welfare of the socially handicapped.
(xii) Welfare & rehabilitation of patients.
(xiii) Welfare of the aged & infirm.
(xiv) Training in Social Work.
(xv) Co-ordination of Social Welfare agencies.

www.pathagar.com

[Published in the Bangladesh Gazette, Extraordinary, dated the 20th November, 1978]

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF LAW AND PARLIAMENTARY AFFAIRS

NOTIFICATION

Dhaka, the 20th November, 1978

No. 880-pub.—The following Ordinance made by the President of the People's Republic of Bangladesh, on the 15th November, 1978, is hereby published for general information:—

THE FOREIGN DONATIONS (VOLUNTARY ACTIVITIES) REGULATION ORDINANCE, 1978

Ordinance No. XLVI of 1978
AN
ORDINANCE

to regulate the receipts and expenditure of foreign donations for voluntary activities.

WHEREAS it is expedient to regulate receipts and expenditure of foreign donations for voluntary activities;

Now, therefore, in pursuance of the Proclamations of the 20th August, 1975, and the 8th November, 1975, and in exercise of all powers enabling him in that behalf, the President is plessed to make and promulgate the following Ordinance:—

1. **Short title.**—This Ordinance may be called The Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Ordinance, 1978.

2. **Definition.**—In this ordinance, unless there is anything repugnant in the subject or context,—

(a) "foreign donation" means a donation, contribution or grant of any kind made for any voluntary activity in Bangladesh by any foreign Government or organisation or a citizen of a foreign State and includes, except in the case

www.pathagar.com

of a donation made for such charity as the Government may specify any donation made for any voluntary activity in Bangladesh by a Bangladeshi citizen living or working abroad;

(b) "organisation" means [1][a church or] a body of persons, called by whatever name, whether incorporated or not, established by persons for the purpose of undertaking or carrying on any voluntary activity in Bangladesh;

(c) "prescribed" means prescribed by rules made under this Ordinance; and

(d) "voluntary activity" means an activity undertaken or carried on [2][partially or entirely with external assistance] by any person or organisation of his or its own free will to render agricultural, relief, missionary, educational, cultural, vocatonal, social welfare and developmental services and shall include any such activity as the Government may, from time to time, specify to be a voluntary activity;

3. **Regulation of Voluntary Activity.**—(1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no person or organisation shall, save as provided in this Ordinance, undertake or carry on any voluntary activity without prior approval of the Government, nor shall any person or organisation receive or operate, except with prior permission of the Government, any foreign donation for the purpose of undertaking or carrying on any voluntary activity.

(2) A person or organisation receiving or operating any foreign donation for the purpose of undertaking or carrying on any voluntary activity shall register himself or itself with such authority and in such manner as the Government may specify.

---

[1] Inserted by Ordinance No. XXXII of 1982 published in the Bangladesh Gazette, Extraordinary, dated 8-9-82.

[2] Inserted by Ordinance No. XXXII of 1982.

www.pathagar.com

(3) Except in such cases as the Government may, by order in writing, exempt, all persons and organisations undertaking or carrying on voluntary activities with foreign donation, in whole or in part, shall submit to such authority and by such date as the Government may, my notification in the official Gazette, specify a declaration showing there in the foreign donation received by them, the source from which it has been received and the manner in which it has been utilised:

Provided that, in a case where the Government considers it necessry, it may, by order, require such declaration to be submitted at any time to be specified in the order.

(4) A person or organisation carrying on any voluntary activity immediately before the commencement of this Ordinance may continue so to carry on a voluntary activity for a period not exceeding six (6) months from such commencement unless the Government has, upon an application made in this behalf in such form and containing such particulars as the Government may direct, granted him or it a permission to continue so to undertake or carry on thereafter.

(5) Nothing in this section shall apply to an organisation established by or under any law or the authority of the Government.

4. **Power of inspection.**—(1) The Government may, at any time, for reason to be recorded in writing, cause an inspection to be made, by one or more or its officers, of the books of accounts and other documents of any person or organisation required to submit declaration under sub-section (3) of section 3, and, where necessary, direct all such books of accounts and other documents to be seized.

(2) Every such person or organisation shall produce books of accounts and other documents and furnish such statements and

www.pathagar.com

informations to such officer or officers as such officer or officers may require in connection with the inspection under sub-section(1).

(3) Failure to produce any books of accounts or other documents or to furnish any statement or information required under sub-section (2) shall be deemed to be contravention of the provision of this Ordinance.

5. **Audit and accounts.**— (1) Every person and organisation referred to in sub-section (1) of section 3 shall maintain his or its accounts in such manner and form as the Government may specify.

(2) The accounts of every such person or organisation shall be audited by such persons or person as the Government may direct and two copies of the accounts so audited shall be furnished to the Government within two months after the financial year to which the accounts relate.

6. **Penalty for false declaration etc.**— [1][1) If the Government is satisfied that any person or organisation referred to in sub-section (1) of section 3 has failed to submit a declaration under sub-section (3) of that section or wilfully submitted or caused to be submitted a declaration which he or it knows or has reason to believe to be false or has otherwise contravened any provision of this Ordinance, [2][it may, by order, cancel the registration of such person or organisation or] stop any voluntary activity undertaken or carried on by such person or organisation :

Provided that no order under this section shall be made without giving such person or organisation a reasonable opportunity of being heard.

---

[1] Substituted by Ordinance No. XXXII of 1982.

[2] Substituted by Ordinance No. XXXII of 1982.

www.pathagar.com

[1][(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), whoever receives or operates any foreign donation in contravention of the provisions of this Ordinance or any rules made thereunder shall be liable to pay a penalty of double the amount or value of the donation received or, as the case may be, operated, or to imprisonment for a term which may extend to three years or both].

[2][6A. **Cognizance of offence.**—No court shall take congnizance of an offence under this Ordinance or any rules made thereunder except on a complaint made by the Government].

7. **Power to make rules.**—The Government may by notification in the official Gazette, make rules to carry out the purpose of this Ordinance.

ZIAUR RAHMAN, BU
MAJOR GENERAL,
President

DHAKA;
The 15th November, 1978

K.M. HUSAIN
Deputy Secretary.

---

1 Added by Ordinance No. XXXII of 1982.

2 Inserted by Ordinance No. XXXII of 1982.

www.pathagar.com

[Published in the Bangladesh Gazette, Extraordinary, dated the 12th December, 1978]

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
Political Branch
Section IV

NOTIFICATION

Dhaka, the 12th December, 1978

No. S. R. O. 329-L/78.— In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Ordinance, 1978 (XLVI of 1978), the Government is pleased to make the following rules, namely :—

THE FOREIGN DONATIONS (VOLUNTARY ACTIVITIES) REGULATION RULES, 1978

1. **Short title.**—These rules may be called the Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Rules, 1978.

2. **Definitions.**—In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context,—

(a) "Director" means the Director, Department of Social Welfare, Government of the People's Republic of Bangladesh;

(b) "Form" means a Form annexed to these rules;

(c) "Ordinance" means the Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Ordinance, 1978 (XLVI of 1978 ; and

(d) "Section" means a section of the Ordinance.

3. **Application for registration.**—(1) Any person or organisation receiving or operating any foreign donation for the

www.pathagar.com

purpose of undertaking or carrying on any voluntary activity shall apply to the Director for a registration in Form FD-1.

(2) The Director may, on receipt of an application under sub-rule (1), call for any other information from the applicant which he may consider necessary and the applicant shall furnish the information called for within the period specified in that behalf.

(3) The Director may, after making such enquiries as he may consider necessary to ascertain the correctness of the information as contained in the application and the information supplied under sub-rule (3), if any, register the person or organisation to be a person or organisation for the purpose of undertaking or carrying on any voluntary activity :

Provided that no person or organisation shall be registered without the prior approval of the Ministry of Home Affairs.

4. Application for approval and permission to receive and operate foreign donations.—(1) No person or organisation registered under sub-rule (3) of rule 3 shall receive or operate any foreign donation without prior approval or permission of the Government for such receipt or undertaking.

(2) All applications for approval or permission under sub-rule (1) shall be submitted to the Government in the Ministry of Finance (External Resources Division) in Form FD-2.

[1][(3) No approval or permission for receiving or operating any foreign donation for undertaking or carrying on voluntary activity shall be accorded without prior approval of the Ministry of Home Affairs].

[2][(4) Every person or organization registered under sub-rule (3) of rule 3 shall receive all funds in foreign exchange through an account [3][opened in any scheduled Bank of Bangladesh which shall submit statements of such funds to the Bangladesh Bank.]

---

[1] Substituted by S.R.O. No. 352-L/82, dated 6-10-82 by the Ministry of Home Affairs which was published in the Bangladesh Gazette, Extra, October 6, 1982.
[2] Added by S.R.O. No. 325-L/42 dated 6-10-82, by the Ministry of Home Affairs.
[3] Substituted by S.R.O. No. 422-L/84, dated 19-9-84 by the Ministry of Home Affairs which was published in the Bangladesh Gazette, Extra., September 19, 1984.

www.pathagar.com

(5) The Bangladesh Bank shall submit statements of the funds so received for each person or organization separately to the External Resources Divisio in June and December every year.

5. **Submission of declarations.**— (1) All declarations under sub-section (3) of section 3 shall be submitted to the Government in the Ministry of Finance (External Resources Division).

(2) All declarations under sub-rule (1), if it relates to receipt of foreign donations, shall be submitted in Form FD-3, and if it relates to its utilisation, in Form FD-4.

(3) All declarations in respect of a person or organisation carrying on voluntary activity immediately before the commencement of the Ordinance shall be submitted within thirty days from such commencement and every six months thereafter, and in respect of other such persons or organisations in every six months.

[4][5A. **Submission of schemes, etc.**— [5][(1) Every person or organisation shall submit to the External Resources Division and the Department of Social Welfare his or its project on voluntary activities along with plan of its operation showing the estimated cost, expected receipts, source of receipts, purpose and objects and duration thereof on or before the 31st March preceding the financial year in which such project is to commence.]

(2) Each person [6][who is not a Bangladesh national], engaged in voluntary activity shall submit his particulars with reference to nationality, period of stay in Bangladesh, remuneration, the agency under whose supervision he is undertaking or carrying on voluntary activity, etc., to the Ministry of Home Affairs and the Department of Social Welfare.

---

[4] Inserted by S.R.O. No. 352-L/82 dated 6-10-82, by the Ministry of Home Affairs.

[5] Substituted by S.R.O. No. 422-L/84, dated 19-9-84 by the Ministry of Home Affairs.

[6] Inserted by S.R.O. No. 422-L/84, dated 19-9-84 by the Ministry of Home Affairs.

www.pathagar.com

(3) Each organisation shall [7][annually] submit to the Ministry of Home Affairs and the Department of Social Welfare a statement showing all relevant particulars relating to age, qualification, nationality, period of service with the organization, remuneration, etc., of persons engaged in different schemes undertaken or carried on by it.

(4) Each organization shall obtain prior clearance of the Ministry of Home Affairs and Department of Social Welfare for employment of [8][any staff, who is not a Bangladesh national], for its voluntary activity.

5B. **Submission of report on activities.**—Every person or organization shall submit [9][yearly] reports on his or its activities to the External Resources Division with copies to the administrative Ministry, the Ministry of Home Affairs and the Department of Social Welfare].

6. **Maintenance of books of accounts.**—(1) Every person or organisation undertaking or carrying on voluntary activities shall maintain books of accounts—

(a) Where the foreign donation relates to articles only, in Form FD-5;

(b) Where the foreign donation relates to currency, in the cash book and ledger book on double entry basis.

(2) Accounts under sub-rule (1) shall be maintained on a half-yearly basis, one for the period commencing on the 1st day of July and ending on the 31st day of December, and the other for the period commencing on the 1st day of January and ending on the 30th day of June.

(3) All books of accounts maintained under this rule shall be audited by a chartered accountant as defined in the Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P.O. 2 of 1973), and tow copies of accounts so audited shall be furnished to the Secretary, Ministry

---

[7] Substituted by S.R.O. No. 422-L-84, dated 19-9-84 by the Ministry of Home Affairs.
[8] Substituted by S.R.O. No. 422-L/84, dated 19-9-84 by the Ministry of Home Affairs.
[9] Substituted by S.R.O. No. 422-L/84, dated 19-9-84 by the Ministry of Home Affairs.

www.pathagar.com

of Finance (External Resources Division) with a copy to the administrative Ministry concerning the activity of the project.

7. **Bank Accounts.**—A separate Bank Account shall be maintained by every person or organisation authorised under these rules for each foreign donations.

8. **Seizure of books of accounts.**—(1) Every seizure of books of accounts and other documents under section 4 shall be made in accordance with the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898), as they apply to any search or seizure made under the authority of a warrant issued under section 98 of the Code.

(2) The officer or officers responsible for seizure of books of accounts and other documents under sub-rule (1) shall return them if no action is taken as required by the Ordinance.

9. **Manner of service of order or direction.**—An order under section 6 or any other order or direction made or issued under the Ordinance shall be served on the person or organisation concerned in the following manner, that is to say,—

(a) by delivering or tendering to that person or as the case may be, organisation, or to his or its duly authorised agent; or

(b) by sending it to him by registered post with acknowledgement due to the address of his last known place of residence or the place where he carries on, or is known to have last carried on business, or the place where he personally works for gain, or is known to have last worked for gain, and in case the person is an organisation to the last known address of the office of such organisation; or

(c) if it cannot be served in any of the manner aforesaid, by affixing it on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which that person resides, or carries on or is known to have last carried on business, or is known to have last worked, and in case the person is an organisation on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which the office of that organisation is located or is known to have been last located, and the written report whereof should be witnessed by at least two persons.

www.pathagar.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রাষ্ট্রপতির সচিবালয়
জন বিভাগ
প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ৩০শে বৈশাখ, ১৩৯৭/১৪ই মে, ১৯৯০

নং এস, আর, ও ১৮০-আইন/৯০—Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Ordinance, 1978 (XLVI of 1978) এর Section 7 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, সরকার Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Rules, 1978 এর নিম্নরূপ সংশোধন করিলেন, যথাঃ—

উপরি-উক্ত Rules এর—

(১) শীর্ষে "Ministry of Home Affairs Political Branch Section IV" শব্দগুলি ও সংখ্যাটির পরিবর্তে "PRESIDENT'S SECRETARIAT PUBLIC DIVISION" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(২) সর্বত্র "Director" শব্দটির পরিবর্তে "Director General" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৩) rule 2 তে clause (a) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ Clause (a) এবং (aa) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

(a) "NGO Affairs Bureau" means the Non-Government Organisation Affairs Bureau established by the Government;

(aa) "Director General" means the Director General in charge of the NGO Affairs Bureau, Government of the People's Republic of Bangladesh; or such other officer as the Government may, by notification in the official gazette, authorise to exercise the powers and perform the functions of Director General under these rules;"

(৪) rule 3 এর—

(ক) sub-rule (3) এর—

(অ) "sub-rule (3)" শব্দটি, বন্ধনীসমূহ এবং সংখ্যাটির পরিবর্তে "sub-rule (2)" শব্দটি, বন্ধনীসমূহ ও সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(আ) "carrying on any voluntary activity" শব্দগুলির পর "and such registration shall, unless earlier cancelled, remain valid for five years" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) sub-rule (3) এর পর নিম্নরূপ sub-rule সংযোজিত হইবে, যথাঃ—

"(4) A person or an organisation registered under sub-rule (3)

www.pathagar.com

may, at least six months prior to the date of expiry of his or its registration, apply in such form as the Director General may specify in this behalf, for renewal of his or its registration.

(5) The Director General may, on receipt of an application under sub-rule (4), call for any information from the applicant which he may consider necessary and the applicant shall furnish the information called for within the period specified by the Director General in that behalf.

(6) The Director General may, after considering the information supplied under sub-rule (5), if any, renew the registration for a period of five years.

(7) No person or organisation shall undertake or carry on any voluntary activity after the date of expiry of his or its registration for undertaking or carrying on such activity:

Provided that a person or an organisation may, in exceptional circumstances, be allowed by the Director General to undertake or carry on such activity for a period not exceeding six months from the date of such expiry if his or its application for renewal of registration is pending with the Director General.

(8) An application under sub-rule (1) for registration or under sub-rule (4) for renewal of registration shall be accompanied by a treasury chahlan showing receipt of such fee as the Government may, from time to time, determine in this behalf."

(৫) rule 4 এর—

(ক) sub-rule (2) তে "Government in the Ministry of Finance (External Resources Division)" শব্দগুলি ও বন্ধনীগুলির পরিবর্তে "NGO Affairs Bureau" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) sub-rule (3) বিলুপ্ত হইবে; এবং

(গ) sub-rule (4)এর পরিবর্তে নিম্নরূপ sub-rule (4) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(4) Every person or Organisation registered under sub-rule (3) of rule 3 shall rceive the funds—

(a) in foreign exchange, or

(b) in local currency, if such funds are originated abroad in foreign exchange and received in local currency in Bangladesh, through only account opened in any scheduled Bank, which shall submit statements of such funds to the Bangladesh Bank and the NGO Affairs Bureau."

www.pathagar.com

(ঘ) sub-rule (5) এ "External Resources Division" শব্দগুলির পর "and the NGO Affairs Bureau" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(৬) rule 5 এর—

(ক) sub-rule (1) এ "Ministry of Finance (External Resources Division)" শব্দগুলি ও বন্ধনীগুলির পরিবর্তে "President's Secretariat, Public Division, NGO Affairs Bureau and the External Resources Division" শব্দগুলি ও কথাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) sub-rule (2) তে "shall be submitted in Form FD-3, and if it relates to its utilization, in Form FD-4." কমাগুলি, শব্দগুলি, অক্ষরগুলি ও সংখ্যাগুলির পরিবর্তে "and its utilization, shall be submitted in Form FD-3" শব্দগুলি, কমা, অক্ষরগুলি ও সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৭) rule-5A এর—

(ক) sub-rule (1) এ "External Resources Division and the Department of Social Welfare" শব্দগুলির পরিবর্তে "NGO Affairs Bureau" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) sub-rule (2) তে—

"Ministry of Home Affairs and the Department of Social Welfare" শব্দগুলির পরিবর্তে "NGO Affairs Bureau and the Ministry of Home Affairs," শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) sub-rule (3) তে—

(অ) "Ministry of Home Affairs and the Department of Social Welfare" শব্দগুলির পরিবর্তে "NGO Affairs Bureau and the Ministry of Home Affairs" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(আ) "schemes undertaken or carried on by it" শব্দগুলির পর "according to details of project personnel as shown in the project proforma" শব্দগুলি সংযোজিত হইবে;

(ঘ) sub-rule (4) এ—

"Ministry of Home Affairs and the Department of Social Welfare" শব্দগুলির পরিবর্তে "NGO Affairs Bureau and the Ministry of Home Affairs." শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঙ) sub-rule (4) এর পর নিম্নরূপ নূতন sub-rule (5) সংযোজিত হইবে, যথাঃ—

"(5) Every project on voluntary activities submitted under sub-rule (1) shall be accompanied by a treasury challan showing receipt of such service charge as the Government may, from time to time, determine in this behalf";

www.pathagar.com

(৮) rule 5B তে—

"External Resources Division with copies to the administrative Ministry, Ministry of Home Affairs and the department of Social Welfare" শব্দগুলি ও কমাটির পরিবর্তে "NGO Affairs Bureau with copies to the administrative Ministry, the Ministry of Home Affairs and the External Resources Division" শব্দগুলি ও কমাটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৯) rule 5B এর পর নিম্নরূপ নূতন rule 5BB সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

"5BB. Deposit of fees and service charges.—The fees payable under sub-rule (8) of rule 3 and the service charges payable under sub-rule (5) of rule 5A shall be deposited in the Government treasury under প্রধান খাত "৬৫-কর ব্যতীত বিধি প্রাপ্তি" এর অধীন "এনজিওদের রেজিষ্ট্রেশন, রেজিষ্ট্রেশন নবায়ন, প্রকল্প অনুমোদন বাবদ ফি/সার্ভিস চার্জ আদায়।" শীর্ষক য়েণ খাতে।"

(১০) rule 6 এর sub-rule (3) তে—

"to the Secretary, Ministry of Finance (External Resources Division) with a copy to the administrative Minisrty concerning the activity of the project" শব্দগুলি ও কমাটি ও বন্ধনীগুলির পরিবর্তে "along with a certificate from the auditors in Form FD-4, to the NGO Affairs Bureau with a copy to External Resources Division and the administrative Ministry concerning to the activity of the project" কমাগুলি, শব্দগুলি, অক্ষরগুলি ও সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(১১) rule 7 এর পরিবর্তে নিম্নরূপ rule 7 প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"7. Bank Accounts.—Only one bank account shall be maintained by every person or organisation authorised under these rules for receiving foreign donations:

Provided that separate bank accounts for separate projects may be maintained for internal transactions after the donations have been received through the only bank account opened under sub-rule (4) of rule 4."

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
সোহেল আহমদ
পরিচালক।

www.pathagar.com

[Published in the Bangladesh Gazette, Extraordinary, dated the 8th September, 19821

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF LAW AND LAND REFORMS
(Law and Parliamentary Affairs Division)

NOTIFICATION

Dhaka, the 8th September, 1982

No. 541.Pub— The following Ordinance made by the Chief Martial Law Administrator of the People's Republic of Bangladesh, on the 6th September, 1982, is hereby published for general information:-

THE FOREIGN CONTRIBUTIONS (REGULATION) ORDINANCE, 1982

Ordinance No. XXXI of 1982
AN
ORDINANCE

to regulate receipt of foreign contributions

WHEREAS it is expedient to regulate receipt of foreign contributions;

Now, THEREFORE, in pursuance of the Proclamation of the 24th March, 1982, and in exercise of all powers enabling him in that behalf, the Chief Martial Law Administrator is pleased to make and promulgate the following Ordinance:—

1. Short title.—This Ordinance may be called the Foreign Contributions (Regulation) ordinance, 1982.

2. Ordinance to override all other laws.—The provisions of this Ordinance shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force or in any contract or agreement.

www.pathagar.com

3. **Definition.**—In this Ordinance, unless there is anything repugnant in the subject or context, "foreign contribution" means any donation, grant or assistance, whether in cash or in kind, including a ticket for journey abroad made by any Government, organisation or citizen of foreign state.

4. **Receipt of foreign contribution wthout permission prohibited.**— (1) No citizen of, or organisation in, Bangladesh shall receive any foreign contribution without the prior permission of the Government.

(2) No Government, organisation or citizen of a foreign state shall make any donation, grant or assistance, whether in cash or in kind, including a ticket for journey abroad, to any citizen of, or organisation in Bangladesh without the prior permission of the Government.

(3) Nothing in this section shall apply to an organisation established by or under any law or the authority of the Government.

5. **Penalty etc.**—(1) Whoever receives or makes any foreign contribution in contravention of the provisions of section 4 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine not exceeding two times the amount or value of the contribution, or with both.

(2) No court shall take cognizance of an offence under this Ordinance except on a complaint made by the Government or any officer authorised by it in this behalf.

H. M. ERSHAD, ndc. psc
LIEUTENANT-GENERAL
Chief Martial Law Administrator.

DHAKA;
The 6th September,1982

S. RAHMAN
Deputy Secretary

www.pathagar.com

কিছু গুরুত্বপূর্ণ দাতা সংস্থার তালিকা

Sl. No.	Name & Address of the Donor Organizations	Types of Project funded
1.	**Aga Khan Foundation** SW(F) B, Road-2, Gulshan, Dhaka -1212, Phone: 884326, 601924	Urban dev., Slum dev., Education.
2.	**Andheri Hilfe e.v.** Mackestrasse 453, D-53119, Bonn, Germany.	Assistance to Blind, Women dev., Relief & Rehabilitation, Community dev.
3.	**Asia Partnership For Human Development (APHD)** 3A. Hing Wah Commercial Building, 450-454, Shanghai Street, Kowloon, Hong Kong.	Human Resource dev., Education, Commmunity dev., Environment, Human Rights, Peoples Rights.
4.	**Australlian High Commission** 184 Gulshan Avenue, Gulshan Dhaka, Phone: 600091-5	Small dev. initiatives, Environmental issus, Human Rights, Women dev., Income Generation.
5.	**Association For Voluntary Surgical Contraception (AVSC)** House-35, Road-12A (New) Dhanmondi, Dhaka Phone: 326610, 317040	Health, Family Planning (FP), MCH
6.	**Algemeen Diakonaal Bureauvan De Geveformeerde Karchen in Netharland (ADB)** 3833, AH Lensden The Netherlands	Community (Com.) dev., Human Rights, Human Resource development.
7.	**British High Commission** United Nations Rd., Baridhara Dhaka, Phone: 600133-7.	Health, Education, Population, Agriculture, Training.
8.	**Bangladesh Population Health Consortium (BPHC)** House-8, Road- 12 (New), Dhanmondi, Dhaka-1209 Phone: 815499, 315324, 329910	FP, Health Services, Women Development, Training Senar & Workshop.

www.pathagar.com

9. **Bread for the World** Stafflenbergstr-76, D-7000 Stuttgart-1, FRG Phone: 0711/2159-0	Com. development, Human Rights, Education, Health, Human Resource Development Training.
10. **Actionaid- Bangladesh** House 9/4, Road-3, Shyamali, Dhaka-1207	Landless Rehabilitation (Rehab.), Education, Rural development.
11. **CBR Development And Training Centre** J 1 Adisvicipto KM 7, Colomadu Solu 57176, Indonesia, Pone: 62-271-780075 or 780829 Fax: 62-271-70976	Rehab. of Disables
12. **The Norwegian Association of The Mentally Retarded (NFPU)** Rosenkraantzgt, 160160, Oslo, Norway Phone: 47-22-330585 Fax- 47-22-332904	Rehab. & Education for the Mantally Retarded.
13. **International Centre For The Advancement Of Community Based Rehabilitation (ICACBR)** Queen's University, Kingstong Ontario, Canada K 72 3N6	Health, Com development.
14. **World Council Of Churches** Route De Ferney, Box-2100 1 Geneva 2 Switzerland Phone-022-791 61 11 Fax-022-791 03 61	Com development, Education, Health.
15. **National Federation Of UNESCO Association In Japan** Ashai Semei Ebisu Bldg., 12F 1-3-1 Ebisu, Shibuya-Ku, Tokeyo-150, Japan Phone-81-3-5424-1121 Fax-81-3-5424-1126	Education, Training, Seminar, Workshop.

www.pathagar.com

16. **Water Aid** 1 Queen Anne's Gate, London SWIH 9BT, UK Phone: 0171 233 4800 Fax: 0171 233 3161	Water Management, Irrigation.
17. **NOVIB** Amaliastraat-7, 2514 JC The Haque, The Netharlands Phone: 070 342 16 21 Fax- 070- 361 44 61	Rural dev. (RD), Non-Formal Education, Training, Credit.
18. **International Coordination Committee For Development (ICCO)** Zusterphen 22A The Netharlands Fax- 31-3404-25614	Do
19. **EZE** Mittelstrasse 37, D-5300, Bonn 2, Germany, Fax-49-228-8101160	RD, Education, Training, Credit, Health, Nutrition.
20. **The Angelical Church of Canada** 600 Jarvis Street, Toronto, Ontario Canada M4Y 216 Phone- 416-924-3483	RD, Education, Training, Credit, Health, Nutrition.
21. **National Christian Council In Japan** Japan Christian Centre, 2-3-18-24 Nishiwaseda, Shinjuku-KU, Tokyo, Japan	RD, Non-formal Education IGP, Training.
22. **Community Aid Abroad** 156 George Street Fitzroy 3065 Australia.	Adult & Functional Education, Training, IGP, Gender and Environment.
23. **The Ford Foundation** House-30 (New, Road-15 (New) Dhanmondi R/A, Dhaka	Education, Cultural activities, Communication
24. **Swedish International Development Authority (SIDA)** Embassy of Sweden, 73 Gulshan Avenue, Dhaka	RD, Health, Education, Human Rights & Democracy, Disaster Response &Rehabilitation.

www.pathagar.com

25.	**The Swallows In Denmark** Oesterbrogade 49, OK 2100 Kbhvn, Copenhagen O, Denmark	Do.
26.	**Delegation Of The Commission Of The European Unions (EU)** House-7, Road-84, Gulshan, Dhaka	Community dev., Human Rights, Education, RD.
27.	**ODA** British High Commission, United Nation Road, Baridhara, Dhaka	Health, MCH. Family Life education.
28.	**Dutch Inter Church Aid (DIA)** Cron. Houtman Str. 17 P.O-13077, 3507 LB Utrecht The Netharlands	Socio economic dev., Poverty alleviation.
29.	**Canadian International Development Agency (CIDA)** The Canadian High Commission House-16A, Road-48, Gulshan, Dhaka-1212 Phone-884740	Disaster response, Small dev. initiatives, Environment Policy & Research, Human Rights, Women dev., Communication dev. Public Policy.
30.	**CEBEMO** P.0 Box 77, 2340 AB Oegstgest The Netharlands	Agriculture, IGP, Health Care, Women dev., Social reconstruction, Environment, Relief.
31.	**Catholic Relief Services (CRS)** 209,West Fayette Street, Baltimore, Maryland 21201-3403, USA	Emergency Relief, MCH, Community dev.
32.	**Caritas Internationals** Palazz San Calisto 00120 Vatican City	RD, Education, Health, Human Rights & Justice, Women & Children Issues, Relief, Environment, IGP, Credit.
33.	**Cafod** 2 Romero Cloce (Formerly Garden Close), Stockwell Road London SWIITY, England	Health, Sanitation, Relief & Rehabilitation, Low Cost Housing, Health Education, Cyclone shelter.
34.	**Christian Aid** P.O. Box 100, London SE1 7RT UK	Community dev., Socio Economic dev., Poverty alleviation.

www.pathagar.com

35. **Church World Service** 475 Reverside Drive NewYork NY-10115-0050, USA	Socio-economic dev., Poverty Alleviation.
36. **Danchurchaid** 3, Sankt Peders Straede DK-1453 Copenhagan K, Denmark	Socio-Economic dev., Poverty alleviation, Education, Health.
37. **Hilfswerk Der Evangelischen Kirchen Der Schweiz (HEKS)** Post Fach 168, CH-8035, Zurich, Switzerland Fax- 41-1-3617827	Do
38. **Norwegian Church Aid** P.O. Box-5868, Hegdehaugen 0308, OSLO-3, Norway, Fax-47-22-22-2420	Do
39. **Hong Kong Christian Council** 33, Granville Road, Kln, Hong-Kong, Fax-(852) 7242131	Do
40. **Mani Tese'76** Organismo Contro la fame e per lo sviluppo dei popoli-Via Cavenaghi, 4-20149 Milano, Italy.	Rd. Water & Sanitation, Education, IGP, Health, Fl
41. **Pathfinder International** House-15, Road-13A Dhanmondi, Dhaka-1209	Family Planning (FP)
42. **Skip-Outreach To Third World Children** Rue-Goldimann 12, 1700 Fribourg Switzerland	Children development, Health, MCH.
43. **Die Lich Brucku EV** Lappstr-48, 5250 Engelskirchen, Germany Phone- 02263/2103	RD. Health, IGP, Women & Children Issue, Human Rights.
44. **Niwano Peace Foundation** Shamvilla Catherina 5F, 1-16-9 Shinjuku Shanjuku, Tokyo 160, Japan	RD. Health, IGP, Women & Children Issue, Human Rights.

www.pathagar.com

45. **Canada Fund** House-2, Road-95, Gulshan Dhaka-1212 Phone-884740-4	RD, Community dev., Health, Women issue, MCH, Sanitation, IGP
46. **The Asia Foundation** House-2, Road-128 Gulshan, Dhaka Phone 811229, 811230, 811231, 811654	Human Rights, Education Dev. Communication, Legal Support, FP Dev. Journalism.
47. **DANIDA** House-1, Road-51, Gulshan Dhaka-1212 Phone-881799, 882499, 882699	RD, Community dev., IGP. Credit, Children dev., Environment, Human Rights, Education.
48. **Enfants DU Monde (EDM)** House-12, Road-15 New, Dhanmondi R/A, Dhaka Phone: 81492, 316943	Children dev., MCH.
49. **Food For The Hungry International** House-69, Block-D, Road-15 Banani, Dhaka, Phone: 610826	Agriculture, Relief.
50. **Family Planning International Assistance (FPLA)** Steel House, Kaoran Bazar (7th floor), Airport Road, Dhaka Phone: 411246, 329950	FP
51. **International Angel Association (Japan)** Kanabari, P.O. Nilnagar, Gazipur	Education, Community dev., Health, MCH.
52. **MISEREOR** Posfach 1450, Mozartstrabe 9 5100 Aachen, Germany	Agriculture, Trade School, Technical Education, Slum dev. Youth dev. Commu-nication media, Commu-nity dev, Sericulture.
53. **OXFAM** 6/8 Sir Sayed Road, Block-A, Mohammadpur, Dhaka Phone: 81764, 816157	Health, Disaster preparedness, Education, RD, Human Rights, Women dev, Landless and Employment, Poverty Alleviation, Training.

www.pathagar.com

54. **Korean Development Association** 2/12, Iqbal Road, Mohammadpur, Dhaka, Phone-813103	RD, IGP, Education, Appropriate Technology, Agriculture.
55. **Pact Bangladesh PRIP** House-56, Road-16 New, Dhanmondi, Dhaka Phone- 819111, 815953	Institutional dev., Disaster Management, Training.
56. **Radda Barnen** House-55, Road-5, Dhanmondi, Dhaka-1209, Phone-865631, 865231	Child development.
57. **Royal Danish Embassy** House- 1, Road-51, Gulshan, Dhaka Phone: 600108, 601282	Agriculture, Health, Education, Human Rights and Democracy, Environment, Women dev, Livestock/ Fisheries, Disaster Management.
58. **Royal Netherlands Embassy** House -49, Road- 90 Gulshan, Dhaka- 1212 Phone : 882715-7	Socio Economic dev., Support for poor and landless people.
59. **Save The Childern Fund-Australia** 2 Asad Gate Commercial Plot (2nd floor), Mohammadpur Dhaka-1207, Phone- 328324	Health, Small dev. Initiatives, Human Rights, Socio-economic dev., IGP, Education, Poverty alleviation, Training.
60. **Save The Children- USA** G.P.O. Box-412, Dhaka Phone- 314619, 315291, 317454	Relief & Rehabilitation, Child dev., Agriculture, Health, Nutrition, FP, Education, Human Resources development.
61. **South Asia Partnership (SAP)** 3/18, Iqbal Road, Mohammadpur, Dhaka-1207 Phone- 812103	Human Rssource dev., Education, Credit, IGP, Health, Sanitation, Agriculture, Legal Aid and Legal Education.

www.pathagar.com

62. **NORAD (The Royal Norwegian Embassy)** House- New (H) 1, Road-51, Gulshan, Dhaka Phone-602304	RD, Health Community dev., IGP, Cultural Activities, Education, Communication, People's Theatre.
63. **Embassy Of The Federal Republic Of Germany** 178, Gulshan Avenue Dhaka-1212	Disaster Rosponse.
64. **IVS** G.P.O. Box- 344, Dhaka-1000 Phone- 600929	Skill development, Feasibility analysis, Need assessment.
65. **United States Agency For International Development (USAID)** American Embassy Baridhara, Dhaka	FP, Health, Agriculture, Human Rights and Democracy, Poverty alleviation.
66. **USCCB** 22/18, Khilji Road (1st Floor) Block-B, Mohammadpur Dhaka-1207, Phone: 812031 Fax: 880-2-813049	Poverty Alleviation, RD. Education, IGP Water Supply and Sanitation, Health, Credit, Training, Environment.
67. **Stromme Memorial Foundation** House- 40, Road-13A, Dhanmondi, Dhaka Phone-813250	RD. Credit, Health, Training, Poverty alleviation.
68. **NETZ** Partnerschaft fuer, Entwicklungund, Gerechtigkect e.v, Ringstr-14, D-35641, Germany	Commnuity development, Education, Health, RD. IGP.
69. **Save The Children Fund -UK** House-15, Road-13A, Dhanmondi, Dhaka Phone: 315883	Children development, MCH, Education, IGP.

www.pathagar.com

দারিদ্র্য নিরসনের পথের সন্ধানে

জাতিসংঘের রোমভিত্তিক এজেন্সি 'ইফাদ' কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত এক নতুন সমীক্ষা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিগত ২০ বছরে উন্নয়নশীল দেশসমূহের পল্লী অঞ্চলে দারিদ্র্য ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১১৪টি দেশের পল্লী দারিদ্র্য সংক্রান্ত রিপোর্টে দেখা যায়, অর্থনীতির ধীরগতি এবং দরিদ্রদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির কারণে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোতে দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীকে যথাযথভাবে সম্পৃক্ত করা হয় না। এ রিপোর্টে আরো উল্লেখ করা হয়, অধিকাংশ উন্নয়ন কর্মসূচীতেই মূলধনী বিনিয়োগের পরিমাণ বেশী এবং এসব দেশের জিএনপি'র (GNP) ভিত্তিতেই শুধু কর্মসূচীর সাফল্য মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে।

অধিকাংশ উন্নয়ন কর্মসূচীতেই মূলধনী বিনিয়োগের পরিমাণ বেশী- 'ইফাদ'র সমীক্ষায় এই মন্তব্যের মর্মার্থ বস্তুনিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করলে এই দাঁড়ায় যে, মূলধনী প্রকল্পে বিনিয়োগ বেশি হওয়ায় গ্রামাঞ্চলে বিপুল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও জীবনমান উন্নয়নের সহায়ক কর্মসূচীর জন্য অর্থ সংকুলান করা সম্ভব হচ্ছে না। এর ফলে অবহেলিত ও উপেক্ষিত পল্লীবাসীদের দারিদ্র্য এবং জীবন ধারণের সমস্যা ক্রমশ তীব্রতর হয়ে উঠছে। আর সামান্য ব্যবধান ছাড়া তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর দারিদ্র্য ক্রমবর্ধমান। পৃথিবীর ধনী দেশগুলোতে মন্দার যত আস্ফালন শোনা যায়, প্রকৃতপক্ষে ব্যাপকতা ততটা নয়। কেননা, এ সকল সত্ত্বেও সেখানে প্রবৃদ্ধির ধারা কিন্তু অব্যাহতই রয়েছে। যদিও কখনো তা এশিয়ার কোনো কোনো দেশের সমান না-ও হতে পারে। যেমন-থাইল্যান্ডের প্রবৃদ্ধির হার ০৯ শতাংশেরও বেশি, কিন্তু এ তুলনায় দরিদ্র দেশের প্রবৃদ্ধির হার পরিলক্ষিত হয়ে থাকে অত্যন্ত নগণ্য। এছাড়া সম্পদের সুষম বন্টনের অভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অর্জিত প্রবৃদ্ধি অনেক ক্ষেত্রেই গ্রামের অবহেলিত সাধারণ ও সমগ্র মানুষকে স্পর্শতো করেই না, বরং তারা সমভাবে পিছাতেই থাকে।

ইউএনডিপি'র প্রতিবেদনের ভাষ্য

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচীর (ইউএনডিপি) ১৯৯২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখা যায়, উন্নত বিশ্বের জনসংখ্যার গরীব ২০ শতাংশ লোকেরা যা আয় করেন, ধনী ২০ শতাংশ মানুষ তা থেকে প্রায় ৬৫ ভাগ বেশি আয় করেন। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশসমূহে এই চিত্র আরো কঠিন। ইউএনডিপি ধনী-দরিদ্র ৪১টি দেশের উপর জরিপ করে তথ্য আহরণ করেছে। দরিদ্র দেশে ২০ শতাংশ মানুষ যা আয় করে ধনী ২০ শতাংশ লোক আয় করে তার চেয়ে ১৪১ গুণ বেশি। আর এই যদি হয় দরিদ্র পরিস্থিতি তাহলে পল্লী এলাকায় যে এই আয়ের ছিটে-ফোটাও পৌছতে পারে না, সে কথা অত্যন্ত নিঃসন্দেহেই বলা যায়। এ ক্ষেত্রে ভারত বা ইন্দোনেশিয়ার চিত্র একেবারে উপেক্ষা করার মতো নয়। ভারতের জিএনপি'র ৩৪ শতাংশ ভোগ করে ধনী ১০ শতাংশ লোক, আর ৯ শতাংশ ভোগ করে দরিদ্র ২০ শতাংশ লোক, একই চিত্র ইন্দোনেশিয়ার ক্ষেত্রেও প্রতিভাত হয়।

www.pathagar.com

সেখানকার ধনী ১০ শতাংশ লোক ৩৪ শতাংশ সম্পদ ভোগ করে। কিন্তু দরিদ্র ২০ শতাংশ লোক ভোগ কর মাত্র ৭ শতাংশ সম্পদ।

পৃথিবীর ধনী দেশগুলোতে ব্যবধান ৬০ গুণ হলেও দরিদ্রদের জীবনযাত্রার নূন্যতম নিরাপত্তার ব্যবস্থা রয়েছে। তারা দরিদ্র হিসাবেও যা পান জীবনযাপনের জন্য তা নূন্যতম হলেও এর একটা গ্যারান্টি আছে। কিন্তু সে গ্যারান্টি নেই দরিদ্র ও অনুন্নত দেশসমূহ।

আইএমএফ'র দৃষ্টিতে বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) দু'দশকের সবচেয়ে বড় বিশ্ব মুদ্রা সংকটের মুখে পড়েছে। তবে আইএমএফ কর্মকর্তাদের জোর ধারণা, ইউরোপের মুদ্রা সংকটের সাময়িক এবং খুব শিগগিরই বিশ্ব অর্থনীতির উপর দীর্ঘস্থায়ী বিরূপ পতিক্রিয়া তৈরি না করেই সেরে যাবে। আবার বেশ ক'জন মার্কিন কর্মকর্তা মুদ্রা সংকট কেটে যাওয়ার ব্যাপারে ততটা নিশ্চিত নন এবং তাদের জোর ভাষ্য, হঠাৎ করে কিভাবেই বা ইউরোপের পরিস্থিতির সমাধান হয়ে যাবে।

এ সকল পর্যায়ের ঝুঁকি রয়ে গেলেও খুড়িয়ে চলা সারা বিশ্ব অর্থনীতি পুনরুজ্জীবনের লক্ষণ দেখিয়েছে, এর উপর ভিত্তি করে আইএমএফ বিশ্ব অর্থনৈতিক দৃষ্টি ভংগিসহ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির রূপরেখা প্রণয়ন করেছে। (এতে সংখ্যায় আগে বিয়োগ চিহ্ন থাকলে উপাদান কমেছে বুঝতে হবে):

মানচিত্র	১৯৯১	১৯৯২	১৯৯৩
সমগ্রবিশ্ব	.১ শতাংশ	১.১ শতাংশ	৩.১ শতাংশ
শিল্পোন্নত দেশ	.৬ শতাংশ	১.৭ শতাংশ	২.৯ শতাংশ
মার্কিন যুক্তরাষ্ট	-১.২ শতাংশ	১.৯ শতাংশ	৩.১ শতাংশ
জাপান	৪.৪ শতাংশ	২.০ শতাংশ	৩.৮ শতাংশ
জার্মানী	০.৯ শতাংশ	১.৪ শতাংশ	২.৮ শতাংশ
ফ্রান্স	১.২ শতাংশ	২.২ শতাংশ	২.৭ শতাংশ
ব্রিটেন	-২.২ শতাংশ	.৮ শতাংশ	২.১ শতাংশ
কানাডা	-.৭ শতাংশ	২.১ শতাংশ	৪.৪ শতাংশ
ইতালী	১.৪ শতাংশ	১.৩ শতাংশ	১.৫ শতাংশ
ইসি	১.৮ শতাংশ	১.৪ শতাংশ	২.৩ শতাংশ
উন্নয়নশীল দেশ	৩.২ শতাংশ	৬.২ শতাংশ	৬.২ শতাংশ
আফ্রিকা	১.৫ শতাংশ	১.৯ শতাংশ	৩.৩ শতাংশ
এশিয়া	৫.৭ শতাংশ	৬.৯ শতাংশ	৬.৬ শতাংশ
মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপ	.৩ শতাংশ	৯.৯ শতাংশ	৮.৭ শতাংশ
পশ্চিম গোলার্ধ	২.৯ শতাংশ	২.৮ শতাংশ	৩.৯ শতাংশ
পূর্ব ইউরোপ	-১৩.৭ শতাংশ	-৯.৭ শতাংশ	২.৪ শতাংশ
সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন	৯ শতাংশ	-১৮.২ শতাংশ	৬.৫ শতাংশ

এপি ও রয়টার অবলম্বনে:

www.pathagar.com

পল্লী অধিবাসীরা উন্নয়নশীল দেশে

উন্নয়নশীল দেশেসমূহের পল্লী এলাকার অধিবাসীরা মূলতঃ কৃষিজীবি। শিল্পায়ন এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ায় এ সকল দেশের যতটুকু প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়ে থাকে, তার সম্পূর্ণটাই প্রবাহিত হয়ে থাকে শহর এলাকার ধনীদের মাঝে। কেননা, গ্রামাঞ্চলে কৃষিভিত্তিক পণ্যের ক্ষেত্রে কৃষকদের দরকষাকষির তেমন কোন অবকাশ থাকে না বললেই চলে। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হন। এভাবে পিছাতে পিছাতে গত বিশ বছর আয়ের দিক দিয়ে তারা চল্লিশ শতাংশ পিছিয়ে পড়েছেন। এছাড়া দরিদ্র দেশসমূহে কর্মসংস্থানের সুযোগ (Employment Opportunity) যেটুকু বৃদ্ধি পায়, তা বৃদ্ধি পায় মূলতঃ শহর এলাকাতেই। এরই সাথে আবার একাত্ব হয়ে থাকে গ্রামীণ কৃষি ক্ষেত্রে ছদ্ম বেকারত্বের (Disguised Unemplyment) উপস্থিতি। তাই বিনিয়োগের ক্ষেত্রেই দেখা যায়, শিল্পেই পুরোটা নিয়োজিত হচ্ছে বা কৃষিতে হচ্ছে অত্যন্ত নগন্য পরিমাণে। আর দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের (Vicious Circle of Poverty) কারণে গ্রামীণ এলাকাবাসীগণ কৃষি ক্ষেত্রে বাড়তি বিনিয়োগে উদ্যোগী হয় না, বা সক্ষমও হয় না এবং বড় ধরনের কোন বিনিয়োগ সমবায়ের ব্যাপকতার অভাবে সম্ভব হয়ে উঠছে না, একেও গ্রামীণ এলাকার পিছিয়ে থাকার অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করলেও অত্যুক্তি হবে না।

বাংলাদেশের দারিদ্র্যাবস্থা

আমাদের দেশের দারিদ্র্যের কতিপয় বিশেষ দিক হিসাবে এ সকল বিষয়সমূহকে চিহ্নিত করা যায়:

(১) শতকরা তিরিশ ভাগ মানুষ মারাত্মকভাবে দরিদ্র। যার মধ্যে রয়েছে গরীব শ্রেণীর মহিলা ও শিশু। জীবন ধারনের ন্যূনতম সুযোগ এদের নেই।

(২) বাংলাদেশের মানুষ গড়ে ৫০ বছর বাঁচে, অন্যদিকে চীনের একজন মানুষ বাঁচে গড়ে ৭০ বছর।

(৩) সুইডেনে একজন মহিলা গড়ে ৮১ বছর বাঁচে বরং বাংলাদেশের একজন মহিলা বাঁচে ৪৯ বছর।

(৪) আমাদের দেশে মেয়েরা পুরুষের চেয়ে গড়ে দু'বছর কম বাঁচে। আর বাড়ছে দিন দিন তাদের বঞ্চনা।

(৫) জন্মের সময় শিশু মৃত্যুর হার পুরুষ শিশুদের বেলায় মেয়েদের চেয়ে খানিকটা বেশি (পুরুষ ১১৫, মেয়ে ১১২ প্রতি হাজারে)। কিন্তু চার বছর হতে হতেই পুরো চিত্র বদলে যায়। ইতিমধ্যে মেয়েরা সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে থাকে এবং মেয়ে শিশুর মৃত্যুর হার বাড়তে থাকে।

(৬) চার বছর বয়সের ৭৫ শতাংশ শিশুই শারীরিকভাবে পর্যাপ্ত হয়ে বেড়ে ওঠে না।

(৭) যে কোন বছরে জন্মলাভকারী শিশুদের মাত্র এক-পঞ্চমাংশ পরবর্তী পর্যায়ে সুস্থ, পুষ্ট ও স্বাভাবিক মানুষ হিসাবে বেড়ে ওঠার সুযোগ পায়।

www.pathagar.com

(৮) মেয়েরা যে পরিমাণ ক্যালোরি গ্রহণ করে, তা গড়ে পুরুষের চেয়ে ২৯ শতাংশ কম। পাঁচ বছরের নিচে মেয়ে শিশুরা সমবয়েসী পুরুষ শিশুর চেয়ে ২৯ শতাংশ কম ক্যালোরি খাবার গ্রহণ করে।

(৯) বন্যা, খরা, নদী ভাংগন, ঘূর্ণিঝড় এসকল প্রাকৃতিক দুর্যোগে মারাত্মকভাবে গরীবদের মা ও শিশুদের অবস্থার নাটকীয় অবনতি ঘটে।

কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা অনার্জিত

গ্রামীণ এলাকায় উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে আমরা বলতে গেলে কখনও লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে পারিনি। বাংলাদেশের ১৯৯১-৯২ সালের অর্থনৈতিক জরিপে দেখা যায়, উৎপাদন ও কর্মসংস্থাপন প্রকল্পে সংশোধিত ব্যয় বরাদ্ধের পরিমাণ ছিল ১,০৫৪ কোটি ৩৫ হাজার টাকা। যার মধ্যে '৯১ -এর জুন পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩৪৫ কোটি টাকা। আবার অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে, সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে প্রতি বছরই ব্যয় বরাদ্ধ বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ১৯৮৯-৯০ সালে এই খাতে বরাদ্ধ ছিল ৩৮৪ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা। কিন্তু ব্যয় করা সম্ভব হয়েছিল ২৯৫ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা। ১৯৯০ -৯১ সালের এই খাতে ব্যয় বরাদ্ধ ধরা হয়েছিলো ৪২৪ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। কিন্তু ব্যয় হয়েছে ৩৩৮ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা। ১৯৯১-৯২ সালের ব্যয় বরাদ্ধ হচ্ছে মাত্র ৪৯৩ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা। কিন্তু ৯ মাসে ব্যয় হয়েছে ২১৯ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা।

এই ব্যয় বরাদ্ধ কখনো লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হয় না, যার ফলে এর সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে প্রত্যাশিত অগ্রগতি আনয়নের ক্ষেত্রে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হবার অবকাশ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। এরপ্রভাব তাই প্রতিফলিত হয়ে থাকে গ্রামীণ আর্থিক অবয়বে এবং সেখানকার দারিদ্র্যতা দূর করার প্রক্রিয়াও তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সফলতা লাভ করতে সক্ষম হচ্ছে না, আর পরিবর্তিত হচ্ছে না আমাদের গ্রামীণ দারিদ্র্য ও চিরাচরিত লাংগল-জোয়াল সর্বস্ব কংকালসার কৃষকের চেহারা এবং ভাগ্যের। বরং ক্রমান্বয়ে আরও পেছনের দিকে ধাবমান হচ্ছে। ঋণ বিতরণ কর্মসূচী সফল ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হলে এবং এর ব্যবহার যথাযথভাবে হলে কৃষি খাতের ব্যর্থতা বা দুরবস্থা কাটানো অনেক ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করতে সক্ষম হবে বলে অনুভূত হচ্ছে।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দারিদ্র্য দূরীকরণ

জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও ক্রমবর্ধমান আত্মনির্ভরতাকে চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্যে পাঁচটি কৌশল প্রয়োগ করার সুপারিশ করা হয়েছে:

(১) সরকারী খাতে বিনিয়োগ,

www.pathagar.com

(২) বেসরকারী খাতে বিনিয়োগ কর্মসূচী,

(৩) এনজিও দের মাধ্যমে,

(৪) জাতীয় প্রকল্পের মধ্যে স্থানীয় (কমিউনিটি) জনগণের অংশগ্রহণ,

(৫) বিকেন্দ্রীকৃত থানা পর্যায়ে পরিকল্পনা তৈরি করা।

সরকারী কর্মসূচীসমূহকে তিন ভাগে বিভাজন করা হয়েছে:

(ক) প্রত্যক্ষ কর্মসূচী:

এই প্রকল্প সমূহ সরাসরিভাবে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট। যার মধ্যে পল্লী উন্নয়ন, সমাজ কল্যাণ ও মহিলা কর্মসূচী, গ্রামীণ অবকাঠোমো উন্নয়ন প্রকল্প এবং বিভিন্ন লক্ষ্য দলভিত্তিক কর্মসূচী।

(খ) পরোক্ষ কর্মসূচী:

এই প্রকল্প সমূহের ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য থাকে এবং সেই সব উদ্দেশ্যে পরোক্ষভাবে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে তাদের ভাগ্যোন্নয়নে প্রভাবিত করে। কৃষি, সেচ, মৎস, পশুসম্পদ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা, শিল্প, কৃষি ঋণ, কর্মসংস্থান প্রকল্প এর আওতাভুক্ত।

(গ) দূরবর্তী কর্মসূচী:

এ সকল কর্মসূচীর সুফল দুরবর্তীভাবে কাজ করে থাকে।

বর্তমান অবস্থান

আজকের বাংলাদেশে দেখা দিয়েছে বড় ধরনের অস্থিতিশীলতা, অসহায়ত্ব ও নিরাপত্তাহীনতা। মানুষ প্রতিদিন বেশি বেশি করে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে, হতাশা শতধা ফনা বিস্তৃত করে এগুচ্ছে-কর্মহীনতা, কর্মবিমুখতা জায়গা করে ক্ষয়ে দিচ্ছে মানুষের সৃষ্টিশীলতাকে।

ইউরোপের সমাজ এক সময় অন্ধকারে আবৃত ছিল। বর্তমানে তাদের দেশগুলোর অধিবাসীদের ব্যক্তিগত আয় অনেক এবং সে দেশগুলোর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার অনেক বেশি। এ হার বৃদ্ধি করা গেলেও বেকারত্ব তথা দারিদ্র্য দূরীকরণে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হবে। দারিদ্র্য দূরীকরণ সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্সের প্রতিবেদন অনুসারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যদি ৫.৫ শতাংশ হারে অর্জন করা সম্ভব হয়, তাহলেও দু'হাজার সালনাগাদ বেকার জনগোষ্ঠীর সংখ্যা থাকবে প্রায় ৬১ লাখ।

অর্থনীতিবিদ ডঃ মাহবুব হোসেন একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, বর্তমানে শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে প্রতি বছরে প্রায় তিন শতাংশ হারে। অর্থনীতির বর্তমান কাঠামোয় এই বাড়তি শ্রমশক্তির কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হবে

www.pathagar.com

কমপক্ষে-পুঞ্জিভূত যে বেকারত্ব বিদ্যমান, তা আগামী ৩০ বছরে দূর করার লক্ষ্যমাত্রা, স্থির করলে জাতীয় আয় কমপক্ষে আরো ১.৫ শতাংশ হারে বাড়াতে হবে। সুতরাং আয়ের প্রবৃদ্ধি কমপক্ষে ৬.৫ শতাংশ হারে না বাড়াতে পারলে স্বাভাবিক বাজার ব্যবস্থায়, সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য সময়কালের মধ্যে বেকারত্ব দূরীকরণ কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়। পল্লীর বিত্তহীনদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ব্যতীত পল্লী দারিদ্র্যের অবনতিশীল অবস্থার মোড় ঘোড়ানো যাবে না। তাই আমাদের মতো দারিদ্র্য পীড়িত দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার মৌল দৃষ্টি ভঙ্গি ও কৌশল বদলাতে হবে। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে অবশ্যই পল্লীমুখী এবং সুবিন্যস্ত করতে হবে, যাতে করে পল্লীর দারিদ্র্য কবলিত জনগণকে উৎপাদনমুখী কাজে নিয়োজিত করে তাদের জীবন মানকে ধীরে ধীরে উন্নত করে তোলা যায়। ❑

* *খবর-এ জুন ১৫, ১৯৯৫-এ প্রকাশিত।*

www.pathagar.com

দারিদ্র্য বিমোচনের প্রত্যাশা

বাংলাদেশ যে গরিব দেশ তা কারো অজানা নয়। দেশের দারিদ্র্য এখন গভীর থেকে গভীরতর এবং কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছে। সব সরকার দারিদ্র্য বিমোচনের কথা বলেছে। কিন্তু কোনো সরকারের পক্ষেই তা দূর করা সম্ভব হয়নি। বর্তমান সরকার প্রায় দু'বছর ইতোমধ্যে অতিক্রম করেছে। এ সময়ে দারিদ্র্য বিমোচনে কতটা কার্যকর ভূমিকা নেয়া হয়েছে তা ভবিষ্যতেই বলা যাবে।

প্রতিটি সরকারই দারিদ্র্য বিমোচনের জন্যে বার্ষিক বাজেটের রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে টাকার অংক বাড়িয়েছে। টাকার অংক প্রতিটি বাজেটে যে হারে বাড়ে তা শুনতে তো ভালই লাগে এবং প্রতিবছর এই সামাজিক খাতে অর্থ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে আমরা আশান্বিত হই। কিন্তু দেশের দারিদ্র্য ঘুচেছে কতটা? এই বিপুল অর্থ যাচ্ছে কোথায়? না লোকসংখ্যার তুলনায় এখানে অর্থ বরাদ্দ কম? এ ক্ষেত্রে সরকার বা সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা শিক্ষিতজনের বক্তব্য যাই হোক না কেন, মহানগর থেকে গ্রামের দিকে দৃষ্টি দিলে এ দেশের মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন হয়েছে একথা বলা যাবে না- এমনকি কিঞ্চিত হ্রাস পেয়েছে এটা বলাও যৌক্তিক হবে না। সরকারি তথ্যানুসারেই জানা যায়, গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে জনসংখ্যার ৪৭ দশমিক ৬ শতাংশ এবং ২৮ দশমিক ৩ শতাংশ বসবাস করে চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ দেশে সাধারণ মাথাপিছু দৈনিক ক্যালরি গ্রহণের মাপকাঠিতে দারিদ্র্যসীমা ধরা হয়। এতে যারা দৈনিক দু'হাজার ১শ' ২২ কিলো ক্যালরির কম খাদ্য গ্রহণ করে তাদের দারিদ্র্যসীমার মধ্যে ধরা হয়ে থাকে এবং দৈনিক যারা ১ হাজার ৮শ' ৫ কিলো ক্যালরির কম খাদ্য গ্রহণ করে থাকে তাদেরকে চরম দারিদ্র্যসীমার মধ্যে পতিত হয়েছে বলে মনে করা হয়।

এ দেশে দারিদ্র্য দূরীকরণে বহুবিধ সমস্যা রয়েছে। প্রথমত লক্ষ্য করা যায় যে, কোনো সরকারই বিদ্যমান পর্বতপ্রমাণ দুর্নীতির সামান্যতম অংশও কমাতে পারেনি। দুর্নীতি, ঘুষ ও নীতিহীন কার্যকলাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে সরকারের শুভ উদ্দেশ্যও অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে এবং হচ্ছে। সমাজের সর্বস্তরে দুর্নীতি- রাজনৈতিক নেতা থেকে আমলা, আমলা থেকে কর্মকর্তা, কর্মকর্তা থেকে কর্মচারী অর্থাৎ সমাজদেহের বড় একটা অংশ দুর্নীতিতে ডুবে আছে।

এমতাবস্থায় অপরিহার্য ও প্রয়োজনীয় কর্তব্য হচ্ছে, দুর্নীতির মূলোৎপাটনে বাস্তবসম্মত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ। এ দেশর দারিদ্র্য বেড়েই চলেছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে; সরকার রুটিনমাফিক প্রতিবছর অর্থ বরাদ্দ করছে। কিন্তু বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অবস্থার কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। দিন দিন মানুষের দুঃখ-কষ্ট বাড়ছে, দারিদ্র্যের নির্মম কষাঘাতে জর্জরিত হচ্ছে মানুষ, তারা ধুঁকে ধুঁকে মরছে। তারা আসলে কাজ চায়, খেটে খেতে চায়, ঋণ নিয়ে বা

www.pathagar.com

ভিক্ষা করে খেতে চায় না। এর সাথে জড়িত বেকার সমস্যা- গ্রামের ক্ষেতমজুর ও ভূমিহীন চাষী দারিদ্র্যের নির্মম চাপে মাটির সাথে মিশে যাচ্ছে। দু'বেলা তো দুরের কথা, অনেকের একবেলাও অন্ন জোটে না।

আমাদের রাজনীতিও শহরনির্ভর। ৬৮ হাজার গ্রামের দুঃখী মানুষের কথা রাজনীতিতে ঠাঁই পাচ্ছে না। এছাড়া দারিদ্র্য দূরীকরণ পদক্ষেপের প্রধান কাজ হচ্ছে, যে মানুষগুলো দারিদ্র্যের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত তাদের টেনে তোলবার ব্যবস্থা করা। এ দেশে আর কিছু থাক বা না থাক, মানবসম্পদ আছে একথা শুধু মুখে বললে হবে না। এই মানবসম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা প্রয়োজন। দেশের মানুষ যদি সম্পদই হয়ে থাকে তাহলে তার ব্যবহার করা তো প্রত্যেক সরকারেরই অবশ্য করণীয়। কিন্তু পরিহাসের বিষয় হচ্ছে এই মানবসম্পদের ব্যবহারে প্রয়োজনীয় কর্মচাঞ্চল্য ও সঠিক কর্মসূচি নেই। নিয়মমাফিক প্রতি অর্থবছরে দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে তথা মানবসম্পদ উন্নয়নে অর্থ বরাদ্দ করাই যথেষ্ট নয়, এই অর্থের সুব্যবহার হচ্ছে কিনা কিংবা যাদের জন্যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তাদের কাজে লাগছে কিনা, তা লক্ষ্য করাও সংশ্লিষ্ট সবার অবশ্য কর্তব্য। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এ বিষয়টির তদারকির কোনো নজির পাওয়া যায় না।

দারিদ্র্য বিমোচন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করাসহ সার্বিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন আবশ্যক। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর যাতে দারিদ্র্য লাঘব এবং টেকসই (Sustainable) উন্নয়ন হয় সে জন্য তাদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সাথে সাথে মাথিপিছু আয় এবং সঞ্চয় বৃদ্ধি পেতে হবে। যার ফলে তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সৃষ্টি এবং বিভিন্ন সামাজিক খাত (শিক্ষা, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ইত্যাদি) উন্নয়নের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নীত হয়।

কৃষিখাতে অসম ভূমি ব্যবস্থাপনা লাঘব সাপেক্ষে পল্লী অঞ্চলে বিভিন্ন অকৃষি খাতসহ শহর অঞ্চলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির প্রয়োজন এবং এর জন্য শিল্প, ব্যবসা ও অন্যান্য সেবা খাতসহ অর্থনৈতিক কাঠামো উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এর সাথে বিশেষ করে খাদ্য বহির্ভূত দ্রব্যাদির মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রকৃত আয় বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

বর্তমানে দরিদ্রের কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি এবং তাদের উন্নয়নের জন্য সরকারী পর্যায়ে ও এনজিওদের কর্মসূচী রয়েছে। সরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা যথা- কৃষি মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা ইত্যাদির কর্মসূচী রয়েছে।

এছাড়া কাজের বিনিময়ে খাদ্য, ভিজিডি কর্মসূচী, গ্রামীণ সড়ক/অবকাঠামো নির্মাণ/রক্ষণাবেক্ষণ কর্ম সৃষ্টি করছে। অপরদিকে, শিক্ষা সম্প্রসারণ কর্মসূচী যথা- শিক্ষার জন্য খাদ্য, ছাত্রীদের জন্য বিশেষ বৃত্তি ও আর্থিক সাহায্য, অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা, সরাসরি শিক্ষার ব্যয়ভার লাঘব করছে। সমাজ কল্যাণ, নারী ক্ষমতায়ন, শিশু অধিকার বিষয়ে এক

www.pathagar.com

সামাজিক সচেতনতা পরিলক্ষিত হচ্ছে যা তাদেরকে উন্নত জীবনে উৎসাহিত করছে।

সত্যিকার অর্থে দারিদ্র্য বিমোচন একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। দারিদ্র্য বিমোচন এবং তা সম্পূর্ণভাবে দূরীকরণের জন্য অর্থনীতিতে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দ্রুত শ্রম চাহিদা সৃষ্টি করে এমন খাতসমূহে বিনিয়োগ প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে আগামী পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৯৯৭/৯৮-২০০১/২ সাল পর্যন্ত বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে যা বিগত ৫ বছরে (১৯৯১-৯৬) ছিল ৪-৫ শতাংশ (গড়ে ৪.৫ শতাংশ) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়া (Growth process)-এর সাথে 'দারিদ্র্য সীমা'-এর নীচে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর (চরম দরিদ্রসহ) আয় বৃদ্ধি এবং সার্বিক আয় বন্টন বৈষম্য হ্রাসসহ দরিদ্রদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন দরকার। শুধুমাত্র ক্যালরীভিত্তিক এবং ন্যূনতম জীবন চাহিদা ভিত্তিক দারিদ্র্য নিরূপণের বাইরেও উন্নত জীবন যাত্রার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা দরকার।

বর্তমান সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন একটি অর্থনৈতিক প্রতিশ্রুতি। এ লক্ষ্যে উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনসহ সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে দরিদ্রদের অংশগ্রহণের বিভিন্ন কর্মপন্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। কৃষি খাতে ভর্তুকি প্রদান করা হচ্ছে। ন্যায্য মূল্যে কৃষকদের সার, সেচ যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও ঋণ নিশ্চিত করা হচ্ছে। নারী উন্নয়ন, তাদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং বেকার যুবকদের জন্য প্রশিক্ষণ ও ঋণ কর্মসূচী সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।

বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে, আর্থিক ও রাজস্ব খাতসমূহে সংস্কার, উন্নয়ন এবং বিনিয়োগের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। বিভিন্ন খাতে বৈদেশিক বিনিয়োগেরও সুযোগ ও উৎসাহ সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক পর্যায়েও বর্তমান সরকার বিশ্ব দারিদ্র্য বিমোচনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে। বিশ্ব দারিদ্র্য বিমোচন সম্পর্কিত '৯৭ সনের ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ক্ষুদ্র ঋণ সম্মেলনে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অংশগ্রহণ করে এবিষয়ে অঙ্গিকার ব্যক্ত করেন। দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমও বিশেষ করে গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রম বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি পেয়েছে।

দেশের উন্নয়ন নীতি ও লক্ষ্যসমূহের মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচন একটি প্রধান লক্ষ্য। আর তাই গত ৪ঠা মার্চ'৯৮-এ বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে এনইসি'র সভায় অনুমোদিত পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯৭/৯৮-২০০১/০২) এ লক্ষ্যকে অগ্রাধিকার প্রদানসহ সংশ্লিষ্ট খাতসমূহে উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় এসকল বিষয়সমূহ প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:-

১. দেশে দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাসহ দারিদ্র্যসীমার নিচে বিদ্ধমান অন্ততঃ ৫০ শতাংশকে দারিদ্র্যসীমার উপরে তুলে আনা এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাসকরণ,

২. মানব সম্পদ উন্নয়নসহ সার্বিক আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন, ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে জনগণের অংশ প্রদান নিশ্চিত করার জন্যে বিভিন্ন স্তরের স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালীকরণ,

www.pathagar.com

৩. উন্নয়নে ব্যক্তি উদযোগ ও ব্যক্তির অংশগ্রহণকে প্রাধান্য প্রদান,

৪. দেশকে ক্রমান্বয়ে স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে উৎপাদন ও রফতানির ভিত্তি বহুমুখীকরণ,

৫. এ লক্ষ্যে দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বর্ধিত করণের ব্যবস্থাকরণ,

৬. বৈদেশিক বাণিজ্যে ক্রমান্বয়ে ভারসাম্য আনয়নের লক্ষ্যে রফতানি বাণিজ্য অধিকতর সম্প্রসারণ ও বহুমুখীকরণ,

৭. অনভিপ্রেত আমদানি বর্জন করে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়করণ,

৮. উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ,

৯. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারী-পুরুষের ব্যবধান ক্রমাগত কমিয়ে আনার লক্ষ্যে নারীদের শিক্ষা, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও আয়বর্ধক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা সম্প্রসারণ,

১০. সামাজিক ন্যায় বিচারের স্বার্থে সম্পদের সুষম বন্টনসহ বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে অতি দরিদ্র ও দুঃস্থদের জন্যে অর্থনৈতিক/আর্থিক নিরাপত্তামূলক সুযোগ-সুবিধাদির ব্যবস্থাকরণ,

১১. বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের জন্যে বিশেষ করে অনগ্রসর অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে বিশেষ উদযোগ গ্রহণ।

সর্বাগ্রে দুর্নীতির মূলোৎপাটন করা ছাড়া দারিদ্র্য দূর করার কোনো উপায় নেই। দারিদ্র্য দূরীকরণে আশু গঠনমূলক উপায় খুঁজে বের করা ও জরুরিভিত্তিতে পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। সরকারকে আরো গভীরভাবে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মিছিল যদি ক্রমাগত দীর্ঘই হয় তবে তা দেশের জন্যে কখনোই মঙ্গলজনক হবে না। বর্তমান সরকার আস্থার সাথে দারিদ্র্য বিমোচনের কর্মসূচি সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন বলে প্রত্যাশা করা যাচ্ছে। ❑

www.pathagar.com

রাজনৈতিক ব্যয়জনিত ঋণের দায়

ভয়েস অব আমেরিকার সাথে মার্চ ১২, '৯৬-এ এক সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশস্থ বিশ্ব ব্যাংক মিশন প্রধান লিন্ডল পিয়নের মিলস বিরাজমান বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে উল্লেখ করেন, দাতা দেশগুলো বাংলাদেশের সাহায্য বন্ধ করতে চায় না। তথাপি এখানে সহায্য পাঠানোর কোন প্রয়োজন থাকবে না, যদি এখানে রাজনৈতিক সংকট ও অচলাবস্থার কারণে সাহায্য ব্যবহৃত না হয়। আর এ ধরনের অচলাবস্থার প্রেক্ষিতে অন্য দেশে চলে যেতে পারে এই সাহায্য। তিনি অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলেন, গার্মেন্টস শিল্পের প্রতিদিনই অর্ডার বাতিল হবার ফলে ইতোমধ্যে ৫০ ভাগ অর্ডার বাতিলের ঘোষণা হয়েছে।

আমাদের দেশের ম্যাক্রো অর্থনীতিতে ইতোমধ্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে এই দীর্ঘ আড়াই বছরকালীন বিরাজমান রাজনৈতিক সংকটের কারণে। কেননা যেখানে ২ ভাগ ছিলো ১৯৯১ সালে মুদ্রাস্ফীতির হার, সেখানে শতকরা ৬ ভাগ এ দাঁড়ায় ১৯৯৫ সালে মুদ্রাস্ফীতির গড় হার। আগের বছরের তুলনায় ১৯৯০-৯১ অর্থবছরে শতকরা ২২ ভাগ বৃদ্ধি পায় রাজস্ব আয়। আর রাজস্ব আয় পরবর্তী বছরগুলোতেও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। বরং '৯৪-৯৫ অর্থ বছরে রাজস্ব বৃদ্ধির এই হার নিম্নগামী হয়ে শতকরা ১৬ ভাগে নেমে আসে। একই সাথে আশংকাজনকভাবে হ্রাস পায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও। দেশে খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ গত বছর দাঁড়ায় ৫০ লাখ মেট্রিক টন। সরকারের ঋণের পরিমাণ বেড়েছে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকে। যদিও বাড়েনি কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধির হার। গত বছর শিল্প উৎপাদনের বার্ষিক হারও বিগত চার বছরের তুলনায় অপেক্ষাকৃত হ্রাস পেয়েছে।

সম্প্রতি জাতীয় প্রেসক্লাবের অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে অর্থনীতিবিদগণ উল্লেখ করেন, রাজনৈতিক সংকটের কারণে দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতায় ধস শুরু হয়েছে। বিদেশী বিনিয়োগের পরিমাণ '৯৪-৯৫ সালে ছিলো ৬ কোটি ১০ লাখ মার্কিন ডলার, কিন্তু চলতি '৯৫-৯৬ অর্থ বছরের প্রথম চার মাসে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের পরিমাণ ছিলো মাত্র ১০ লাখ মার্কিন ডলার। এ বিষয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই যে, দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক সংকটের কারণেই এ অবস্থা হয়েছে।

সরকারের একগুঁয়েমির কারণে উদ্ভূত রাজনৈতিক অস্থিরতা বাংলাদেশকে এমন এক স্থানে নিয়ে এসেছে যে, প্রতিবছর এপ্রিলে প্যারিস কনসোর্টিয়াম-এর সাহায্যদাতা দেশ ও সংস্থাগুলো বাংলাদেশের উন্নয়ন বাজেটে আর্থিক সহায়তা প্রদানের যে বৈঠক বসে সে ক্ষেত্রে এবারই প্রথম ব্যতিক্রম ঘটেছে এই বৈঠকের বিষয়ে। আর তাই এবারের বৈঠক এপ্রিলের পরিবর্তে জুলাইয়ে অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় নির্ধারিত হয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ চাইছে, সাহায্যদাতা দেশ ও সংস্থার বৈঠক ঢাকায় অনুষ্ঠিত হোক। নির্ধারিত

www.pathagar.com

সময়ে যদি প্যারিস ক্লাবের বৈঠক অনুষ্ঠিত না হয় বা '৯৬-৯৭ সালের অর্থ বছরের বাজেট প্রণয়নের পূর্বে যদি সহায্যদাদা গোষ্ঠীর কাছ থেকে সাহায্যের পরিমাণ সম্পর্কে আশ্বাস পাওয়া না যায়, তাহলে এবারকার উন্নয়ন বাজেট প্রণীত হবার ক্ষেত্রে নতুন করে ভাববার অবকাশ দেখা দিতে পারে।

বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে উন্নয়ন কর্মসূচীকে এগিয়ে নেয়া অনেকটা দুরূহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। চট্টগ্রাম সামুদ্রিক বন্দর অচল হয়ে পড়ার কারণে, বন্দরে কয়েক হাজার কন্টেইনার জমা হয়ে পড়াতে, বিদেশে পোশাক রফতানীর কর্মকান্ড ব্যাহত হওয়ার কারণে ইউরোপ ও আমেরিকার বাজার হাতছাড়া হওয়ার উপক্রম হয়েছে, কমে গেছে গার্মেন্টিস শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা। লে-অফ করা হয়েছে ইতোমধ্যে বহু গার্মেন্সস শিল্প, আর শ্রমিকদের বেতন কমিয়ে অর্ধেক করে দেয়া হয়েছে। দেশের গোটা অর্থনীতির মেরুদন্ড ভেঙ্গে পড়েছে, বন্দর ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বিপর্যস্ত হয়ে পড়ায়। কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের সমাধান বিলম্বিত হতে থাকলে দেশের গোটা অর্থনীতিই মুখ থুবড়ে পড়বে, তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ আছে বলে মনে হয় না।

লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ব্যাবহত

বর্তমান বিরাজমান সঙ্কটের কারণে জাতীয় অর্থনীতির ওপর যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ছে তাতে বর্তমান অর্থবছরে ('৯৫-৯৬) জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে সম্ভাবনা ক্রমেই মিলিয়ে যাচ্ছে অনিশ্চয়তার আবর্তে। জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশের ওপরে হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছিলো এ বছর জাতীয় বাজেটে। বরং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান খাত- কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগসহ প্রতিটি উপখাতই প্রত্যাশিত সাফল্য অর্জনে বেশ পিছিয়ে রয়েছে, বছরের শুরু থেকেই বিরাজমান রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে। জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার ৪ শতাংশের নিচে নেমে আসার সম্ভাবনা রয়েছে এ অবস্থার প্রভাবে, যার আভাস পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন অভিজ্ঞমহল থেকে।

যদিও অর্থমন্ত্রী এম, সাইফুর রহমান '৯৫-৯৬ অর্থবছরের বাজেট ঘোষণাকালে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করে উল্লেখ করেছিলেন, ৪ শতাংশে সীমিত থাকবে '৯৫-৯৬ অর্থবছরে সার্বিক মুদ্রাস্ফীতির হার, আর ৬ শতাংশ অতিক্রম করবে প্রবৃদ্ধির হার। জিডিপি'র ১৬ দশমিক ৫ শতাংশ অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগের প্রাক্কলন করা হয় বাজেটে। আর ১২ হাজার ১০০ কোটি টাকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ও বাজেটে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। যদিও এই অর্থ বছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারী আট মাস সময়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে অর্থমন্ত্রীর এই প্রত্যাশার কোন ছাপই রাখতে সক্ষম হয়নি। বরং এ সময়ে ঘাটতি বেড়েছে বহির্বাণিজ্যে, মুদ্রাস্ফীতিও বেড়েছে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পেয়েছে হ্রাস, খাদ্য ঘাটতি বেড়েছে, রাজস্ব আয় হ্রাস পেয়েছে, প্রবাসী বাংলাদেশীদের রেমিটেন্সের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে এবং বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণও হ্রাস পেয়েছে।

www.pathagar.com

এ ছাড়া বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর বাস্তবায়ন, অগ্রগতিও পিছিয়ে রয়েছে। বাজেটের চলতি ব্যয় বাড়ছে, আর সরকারি খাতে ঋণ গ্রহণের পরিমাণ অতিমাত্রায় বেড়েছে।

ম্যাক্রো খাতে টানাপোড়ন

ইতোপূর্বে যে সাফল্য অর্জিত হয়েছিলো ম্যাক্রো অর্থনৈতিক খাতে, তাও যেন ধাবিত হচ্ছে দ্রুত অবনতির দিকে। অর্থনীতির প্রতিটি খাতেই মরণ কামড় দিচ্ছে চলমান রাজনৈতিক সঙ্কটের ধারাবাহিকতা। তাই এখানে উল্টো হাওয়া বইছে দেশের গোটা অর্থনীতিতে। গত বছরের তুলনায় এ অবস্থায় অর্থবছরের শেষে ১২ হাজার কোটি টাকা জিডিপি মূল্য হ্রাস পেতে পারে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন। দুটি কোটি আট লাখ টন খাদ্যশস্য উৎপাদনের মাধ্যমে চলতি অর্থবছরে কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছিলো ৪ শতাংশ। বরং সরকারীভাবেই ৩৫ লাখ টন খাদ্য ঘাটতি হিসাব করা হয়েছিলো সার সঙ্কট, বন্যা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সেচ সমস্যাজনিত কারণে। যদিও আন্তর্জাতিক খাদ্য সংস্থা (ফাও)-এর তথ্যানুসারে ৪৫ লাখ টন ছাড়িয়ে যাবে খাদ্য ঘাটতির এবারের পরিমান। কৃষিতে প্রাক্কলিত প্রবৃদ্দি অর্জনের কোন সম্ভাবনা এ অবস্থায় আছে বলে মনে হচ্ছে না।

অন্যদিকে আরও করুণ অবস্থা বিরাজ করছে শিল্প খাতে। বরং ১১ দশমিক ৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি এবার ধরা হয়েছিলো এ খাতে। কিন্তু বছরের শুরু থেকেই বন্ধ্যাত্ব চলে আসছে শিল্প খাতে। হতাশাজনক সার্বিক বিনিয়োগ পরিস্থিতি বর্তমান বছরের এ খাতে শিল্প ঋণের ৫০ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রাও অর্জিত হয়নি পূর্ববর্তী ৯৪-৯৫ অর্থবছরের তুলনায়। সাড়ে ৩ হাজার কোটি টাকা শিল্প ঋণ বিতরণের লক্ষ্য মাত্রা এ বছরে ধরা হয়েছে। ৫ শতাধিক কোটি টাকা অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসে বিতরণ করা হয়েছে। শিল্প খাতে উৎপাদন এর ফলে রয়েছে পিছিয়ে।

আবার দেশের বাহির্বাণিজ্যের ঘাটতি আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থবছরের প্রথমার্ধে। রফতানি বাণিজ্যে এ সময়ে অর্জিত প্রবৃদ্ধির হার মাত্র ৭ দশমিক ১ শতাংশ, অন্যদিকে ব্যয় প্রবৃদ্ধির হার আমদানি বাণিজ্যে দাঁড়ায় প্রায় ৩৯ শতাংশ। বরং '৯৪-৯৫ অর্থবছরের রফতানি আয়ের হার ছিলো ৩৭ এবং আমদানি ব্যয়ের হার ছিলো ৩৯ শতাংশ। আর দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক অবস্থার কারণে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উন্নতির প্রক্রিয়া বেশ থমকে দাঁড়িয়েছে।

তাছাড়া অভ্যন্তরীন সম্পদ সংগ্রহের পরিমাণও বেশ পিছিয়ে রয়েছে। বর্তমান অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারী সময়ে রাজস্ব আয় শতাধিক কোটি টাকায় পিছিয়ে রয়েছে বলে জানা যায়। এক্ষেত্রে এ বছর রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১৫ হাজার৪৫০ কোটি টাকা। ব্যবসা বাণিজ্যের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হওয়াতে এলসি খোলা হচ্ছে না। এর ফলে বর্তমান অর্থবছর শেষে রাজস্ব আয় আশঙ্কাজনক হারে হ্রাস পাবে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন। অধিকন্তু সরকারের রাজস্ব ব্যায়ের পরিমান এ সময়ে লক্ষ্য মাত্রার চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। যার প্রভাবে ব্যাংকিং খাত থেকে ঋণ গ্রহণের পরিমাণ রাজস্ব

www.pathagar.com

ঘাটতি মেটানোর জন্য বেড়েছে, আর বিরাজমান এ অবস্থার আলোকে দেশের চলমান আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক সঙ্কটের মুখে অর্থবছরের বাকি সময়ে অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের লক্ষ্য মাত্রা অর্জন করা অত্যন্ত দুরূহ হবে বলে অনুমতি হচ্ছে।

আবার জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের প্রধান নির্ধারক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর (এডিপি) বাস্তবায়ন অগ্রগতিও পিছিয়ে রয়েছে। এডিপি'র বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৩৬০ শতাংশ ছিলো জানুয়ারী '৯৬ পর্যন্ত সাত মাস সময়ে। যদিও '৯৪-৯৫ অর্থবছরে একই সময়ে এর অগ্রগতি ছিলো ৪০ শতাংশেরও বেশি। আর ইতোমধ্যে এড়িপি কাঠছাঁটের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক উভয় খাত থেকে প্রত্যাশিত পরিমাণে সম্পদের যোগান না হওয়ার কারণে। এর আওতায় মোট এডিপি'র ১০ শতাংশ কাটছাঁট হতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অভিমত ব্যক্ত করেন।

এতোমধ্যে এসময়ে আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণও। সাড়ে ৩ শ' কোটি ডলার ছিলো অর্থ বছরের প্রথমদিকে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ। তা নেমে এসেছে বর্তমানে ২২০ কোটি ডলারে। এই বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আমাদের খাদ্য ঘাটতি পূরণের জন্যে বৈদেশিক ব্যয়ের পাশাপাশি ভোগ্যপণ্য ও বিলাস সামগ্রী আমদানিতেই চলে গেছে। তাছাড়া এখন আর বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ছে না, বৈদেশিক সাহায্য ও প্রবাসী বাংলাদেশীদের রেমিটেন্স প্রাপ্তিতে পিছিয়ে থাকাতে।

ক্রমেই দেশে বাড়ছে মুদ্রাস্ফীতির হার। কোনো পদক্ষেপই আর কাজে লাগছে না সামগ্রিকভাবে অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষেত্রে। মুদ্রাস্ফীতির হার বর্তমানে ৯ শতাংশের ওপরে গিয়ে উঠেছে, যা জুন '৯৫তে বাজেট ঘোষণাকালীন সময়ে ৪ শতাংশে ছিলো। যদিও সাধারণভাবেই অনেকে মনে করেন, মুদ্রাস্ফীতি এখন দ্বি-সংখ্যাভুক্ত হারে অবস্থান করছে।

১৯৯৬ সালের বাজেট ঘোষণাকালীন বক্তব্যে বলা হয়েছিলো, '৯৪-৯৫ সালে অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগের হার ছিলো জিপিপি'র ১৫ শতাংশ। জিডিপি'র ১৬ দশমিক ৫ শতাংশ এবার অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রাক্কলন করা হয়েছে। বরং অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগের হার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে গত বছরেরও নিচে নেমে আসার আশঙ্কা করা হচ্ছে। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের এই সামগ্রিক পশ্চাৎমুখিতার জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রত্যাশা কল্পনার আওতায়ই থেকে যাবে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন। *(নূর মোহাম্মদ: জনকণ্ঠ)*

জিডিপি অনির্ধারিত

মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধির হার আমাদের দেশে '৯৪-৯৫ অর্থবছরে কত, তা এখন পর্যন্ত সরকার নির্ধারণ করতে পারেনি। প্রবৃদ্ধির ৩টি হার প্রাথমিকভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে, আর তা হচ্ছে ৪ দশমিক ২ শতাংশ, ৪ দশমিক ৪ শতাংশ এবং ৫ দশমিক ৮ শতাংশ। যার মধ্যে প্রথমটি নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

www.pathagar.com

(বিবিএস); দ্বিতীয়টি নির্ধারণ করেছে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা এবং অর্থমন্ত্রীর অনুরোধে বিশেষ বৈঠক ডেকে তৃতীয়টি নির্ধারণ করেছে সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাসহ পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনার সংগে সংশ্লিষ্ট মহল। এর মধ্যে যে কোনো একটিকে চূড়ান্ত বিবেচনায় নেয়া হবে বলে অনুমিত হচ্ছে, যা প্রকাশের মাধ্যমে সরকারি গুণকীর্তনের স্পষ্টতা থাকবে বহুল পরিমাণে।

অন্যদিকে '৯৪-৯৫ অর্থবছরের প্রবৃদ্ধি নির্ধারণ করতে না পারার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকও তাদের বার্ষিক রিপোর্ট চূড়ান্ত করে প্রকাশ করতে পারছে না। আবার শেষ পর্যন্ত ৩টি প্রবৃদ্ধি হারের কোনটিকে চুড়ান্তভাবে নির্ধারণ করবে সে বিষয়ে সমস্যায় পড়েছে সরকার। বিবিএস-এর প্রথম হিসেবে ৪ দশমিক ২ শতাংশ হচ্ছে বর্তমান (বিএনপি), সরকারের আমলের সবচেয়ে কম। তাছাড়া দু'বছর ধরে অব্যাহত থাকা রাজনৈতিক সংকটের মধ্যে ৫ দশমিক ৮ শতাংশ জিডিপি নির্ধারণ গ্রহণযোগ্যতার সংকটে পড়তে পারে বলে সরকার আশংকা প্রকাশ করছে। হয়ত শেষ পর্যন্ত মধ্যস্থা হিসেবে ৪ দশমিক ৪ শতাংশকেই চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করা হতে পারে বলে অনুমিত হচ্ছে।

এডিপি'র পরিমাণ কাটছাট চলমান আর্থ-রাজনৈতিক সংকটের প্রেক্ষাপটে চলতি '৯৫-৯৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর (এডিপি) আয়তন কাটছাট হচ্ছে। নির্বাচনকে সামনে রেখে '৯৫-৯৬ এর বাজেটে ঘোষিত ১২ হাজার ১০০ কোটি টাকার উচ্চভিলাসী এডিপি বিএনপি সরকার আর ধরে রাখতে পারছে না। এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি অপ্রত্যাশিতভাবে পিছিয়ে রয়েছে। ইতোমধ্যেই এডিপি'র আয়তন দশ শতাংশ (১২ শতাধিক কোটি টাকায়) নামিয়ে আনার প্রস্তাব করা হয়েছে প্রার্থিত পরিমাণে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সম্পদের যোগান না হওয়ার কারণে। প্রস্তাব অনুসারে চলতি এডিপি'র আয়তন ১০ শতাংশে কাটছাট করায় পূর্ববর্তী '৯৪-৯৫ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি'র চেয়েও এর আয়তন ছোট হয়ে আসবে। চলতি '৯৫-৯৬ অর্থবছরের ১২ হাজার ১০০ কোটি টাকার এডিপি থেকে ১০ শতাংশ টাকা কাটছাট করলে সংশোধিত এডিপি'র আয়তন দাঁড়াবে ১০ হাজার ৮শ' ৯০ কোটি টাকা। যদিও পূর্ববর্তী অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি'র আয়তন ছিলো ১১ হাজর ১শ' ৫০ কোটি টাকা।

'৯৫-৯৬ অর্থবছরের জুলাই-জানুয়ারী সময়ে এডিপি'র বাস্তবায়ন অগ্রগতি খুবই হতাশাব্যঞ্জক। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায়ও পিছিয়ে রয়েছে বাস্তবায়ন অগ্রগতি। উল্লেখিত সময়ে এডিপি'র বাস্তবায়ন অগ্রগতি দাঁড়ায় ৩৬ শতাংশ। আগের বছরের এ সময়ে অগ্রগতির হার ছিলো ৪০ শতাংশের ওপরে। এই হিসাবে এডিপি'র প্রাক্কালনের মাত্র ৪,৩৫৬ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। আর এ সময়ে এডিপিভুক্ত অসংখ্য প্রকল্পের কাজে হাত তো দূরের কথা, বরং এখন পর্যন্ত অনুমোদনও পায়নি।

এছাড়া ১৫ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচন-উত্তর দেশের রাজনৈতিক সংকট যেভাবে দ্রুত অবনতিশীল হচ্ছে, তাতে অর্থবছরের বাকি সময়ে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় খাত থেকেই আশানুরূপ সম্পদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা খুবই কম। এ অবস্থায় এডিপি'র আয়তন ১০ শতাংশ কাটছাট করেও শেষ রক্ষা হবে কিনা তা নিয়েও সংশ্লিষ্ট মহল সংশয় প্রকাশ করেছে।

www.pathagar.com

সরকারি ঋণ বৃদ্ধি

অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ বেড়ে চলেছে এবং চলতি অর্থবছরে এ ঋণের পরিমাণ অতীতের রেকর্ড ভঙ্গ করেছে বলে সম্প্রতি একটি জাতীয় দৈনিকের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। এতে বলা হয়, সরকার দু'হাতে অর্থ ব্যয় করার ফলে তার ঋণের পরিমাণও বেড়েছে। বাজেট বহির্ভূত বিভিন্ন প্রকার ব্যয় মেটানোর জন্যে সরকারকে এভাবে ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করতে হচ্ছে। রাজনৈতিক কারণে সরকার এভাবে অর্থ ব্যয় করছে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন।

রাজনৈতিক কারণে অর্থ ব্যয় বাংলাদেশে নতুন নয়। 'মানি ইজ নো প্রোবলেম'-এক সময় ছিলো এদেশের রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে দেয়া শ্লোগান। তাই এদেশে যদি আবার অভ্যন্তরীণ উৎস শূন্য হয়, সরকার যদি রাজনীতির জন্যে দু'হাতে অর্থ ব্যয় করে, তাতে আশ্চর্য হবার কোনো অবকাশ আছে বলে মনে হচ্ছে না। বরং যে মূহুর্তে সরকার দেশে পুঁজি গঠনের জন্যে আহ্বান জানাচ্ছে, দেশের অর্থনীতিকে একটি টেকসই রূপ দেবার চেষ্টা করছে, তখন এ অবস্থার জন্যে প্রশ্ন আসাই স্বাভাবিক। দেশের অর্থনীতি, দেশের শিল্প বিনিয়োগ বড় হয়ে সামনে না এসে বরং রাজনীতিটাই যেন বড় হয়ে দেখা দিলো। আর বাস্তবে যখন রাজনীতি এভাবে বড় হয়, তখন খুব সহজেই বলা যায়, সরকার দেশের অর্থনীতি বিনির্মাণ বা টেকসই করার চেয়ে ক্ষমতায় থাকার বিষয়ে বেশি আগ্রহী।

সরকার স্বয়ং অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সর্বাধিক পরিমাণ অর্থ ঋণ গ্রহণ করেন, তাহলে অর্থনীতিতে এর সামগ্রিক প্রভাব কখনোই কল্যাণকর হতে পারে না। আর সরকার যদি কল্যাণমুলক খাতে ব্যয়ের জন্যে দেনাগ্রস্ত হন, তাহলেও এর প্রভাবে মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্ব বৃদ্ধির মতো সামাজিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। কিন্তু জনকল্যাণার্থে সরকারি ব্যয়ভারী শিল্প ও অবকাঠামোগত নির্মাণ ব্যয় মিটাতে গিয়ে সরকারকে নতুন করে এবং অভ্যন্তরীণভাবে ঋণী হবার কথা নয়। কেননা, বাজেটভুক্ত ব্যয় বরাদ্দের একটি প্রধান সংস্থান বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য, আর অপর সংস্থাটি হলো অভ্যন্তরীণ সম্পদ, তথা রাজস্ব আয় বা বিভিন্ন কর, খাজনা, লেভী ও মূল্য সংযোজনমূলক ভ্যাট, তাই বাজেটবহির্ভূত ব্যয়ের পিছনে গোটা জাতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বা এডিপিতে উল্লিখিত প্রকল্প বিন্যাসের প্রতিফলন সম্পর্কে আমরা সন্দেহের উর্ধ্বে যেতে পারছি না। কেননা, বাজেটবহির্ভূত ব্যয় রাজনৈতিক অর্থ সমাগম বা কোনো নির্বাচনী ব্যয় পোষাণোর তাগিদ থেকেই উদ্ভুত হয়।

দেশের জনগণ এমনিতেই বিবিধ কর ও করবহির্ভূত রাজস্ব চাপে দিশেহারা। একদিকে দর বৃদ্ধির প্রবণতা, অন্যদিকে মন্দাক্রান্ত অর্থনীতিতে গতি শৈথিল্য স্বল্প আয়ের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে সঙ্গীন করে তুলছে। এই অবস্থায় অর্থ সম্পদের বাণিজ্যিক উৎপাদনমুখিতাকে নিরুৎসাহিত করে সরকারি খাতে ও সরকারের নিজস্ব প্রয়োজনে অর্থ ঋণের পরিমাণ বাড়ালে সাধারণ মানুষের তাতে ভালোর চেয়ে খারাপ হবার সম্ভাবনাই বেশি। ইতোমধ্যে সরকারি ঋণের বিপুল অংক মন্দ ঋণের ভাগ্যবরণ করেছে। অথচ

www.pathagar.com

মূলধনের অভাবে মূলধনের উপর ধার্যকৃত উচ্চ সুদ ও অন্যান্য রাজস্ব চাপে উৎপাদনী ক্ষেত্রে মন্দা বেড়েছে। কারবারী মানুষকে বাধ্য হতে হচ্ছে কারবার সংগঠনের উদ্যোগ থেকে সরে দাঁড়াতে অথবা ঝুঁকি পরিহার করে অন্য কোনো সনাতন পেশা বা বৃত্তির ধান্ধা করতে। উৎপাদন, বন্টন, কিংবা কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টি-এর কোনো ব্যাখ্যা দ্বারাই বাজেট বহির্ভূত সরকারি ব্যয় প্রবণতার যৌক্তিকতা অনুমান করা যাচ্ছে না। তাই সরকারি ব্যয় নির্বাহে অভ্যন্তরীণ দেনাগ্রস্থতা একদিকে নীতিগতভাবে যেমন সমর্থনযোগ্য নয়, অন্যদিকে এই ঋণের অর্থ ব্যয়ের খাতগুলো আকর্ষণীয় বা অনিবার্য নয়।

সামগ্রিক বিবেচনায় বলা যায়, চলতি অর্থ বছরে (৯৫-৯৬) দেশের একটি ব্যাপক পরিমাণ অর্থব্যয় হয়েছে রাজনীতির লক্ষ্যে, সরকারি দলের স্বার্থে। এ ধরনের কাজ জনগণের অর্থকে ব্যক্তিস্বার্থে বা দলের স্বার্থে ব্যবহার করার শামিল। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে- একটি নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় থাকতে এমন হবার কারণ কি এবং কি কারণেই বা এ সকল পন্থা অবলম্বিত হলো? এর দায়ভার জনসাধারণের কাছে স্বীকার করা ছাড়া কোন গত্যন্তর আছে বলে মনে হচ্ছে না। ❑

** পূর্ণিমা-এ এপ্রিল ১৫, ১৯৯৬-এ প্রকাশিত।*

www.pathagar.com

অর্থনীতিতে বইছে উল্টো হাওয়া

আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থাটা কেমন, সেটা জানার উৎসাহ কেবল যে বাংলাদেশ সম্পর্কে আগ্রহী এবং বিনিয়োগে প্রত্যাশী বিদেশীদেরই রয়েছে তা নয় বরং দেশের সচেতন শিক্ষিত ও কৌতূহলী মানুষও এ বিষয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করেছেন। আর মানুষের অর্থনৈতিক চিন্তা ও আগ্রহ থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, দেশ ও জাতির সমস্যা নিয়ে মানুষ পারুক বা না পারুক, সমাধানের উপায় সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা অন্তত করছে। এটা আমাদের মতো অনগ্রসর দেশের জন্য ভবিষ্যতে শুভ ফল বয়ে আনার ইঙ্গিতবাহী। এর আলোকে আমাদের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার চুলচেরা হিসেব করার আবশ্যকতা রয়েছে।

জাতীয় অর্থনীতির স্বাস্থ্য যে ভাল নয়, তার আলামত ইতিমধ্যে সুস্পষ্ট রয়েছে। বেড়েছে ডলারের দাম, ব্যাংক ঋণের সুদের হার। আর আমদানির জন্য এলসি মার্জিন ২৫ শতাংশ করা হয়েছে। যাতে কোনো সামগ্রী আমদানির উদযোগ নেয়ার ক্ষেত্রে আগাম এক চতুর্থাংশ টাকা জমা দেয়ার প্রয়োজন হবে। এ সকল পদক্ষেপসমূহ মুদ্রাস্ফীতির পাগলা ঘোড়ায় লাগাম পরানোর জন্য নেয়া হয়েছে বলে সরকারের অভিজ্ঞ মহল উল্লেখ করে থাকেন।

আমাদের জীবন যাত্রার ব্যয় দ্রুত গতিতে বেড়ে যাচ্ছে। জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাবার কারণে। যে টাকার মাধ্যমে দিন অতিবাহিত করা সম্ভব হতো কিছুদিন আগেও, তাতে এখন যে আর কোনভাবেই পেরে ওঠা সম্ভব হচ্ছে না। টাকার মূল্য বা আমাদের প্রকৃত আয় (Real Income) যেন দারুণভাবে কমে যাচ্ছে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে। যদিও সরকারী পণ্ডিতরা বলছেন, বাজারে প্রচুর টাকা ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তাই সুদ বাড়ালে লোকজন টাকা পয়সা ব্যাংকে রাখবে, আর কম নেবে ঋণ। আর বাজারে জিনিসপত্রের দাম আয়ত্বে রাখার এটাই নাকি লাগসই পন্থা বলে মনিটারিস্ট বা মুদ্রাবাদীরা মনে করেন। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, মুদ্রাস্ফীতির হার শতকরা পাঁচ ভাগ। যদিও বেসরকারিভাবে অনুমান করা হয়, এর পরিমাণ শতকরা সাত ভাগ থেকে দ্বিসংখ্যা পর্যন্ত।

ম্যাক্রো টাকা নিয়ে যারা নড়াচাড়া করেন, তারাও বাজারে টাকার সরবরাহ বৃদ্ধি নিয়ে বাকবিতণ্ডা করেছেন। একদিকে সরকার বলছেন, ব্যবসায়ী-শিল্পপতিরা প্রচুর টাকা ব্যাংক থেকে ধার নিয়ে খরচ করছে। অন্যদিকে ব্যবসায়ীরা বলছেন, সরকারই ঋণ নিয়ে বেশি বেশি ঘি খাচ্ছেন। আর খরচের বহর বেড়েছে সরকারের আয় উপার্জন না বাড়লেও সরকারি খাতে ১০ শতাংশ বেতন বেড়েছে. যদিও বাড়েনি উৎপাদনশীলতা। এ সবের খেসারত কিন্তু কাউকে না কাউকে দিতেই হবে বলে আর্থিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন।

www.pathagar.com

এছাড়াও অন্যান্য ম্যাক্রো আলামতগুলোও বেশ করুণ বলে মনে হচ্ছে। কমেছে সরকারের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের পাঠানো টাকার পরিমাণ, যদিও এগুলো ছিলো সরকারের বড়ই গর্বের বিষয়। সরকার চাইছেন আমদানি কমিয়ে এই ঘাটতি সামাল দিতে। যার জন্যে বেড়েছে ডলারের দাম, এর সাথে এলসি মার্জিন বেড়ে যাওয়াতে ক্রমান্বয়ে ত্যক্ত-বিরক্ত হচ্ছেন আমাদানিকারক ব্যবসায়ীরা।

আধা-আধি সংস্কার খারাপ

সুযোগ পেলেই আমাদের অর্থমন্ত্রী দেশ-বিদেশে বলে বেড়ান, ম্যাক্রো অর্থনীতির স্থিতিশীলতা বর্তমান সরকারের বড় সাফল্য। মুদ্রাস্ফীতি নাকি এ অঞ্চলে সবচেয়ে কম। যদিও কোন এক সময় দাবী করা হয়েছিল এর হার শতকরা ১.১ ভাগ থেকে ১.৮ ভাগের মধ্যে। কখনো বলা হলো আবার মুদ্রাস্ফীতির হার নেতিবাচক, যার অর্থ দাঁড়ায় মুদ্রাস্ফীতি তো নেইই, বরং তার উল্টো কত বড়াই করা হয়েছে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের স্থিতি নিয়ে। দেশের ব্যাংকগুলো নাকি টাকায় সয়লাব হয়ে গেছে, কিন্তু টাকা নেয়ার কোন লোক নেই। সুদের হারও কয়েকবার কমানো হলো। ফল তেমন পাওয়া যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। ব্যবসায়ীরা কিন্তু আবার বলে আসছেন অন্য কথা। আমানতের ওপর সুদ কমালেও ঋণের ওপর যথেষ্ট পরিমাণ কমানো হয়নি। এ সবই কিন্তু অতীতের কথা। বর্তমানে সকল 'ইকনমিক ইণ্ডিকেটর' উল্টো পথে যাত্রা শুরু করেছে কেন, তার ব্যাখ্যা দিতে অর্থমন্ত্রীকে বেকায়দায় পড়ে বরং তার অনেক কথাকেই ফিরিয়ে নিতে হবে।

অর্থমন্ত্রী গত ক'বছরে যে অর্থনৈতিক সংস্কারে হাত দিয়েছিলেন, তা বরং তিনি আধা-আধি করেই বাহবা চাইতে শুরু করেছিলেন। অথচ অর্থমন্ত্রী নিজেই বলেছেন, সংস্কার না করার চেয়ে খারাপ কাজ একটিই আছে, তা হলো সংস্কার কর্মসূচী আধা-আধি করে ফেলে রাখা। যদিও দেখা যাচ্ছে, সে কাজটি তিনিই করে বসে আছেন। আর যার ফলশ্রুতিতে 'ম্যাক্রোতে' সাফল্য কিছুটা দেখাতে পারলেও মাইক্রোতে হয়েছেন ব্যর্থ। পারেননি দেশে বিনিয়োগ বাড়াতে, পারেননি সরকারের খরচ কমাতে। সরকারের সকল লোকসানি কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান যেন আগলে ধরে আছেন অত্যন্ত স্বাভাবিক ধারায়। রাজনীতির চাপে অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয়ের বহর বেড়েই চলেছে। সরকারি টাকার অপচয় বেড়েছে বড় বড় দূর্নীতির চাপে। বিপন্ন হতে চলেছে ম্যাক্রো স্থিতিশীলতা, মাইক্রো অর্থনীতিতে গতিশীলতা না আসার জন্যে। এই অশনি সংকেতে সরকারের বড় কর্তারা এখনও তেমন আমল দিচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে না।

অর্থনীতির স্বাস্থ্য

সাধারণতঃ অর্থনীতির হাল-হকিকত বোঝার একটা উপায় হচ্ছে, মানুষের আয় ও দ্রব্যমূল্যের সমতা ও স্থিতিশীলতা। আমাদের দ্রব্য সামগ্রীর দাম ইতোমধ্যে শতকরা ২০ভাগ বেড়েছে বলে বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায়। যার অর্থ দাঁড়ায় আমাদের টাকার ক্রয়ক্ষমতা কমে গেছে অথবা আমাদের প্রকৃত আয় (Real Income) কমে গেছে।

www.pathagar.com

যাকে আবার মুদ্রাস্ফীতি হিসেবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। উৎপাদন বাড়ছে না, উৎপাদনশীলতা কমছে, অথচ এখন বাজারে নাকি টাকার ছড়াছড়ি। অর্থনীতির স্থিতিশীলতার এই লক্ষণ বেশ খারাপের দিকে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন।

অর্থনীতির স্বাস্থ্যের আরেকটি লক্ষণ হলো, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ কমানোর, আমদানি বিল পরিশোধ করার মত বৈদেশিক মুদ্রা আমাদের জমা আছে এর অবস্থাও ভালো নয়, বরং দ্রুত কমে যাচ্ছে এর পরিমাণ। যদিও এই রিজার্ভ নিয়ে কত বড়াই না হলো। প্রকৃতপক্ষে আমাদের রফতানি বাণিজ্য ও প্রবাসীদের পাঠানো বৈদেশিক মুদ্রা, অনুদান ব্যয়কে আর সামলাতে পারছে না।

অন্যদিকে খাদ্য আমদানি করে দেশের চাহিদা পূরণের ক্ষমতা আমাদের অর্থনীতির নেই বললেই চলে। এ বছর কমপক্ষে আমাদের ৩০ লাখ টন খাদ্যশস্যের ঘাটতির কথা সরকারের কর্মকর্তারাই স্বীকার করেন এবং তা পূরণের জন্য সরকারি বেসরকারি খাতে খাদ্যশষ্য অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আমদানি করা হচ্ছে। আমাদের ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকার মহাবিক্রমে টাকা-পয়সা ধার করছেন। তাছাড়া যারা শত শত কোটি টাকা ঋণ নিয়ে শোধ না করে বরং ঘাপটি মেরে বসে আছেন, তারা এই পাওনা শোধ করা শুরু করলে এসবের একটু-আধটু সুবিধা হতো বলে প্রত্যাশা করা যেতে পারে, কিন্তু তারও উপায় আছে বলে মনে হচ্ছে না। অবশ্য সরকারি মালিকানায় কল-কারখানা এবং সংস্থাগুলোও যে বড় বড় ঘাতক ও খাদক। আর এদের সবাই মিলে অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচীর বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছে।

অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা গেল এ গুঞ্জন যেন শোনা যাচ্ছে চারিদিক থেকে। আর অর্থনীতির হাফ সংস্কার যে কোন সংস্কার না করার চেয়ে খারাপ, তা এতদিনে যে ক্রমান্বয়ে পরিষ্কার হয়ে আসছে। আমাদের অর্থনীতির নির্দেশক তথা নিয়ন্ত্রকরা এতদিন যে স্থিতিশীলতার কথা বলতেন, তা যে ছিলো কেবল থমকে দাঁড়ানো, তা সম্ভবত বুঝতে আর অসুবিধে হচ্ছে না। বরং এই স্থিতিশীলতার সদ্ব্যবহার করে বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধিত হয়নি। যার ফলশ্রুতিতে আসেনি অর্থনীতিতে গতিশীলতা, আর নড়ে উঠেছে স্থিতিশীলতার ভিত। বরং এখন শুধু মুদ্রাস্ফীতিই নয়, সমগ্র অর্থনীতিই যেন পাগলা ঘোড়া হয়ে পড়েছে। সুদের হার বাড়ানো, ক্রলিং পেগ দিয়ে বুড়ি ছুঁয়ে ছুঁয়ে টাকার বিনিময় হার বাড়ানো, আমদানিতে লাগাম পরানোর উদযোগ এর কোনটাই যেন আজ আর কাজে লাগছে না।

স্থিতিশীলতার ভিত নড়বড়ে

আমাদের ম্যাক্রো অর্থনীতির বারোটা নাকি বাজতে চলেছে। স্থিতিশীলতার ভিত নড়ে উঠেছে- এ কথাগুলো বলেছেন আমাদের অন্যতম বহুজাতিক ঋণ-অনুদান দাতা এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) কনসালট্যান্টরা। এরা আমাদের সরকারি খাতে অনেক টাকা সহজ শর্তে ঋণ দেয়, আর এই ঋণ অপাত্রে না সুপাত্রে দেয়া হচ্ছে, তা তারা পরখ করে দেখতে চায়।

www.pathagar.com

বেশ ক'বছর থেকে আমাদের সরকারি কর্মকতারা জোর গরায় বলে আসছেন, দেশ চমৎকার অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন করেছে। মুদ্রাস্ফীতির হার এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে সবার চেয়ে কম। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ফুলে ফেঁপে উঠছে, বাড়ছে রপ্তানি। বিদেশীরা বিনিয়োগের জন্যে ওত পেতে আছে, আমাদের 'স্থিতিশীলতা'র গুণগান করার জন্য শুধু এ মন্ত্রী, সে মন্ত্রী নন, এমনকি প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত দলবল নিয়ে বিদেশ সফরে গেলেন, আর সরকারি কর্মকর্তারা বলতে শুরু করলেন আমরা নাকি অর্থনীতির দিক থেকে 'এমার্জিং টাইগার'। সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগের (এফডিআই) আশায় বেশ কয়েকটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হলো। কর্মকতারাও ভাব দেখালেন, আমাদের অর্থনীতি এই লাফ দিলো বলে। কিন্তু বর্তমানে যে একটু বেসুরা আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, যা আমাদের ভাবিয়ে তোলার সহায়ক।

বিদেশী ঋণ, অনুদান অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য অতীতে যেমন প্রয়োজন ছিলো, আজও তেমনি অপরিহার্য হিসেবেই বিবেচিত। আবার অর্থনীতির ব্যাপক সংস্কারকে ঋণ বরাদ্দের শর্ত হিসেবে জুড়ে দিয়ে আসছেন বিদেশী ঋণ অনুদানকারীরা। আর প্রত্যেক সরকারই মেনে নিয়েছেন, সংস্কার আমাদের জন্য সুফলই বয়ে আনবে। যা বর্তমান সরকারের ক্ষেত্রেও অন্যথা হয়নি। এই সংস্কারের অনুদান প্রদানসহ কারিগরি সাহায্যদান ও নির্দেশনা জুগিয়েছে জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা আইএমএফ ও বিশ্ব ব্যাংক। যদিও প্রথম দিকে এগুলোকে বলা হতো কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচী, কিন্তু পরবর্তীতে আমাদের ঢিলেমির প্রতিকার হিসেবে তা রূপান্তরিত হলো সম্প্রসারিত কর্মসূচীতে (ইস্যাফ)। এক্ষেত্রে আমাদের বড় সমস্যা হলো সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়নে রাজি হই আমরা সুবোধ বালকের মতো, কিন্তু কাজের সময় একটুখানি করেই যেন আবার পিছিয়ে যাই। এ জন্যে ঋণ দাতাদের প্যারিস কনসোর্টিয়াম যেয়ে প্রতি বছর কতই না জবাবদিহি করতে হচ্ছে। প্রতিবারই যেন প্রতিশ্রুতি দেযা হয় ভ্যাট করার জন্য। এ কাজটি যেন পর্যায়ক্রমে চলেই আসছে।

অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনে ('৯১-এ) নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের প্রথম দু'বছরকে গ্রেস পিরিয়ড বলা যেতে পারে। তারা বলতেন, স্বৈরাচারী সরকারের দীর্ঘ দুঃশাসনে আমাদের অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়েছিলো, আমরা জঞ্জাল দূর করার চেষ্টা করছি। দূর্নীতি ও লুটপাট বন্ধ করে স্বস্থতা ও জবাবদিহিতার রাজত্ব কায়েম করা হবে। এ ধরনের ভাবসাব দেখে লুটপাটের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ পুরানো প্লেয়াররা সাময়িকভাবে যেন সংযত হলেন। আর অন্যদিকে সরকারেরও ভাগ্য সুপ্রসন্ন যে, চার বছর কোন বড় ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছিলো না। এর ফলে সংস্কার যেটুকু করা হলো, তার ফল কিছুটা যেন পাওয়া গেলো।

বরং যে সমস্যাটি বড় হয়েই রয়ে গেল তা হলো সংস্কার কর্মসূচীর আংশিক বাস্তবায়ন। আধা-আধি সংস্কারে অর্থনীতির বিকৃতি বাড়ে মাত্র। আমরা মুক্ত বাজার অর্থনীতি চালু করার লক্ষ্যে মেনে নিয়েছি বেসরকারি খাতের প্রাধান্য। সেই ধারায় শুল্কনীতি সংস্কার করে চলেছি, বরং অদক্ষ সরকারি খাত জিইয়ে রেখে রাষ্ট্রীয় লোকসান বাড়িয়ে যাচ্ছি।

www.pathagar.com

সরকারি কল-কারখানায় বিরাষ্ট্রীয়করণেও আমরা যেন ব্যর্থ হয়েছি। যাতে অব্যাহত রয়েছে রক্তক্ষরণ। আর চিকিৎসার ফলও পাওয়া যাচ্ছে না অন্য উপসর্গের। সরকারের আকার ছোট করা যায়নি, নিজস্ব ব্যয় যেন ক্রমান্বয়ে বেড়েই যাচ্ছে। খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ অতীতের সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে যাওয়ায় আমদানি এত বেড়েছে যে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দ্রুত কমে যাচ্ছে। মুদ্রাস্ফীতির হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আর নির্বাচনকে সফল করার জন্যে সরকার ব্যাংকিং খাত থেকে এত বেশি টাকা ধার করেছে যে, মুদ্রাস্ফীতিকে বশ করার জন্যে পদক্ষেপসমূহ কার্যকর হচ্ছে না। অথচ সরকারের শানশওকত বরং বেড়েই চলছে। আইন সংস্কার প্রায় শূন্যের কোঠায়। অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগের মন্বন্তর। আর বিদ্যুৎ খাত যেন শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হচ্ছে ক্রমাগতভাবে।

অর্থনীতির সংস্কার এখন শূন্যে ঝুলছে বলে অর্থমন্ত্রী নিজেই উল্লেখ করেছেন। এতে ম্যাক্রো অর্থনীতির স্থিতিশীলতা যে বিপন্ন হবে তাতে অবাক হবার কিছুই নেই। এ সকল বিষয়ে সরকারের আগে থেকেই সতর্ক হওয়া উচিত ছিলো। যদিও আত্মসন্তুষ্ট অর্থমন্ত্রী কোন সতর্কবাণী কানে তোলেননি। মুদ্রাস্ফীতির হার কখনও কমবে কখনও বাড়বে। কোন শিল্পে মন্দা দেখা দেবে, আবার কোনো কোনো শিল্পের ব্যাপক শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে। তথাপি সার্বিকভাবে এগিয়ে যাবে অর্থনীতি, বাড়বে কর্মসংস্থান, উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বাড়বে- এ সবইতো সংস্কারের লক্ষ্য। গত চার বছর ধরে এই সংস্কারের জন্যে দেশের জনসাধারণ বহু ত্যাগ স্বীকার করেছে, তথাপি অর্থনীতিতে যেন গতিশীলতা আনা গেল না।

অর্থনীতির গতিধারা

এখন চাপের মুখে রয়েছে দেশের সার্বিক অর্থনীতি। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক 'চলমান অর্থনীতির গতিধারা' পর্যালোচনা করে উল্লেখ করেছে, বেসরকারি খাত ও অন্যান্য সরকারি খাতে ঋণ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও মূলত বৈদেশিক খাতে সঙ্কোচনমূলক প্রভাব এবং অন্যান্য পরিসম্পদ খাতে (নীট) দায় বৃদ্ধির ফলে অর্থ সরবরাহ (ব্রড মানি) সামান্য হ্রাস পায়। ইতোমধ্যে আমদানি ব্যয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পেলেও রফতারি পরিমাণ কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হ্রাসের সঙ্গে সরকারকে প্রদানকৃত করসমূহ হতে রাজস্ব আয়ও হ্রাস পায়। বিদ্যমান বাজার পরিস্থিতির আলোকে সেপ্টেম্বর '৯৫ সময়কালের রফতারি আয়ের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৯৯.৬০ মিঃ ডলার। যা পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ সময়কালের তুলনায় ১০২.৯০ মিঃ ডলার (১২.৯২%) বেশি।

রফতানি উন্নয়ন ব্যুরোর সর্বশেষ তথ্যের ভিত্তিতে আগস্ট মাসে রফতানির পরিমাণ পূর্ববর্তী মাসের ৩৫৫.৬৪ মিঃ ডলারের তুলনায় সামান্য হ্রাস পেয়ে ৩৫৫.৩১ মিঃ ডলারে দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের একই মাসে রফতানি আয়ের পরিমাণ ছিল ৩১৭.৫১ মিঃ ডলার। রফতানি উন্নয়ন ব্যুরোর পূর্ববর্তী তথ্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান বিভাগের হিসেব অনুসারে গত সেপ্টেম্বর মাসে রফতানির আনুমানিক

www.pathagar.com

পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৫০.০৫ মিঃ ডলার, যা পূর্ববর্তী মাসের তুলনায় ৫.২৬ মিঃ ডলার কম এবং পূর্ববর্তী বছরের একই মাসের ২৯২.৫০ মিঃ ডলারের চেয়ে ৫৭.৫৫ মিঃ ডলার বেশি। জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ সময়কালের প্রাক্কলিত রফতানির পরিমাণ দাঁড়ায় ১০৬১.০০ মিঃ ডলার, যা পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ সময়কালের তুলনায় ১৫০.৫৬ মিঃ ডলার (১৬.৫৪%) বেশি।

প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ

সর্বশেষ প্রাপ্ত সাময়িক তথ্যানুসারে ১৯৯৫ সালের অক্টোবর মাসে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ৯৩.৫০ মিঃ ডলারে দাঁড়ায়। জুলাই-অক্টোবর'৯৫ সময়কালে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৮৬.০৯ মিঃ ডলার যা পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ সময়কালের ৩৮৫.২১ মিঃ ডলারের তুলনায় ০.৮৮মিঃ ডলার (০.২৩%) বেশি।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

অক্টোবর'৯৫ শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আরো হ্রাস পেয়ে ২৬৪৯.২৯ মিঃ ডলারে দাঁড়ায় যা পূর্ববর্তী বছরের ('৯৪) অক্টোবরের তুলনায় ৫৫৫.৩৫ মিঃ ডলার কম। জুলাই-অক্টোবর'৯৫ সময়কালে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ হ্রাসের কারণ হিসেবে এসিইউ নিষ্পত্তির আওতায় নীট বহিঃপ্রকাশ মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ পরিশোধ, ওইসিএফ ঋণ ও জাপানি সাহায্য অনুদান দায়-পরিশোধ এবং 'ভ্যালুয়েশন এ্যাডজাস্টমেন্ট'কে চিহ্নিত করা যায়।

বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য

জুলাই-সেপ্টেম্বর'৯৫ সময়কালে রফতানির তুলনায় আমদানি ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণ অনেক বেশি হওয়ায় বাণিজ্যিক ভারসাম্য (Balanced of Trade) ঘাটতির পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের একই সময়কালের ২৬৮ মিঃ ডলারের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে ৬৭৮ ডলারে দাঁড়ায়। বাণিজ্যিক ঘাটতি (Trade Deficit) বৃদ্ধি পাওয়ায় এ সময়ে চলতি হিসেবে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়কালে ৭ মিঃ ডলার উদ্বৃত্তের বিপরীতে ৩৮০ মিঃ ডলার ঘাটতি হয়।

রাজস্ব আয়

জুলাই-সেপ্টেম্বর'৯৫ সময়কালে রাজস্ব আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ২,৫১৫.১০ কোটি টাকা। যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়কালের তুলনায় ২৯৫.৬৮ কোটি টাকা (১৩.৩২%) বেশি এবং এ সময়ের বাজেট প্রাক্কলনের তুলনায় ৭১.৬৮ কোটি টাকা (২.৯৩%) বেশি।

এ সময়ে ভ্যাট থেকে রাজস্ব প্রাপ্তি পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ সময়কালের তুলনায় ১৫.৫৩% এবং উল্লিখিত সময়কালের বাজেট প্রাক্কলনের তুলনায় ১১.৪৫% বেশি। বহিঃশুল্ক থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ সময়কালের তুলনায় ৫.৮১% এবং বাজেট প্রাক্কলনের তুলনায় ৪.৪৩% কম, সম্পূরক শুল্ক থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব আয় পূর্ববর্তী

www.pathagar.com

বছরের তুলনায় ২৫.৪৪% এবং বাজেট প্রাক্কলনের তুলনায় ১০.৯৪% বেশি। আয়কর থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব পূর্ববর্তী বছরের একই সময়কালের তুলনায় ১৫.৯৬% এবং উল্লিখিত সময়কালের বাজেট প্রাক্কলনের তুলনায় ৩.৩১% কম।

অর্থ ও ঋণ পরিস্থিতি

১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ব্যাপক অর্থে অর্থ সরবরাহ (ব্রড মানি) ৮৬.০০ কোটি টাকা (০.২০%) হ্রাস পেয়ে ৪২,৪৭৬.৭০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ সময়কালে ব্যাপক অর্থে অর্থ সরবরাহ ২৬৪.৪০ কোটি টাকা (০.৬৩) বৃদ্ধি পায়, যা সেপ্টেম্বর'৯৫ শেষের লক্ষ্য মাত্রার তুলনায় ১.২৪% বেশি। পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ সময়কালে ব্যাপক অর্থে সরবরাহ ৩৯৫.৫০ কোটি টাকা (১.০৯%) বৃদ্ধি পেয়েছিলো। এই সময়কালে ব্যাপক অর্থে অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধির উপাদানসমূহের মধ্যে আমানত (তলবী ও মেয়াদী) ৩৩৩.৭০ কোটি টাকা (০.৯৪%) বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা ৬৯.৩০ কোটি টাকা (১.০৬%) হ্রাস পায়।

কৃষি ঋণ

জুলাই-সেপ্টেম্বর'৯৫ সময়কালে মোট কৃষি ঋণ বিতরণের পরিমাণ ২৩৭.৬৮ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। যা পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ সময়কালের তুলনায় ৫১.৭৭ কোটি টাকা (২৭.৮৫%) বেশি। এই সময়কালের কৃষি ঋণ আদায়ের পরিমাণও পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ সময়কালের তুলনায় ১১.০০ কোটি টাকা (৫.৭০%) বৃদ্ধি পেয়ে ২০৩.৯৩ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

আমদানি ব্যয়

জুলাই-সেপ্টেম্বর'৯৫ সময়কালে মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১,৭৩৯.০০ মিঃ ডলার যা পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ সময়কালে আমদানি ব্যয়ের তুলনায় ৫৬১.২০ মিঃ ডলার (৪৭.৬৫%) বেশি। এই সময়কালে মোট আমদানি ব্যয়ের মধ্যে নগদ অর্থে আমদানির পরিমাণ ছিলো ১,৪৮৮.৫০ মিঃ ডলার, ঋণ/অনুদানের আওতায় ২৩৬.০০ মিঃ ডলার এবং বার্টার এসটিএ-এর আওতায় ১৪.৫০ ডলার।

আমদানি ঋণপত্র

জুলাই-সেপ্টেম্বর'৯৫ সময়কালে নতুন আমদানি ঋণপত্র খোলার মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ১,৭৭৪.৭২ মিঃ ডলার যা পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ সময়কালের তুলনায় ৩৪৮.৩১ মিঃ ডলার (২৪.৪২%) বেশি।

সংস্কার কর্মসূচীর সাফল্য ও বাস্তবতা

বাজার অর্থনীতি ও সামাজিক নিরাপত্তা শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তারা অভিমত ব্যক্ত

www.pathagar.com

করেন, সাধারণ মানুষকে প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত করা না হলে সংস্কার কর্মসূচীতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে না। দেশে এখন প্রবৃদ্ধির হার আশানুরূপ নয়। এফবিসিসিআই সভাপতি দাবি করেছেন, প্রবৃদ্ধির হার ৫ থেকে সাড়ে ৫ বলা হলেও আসলে এর পরিমাণ আরও বেশি। সম্প্রতি একটি ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দল ইউরোপ-আমেরিকা সফর করে তারা বিদেশী ব্যবসায়ীদের ও সাহায্য সংস্থাগুলোকে ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেন, দেশে প্রবৃদ্ধির হার আসলে ৭-এর উপরে। তারা মনে করেন, বেসরকারী খাত ও গ্রামীণ ব্যাংকসহ এনজিওগুলোর উন্নয়ন কর্মকাণ্ড যোগ করলে সামগ্রিক অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হার ৭ ভাগ হবে। অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হার অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের এই যুক্তি অর্থনীতিবিদরা মানতে রাজি হলেও প্রবৃদ্ধি অর্জন ৭ ভাগের ধারণাকে তারা মোটেই স্বীকার করতে রাজি নন।

বর্তমানে দেশে মুদ্রাস্ফীতির হার বেশ দ্রুত গতিতে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে লাফিয়ে চলছে। এখন ন্যারো মানি (এম-১) ও ব্রড মানি (এম-২)-এর হার বৃদ্ধি পাওয়া এবং আমাদনি ভীষণভাবে বেড়ে যাওয়াতে মুদ্রাস্ফীতিতে প্রভাব পড়েছে। দেশে মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি, কৃষিতে আশানুরূপ উৎপাদন না হওয়া এবং সরকারি ও ব্যক্তি মালিকানাভিত্তিক ব্যবসা-বাণিজ্য চাঙ্গা না থাকায় প্রবৃদ্ধির হার ৬-এর উপরে উঠতে পারেনি। প্রবৃদ্ধির হারকে এগিয়ে নিতে হলে দেশে আরও বিনিয়োগ হওয়া দরকার। বিনিয়োগের হার এখন জিডিপি'র ১৪ শতাংশ। এই হার অন্তত ২০ শতাংশের উপরে হওয়া উচিত। কিন্তু রাজনৈতিক সংকট, চোরাচালানী ও এক শ্রেণীর উৎপাদক ব্যবসায়ীদের পণ্যের গুণগতমান বৃদ্ধি না পাওয়ায় দেশের পণ্য রফতানি ধীরে ধীরে কমে গিয়ে আমদানি নির্ভর হয়ে উঠছে। প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে এটা একটা বাধা। সেপ্টেম্বরের ('৯৫) শেষের দিকে এফবিসিসিআই সভাপতি এক সেমিনারে ৯ শতাংশের অধিক (দ্বি-সংখ্যার) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্যে ৯ দফা উন্নয়ন মডেল উপস্থাপন করার সময় আশানুরূপ প্রবৃদ্ধি অর্জিত না হওয়ার জন্যে প্রশাসনের অদক্ষতা, বিশৃঙ্খলা ও নৈতিকহীনতাকে দায়ী করেন।

অর্থমন্ত্রী জাতীয় সংসদে ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বছরের বাজেট পেশকালে স্বীকার করেছেন যে, রাষ্ট্রায়ত্ব খাতে বড় বড় কর্পোরেশনগুলোর আর্থিক অব্যবস্থা ও পরিচালনাগত অদক্ষতার কারণে আয় কমে যাওয়ায় শুধুমাত্র শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধি মন্থর হয়ে পড়েনি, বরং এর ফলে ব্যাংকিং আর্থিক অসুবিধা তীব্র হয়েছে।

দারিদ্র্য থেকে উন্নতির সুযোগ গ্রহণ ও চ্যালেঞ্জসমূহ দূর করতে হলে আগামী দু'হাজার সাল নাগাদ আমাদের প্রবৃদ্ধির হার ১০ ভাগ অর্জন করতে হবে। আর এ জন্য মুক্তবাজার অর্থনীতিকে পরিচালনা করতে হবে নৈতিকতার ভিত্তিতে। সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা হচ্ছে প্রবৃদ্ধি অর্জনের চাবিকাঠি। কেননা, সামষ্টিক অর্থনীতিতে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ এনে দেয় এবং ব্যাষ্টিক অর্থনীতিতে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা কেবল নিশ্চিতই করে না বরং অর্থনৈতিক ভারসাম্য এবং স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে।

www.pathagar.com

বাজার অর্থনীতিকে কন্দ্রে করে বিশ্বের সকল দেশেই আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট গড়ে তুলছে। গ্যাট চুক্তি স্বাক্ষরের পর বিশ্বব্যাপী অবাধ বাণিজ্যের দ্বার উন্মুক্ত হয় এবং এর ফলে দেশে দেশে বাণিজ্য প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেলে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট গঠনের তৎপরতা ক্রমাগত বেড়ে চলে। সরকারের এখন দরকার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে কাঠামোগত সমন্বয় সাধন এবং এই সমন্বয় সাধন কর্মসূচীতে দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে, বিশেষ করে গরীব জনসাধারণকে বাজার অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার সাথে জুড়ে না দিয়ে তাদেরকে রক্ষার জন্যে অভিভাকত্ব গ্রহণ করতে হবে সরকারকে। শিল্পখাতের পাশাপাশি গ্রামীণ দারিদ্র্য নিরসনে গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নকে গুরুত্বের সাথে নিতে হবে। গ্রামীণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও মানব সম্পদের বিস্তৃত উন্নয়নের ফলে কৃষি ও শিল্পে যে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে তা সামগ্রিক অর্থনীতিকে চাঙ্গা করবে।

আর তাই সরকারের উচিত প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি অব্যাহত রাখার স্বার্থে অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচীকে এগিয়ে নেয়া এবং এ জন্যে প্রশাসনসহ সর্বত্র সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও সংস্কারের ক্ষেত্রে দারিদ্র্য বিমোচনের বিষয়টি নজরে রাখতে হবে। সাধারণ মানুষকে প্রবৃদ্ধি অর্জনের সাথে সম্পৃক্ত করা গেলে বিশ্ব অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারার সাথে বাংলাদেশ দু'হাজার সাল থেকে দু'হাজার পাঁচ সালের মধ্যেই প্রতিযোগিতায় নামতে পারবে বলে প্রত্যাশা করা যেতে পারে।

আর দেশে রাজনৈতিক স্তিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সংস্কার কর্মসূচিকে এগিয়ে নেয়া হলে আগামী বছরই ভিয়েতনামসহ এশিয়ার কয়েকটি দেশের সাথে বাংলাদেশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের প্রতিযোগিতায় নামতে পারবে বলে মনে হয়। ❑

** বাংলাবাজার পত্রিকা-এ জানুয়ারী ১০, ১৯৯৬-এ প্রকাশিত।*

www.pathagar.com

সুদের হারের পরিবর্তনই বিনিয়োগের জন্য যথেষ্ট নয়

বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো যখন লোকসান দিচ্ছে, তখন বাংলাদেশ ব্যাংক লাভ করছে। সরকারও অতিরিক্ত রাজস্ব প্রাপ্তির কারণে বাণিজ্যিক ব্যাংকের উপর এই ধরনের লাভের কি প্রভাব তা নিয়ে তেমন উদ্বিগ্ন নয় বলে অনুমতি হচ্ছে। তবে অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, অনুৎপাদনশীল খাতে এ ধরনের লাভ দেশের উৎপাদন ক্ষমতার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আয় সাধারণতঃ তাদের প্রদত্ত সেবার জন্য চার্জ থেকেই আসে। পৃথিবীর বহু দেশেই এই প্রথা চালু রয়েছে, যাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের খরচ উঠে যায়। কিন্তু বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিগণিত। তাই এ প্রক্রিয়ার আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক শুধু নিজের খরচ উঠাচ্ছেনা, বরং লাভও অর্জন করছে। যে সকল বিদেশী সাহায্য বাংলাদেশে আসে তার উপর বাংলাদেশ ব্যাংক উঁচু হারে সুদ বসিয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংক তথা গ্রহীতাদের কাছ থেকে এ অর্থ আদায় করে থাকে।

এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের বন্ডের উপরও বাংলাদেশ ব্যাংক সেবার জন্যে চার্জ নির্ধারণ করে থাকে। যার প্রভাবে ঋণগ্রহীতাকে উচ্চমূল্যে ঋণ গ্রহণ করতে হয় অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠান থেকে।

সুদের মাধ্যমে ব্যয় সংগ্রহ

ইতোমধ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে সুদের হার কমানো হয়েছে। কারণ বাংলাদেশে সুদের হার পৃথিবীর অনেক দেশের চেয়েই বেশি। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, কেন্দ্রীয় ব্যাংককে লাভজনক রাখার জন্যে সুদ নির্ধারণ করার অর্থ বা যৌক্তিকতা কি? এর ফলে ঋণ ও বিনিয়োগের ওপর চাপ কমবে এবং অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্ম বাড়বে। বর্তমানে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে চালু রাখার জন্যে কৃত্রিমভাবে ট্রেজারীবন্ডের মাধ্যমে পুনঃ পুঁজিকরণ করা হচ্ছে। এ জন্য রাজস্ব থেকে প্রতি বছর টাকা দিতে হবে। আর তাই এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন আসাই স্বাভাবিক, এখন কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোকে টাকা দেয়ার যৌক্তিকতা কোথায়?

আবার দেখা যায় প্রায়ই বাংলাদেশ ব্যাংক ও সরকারের পরিসংখ্যান তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। কেননা, বাংলাদেশে সরকার যখন বলছে, দেশের মুদ্রাস্ফীতির হার শতকরা ৩ ভাগ, তখন বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে, শতকরা ৯ ভাগ। যদিও পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংগে সরকারের তথ্য তারতম্য থাকে, তবে তা কখনই এতো বেশি হয় না। আমাদের অর্থনীতিবিদরা তাই অভিমত ব্যক্ত করেন, বাংলাদেশ ব্যাংক শুধু তার খরচ তুলে নিলে বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ঋণ গ্রহীতাদের টিকে থাকার সম্ভাবনা বাড়তো। তাছাড়া গোটা জাতিকেই এর মূল্য দিতে হবে।

(১) কম অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে,

www.pathagar.com

(২) করের বোঝা বাড়িয়ে-এই দুই প্রক্রিয়া অবলম্বনে।

তাই শুধু মাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাংকের খরচ মেটানোর জন্যে সুদ নির্ধারিত হলে রাজস্ব আয় কমলেও সামগ্রিক অর্থনীতির ক্রিয়াকলাপ বাড়বে এবং চূড়ান্ত বিশ্লেষনে রাজস্ব আয় অনেক বেশি হবে।

বিনিয়োগে মন্দাভাব

বিনিয়োগকে উৎসাহ প্রদানের আহবান সত্ত্বেও দেশে প্রকৃত বিনিয়োগ বাড়ছে না। বিদেশী কোম্পানীগুলো ক্রমাগত বিনিয়োগ গুটিয়ে ফেলছে। ব্যাংক ডিপোজিটের পরিমাণ বাড়ছে। গত দু'দশক ধরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গড় হার বার্ষিক ৪ থেকে ৫ শতাংশ। যদিও উন্নততর উন্নয়ন আশা করা গিয়েছিলো। কিন্তু অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং ক্রমাগত বাহ্যিক কিছু কারণ অর্থনীতিতে বিরাজমান থাকায় দীর্ঘ নীতিমালা বাস্তবায়ন বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে এটা সত্যি যে, বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য সমস্যা মেটাতে সামান্য আয় বৃদ্ধি সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

বিশ্ব ব্যাংকের মতে, দেশের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য বিমোচনে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি কমপক্ষে ৫ শতাংশের ওপরে হওয়া প্রয়োজন। সাম্প্রতিক সময়গুলোতে ব্যাংকে মূলধনের অভাব না থাকলেও বিনিয়োগ বাড়ছে না, বরং বাড়ছে ব্যাংক ডিপোজিটের পরিমাণ- ১৯৯০-৯১ সালে ব্যাংক ডিপোজিটের পরিমাণ ছিলো ২ লাখ ১৩ হাজার ৯২৬ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯১-৯২ সালে পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ২ লাখ ৪৪ হাজার ৫৩৩ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯২-৯৩ সালের জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ২ লাখ ৪৩ হাজার ৭১০ মিলিয়ন টাকা।

আবার অন্যদিকে ১৯৮১ সালে জিডিপি-তে অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগের অংশ ছিলো ১৫ দশমিক ৯ শতাংশ যা ১৯৯১ সালে নেমে দাঁড়িয়েছে ১১ দশমিক ৬৯ শতাংশ। অথচ সঞ্চয়ের অংশ যা ১৯৯০-৯১ সালে ৪ দশমিক ৩৭ শতাংশ ছিলো তা ১৯৯১-৯২ সালে বেড়ে ৬ দশমিক ১০ শতাংশ উন্নীত হয়। এ ক্ষেত্রে সঞ্চয় ও আমানত বাড়লেও বিনিয়োগ বৃদ্ধি আশানুরূপ নয়।

দেশের রফতানীতিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্যে নতুন কোন কৌশল নেয়া হয়নি। রফতানীতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলে দেশে বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন রফতানী দু'টোই বৃদ্ধি সম্ভব। তাই বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে এমন নীতি গ্রহণ করতে হবে, যা শিল্পায়ন ও রফতানীতে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সহায়ক হতে পারে। এ যাবৎ ঘোষিত দ্বি-বার্ষিক নীতিমালার আলোকে রফতানী নীতির বাস্তবায়ন আশাব্যাঞ্জক নয়। রফতানী বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলো যখন এক্ষেত্রে দেয় সুয়োগ-সুবিধার পূর্ণ বাস্তবায়ন করছে তখন বাংলাদেশে এ ব্যাপারে শুধু কাগজেই সীমাবদ্ধ থাকছে, প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়নি। বরং প্রতিশ্রুতি সুবিধা বাতিল করে নতুনভাবে নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

কর্মসংস্থানে পুঁজি বিনিয়োগের বিকল্প নেই

প্রত্যাশিত জাতীয় উন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, বর্ধিত উৎপাদন ও অধিক কর্মস্থানের জন্যে বিভিন্ন খাতে বিশেষতঃ শিল্পখাতে ব্যাপক পুঁজি বিনিয়োগের কোন বিকল্প নেই। সরকারের শিল্প খাতে পুঁজি বিনিয়োগ বৃদ্ধি নামের একটি সংস্থাও এই লক্ষ্যে সক্রিয় রয়েছে।

অর্থমন্ত্রীসহ অন্যান্য মন্ত্রী ও সরকারী কর্মকর্তার বিভিন্ন সময়ে নিয়মিত পুঁজি বিনিয়োগ বৃদ্ধির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। কিন্তু এর পরই এটাই সত্য যে, পুঁজি বিনিয়োগ আশানুরূপ হচ্ছে না। বরং দিনে দিনে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অনুৎসাহ বেড়েই চলেছে, যার ফলশ্রুতিতে বিনিয়োগের পরিমাণ কমছে। দেশের ভবিষ্যতের জন্যে এই পরিস্থিতি অত্যন্ত হতাশাজনক। তাই রাজনীতিবিদ অর্থনীতিবিদ, বিদেশী কুটনীতিক ও বিদেশী সংস্থার কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যে এ ব্যাপারে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। বর্তমানে দেশে বেকারের সংখ্যা ১ কোটি ৮০ লাখের মতো। প্রতি বছর ২৫ লাখ বেকারের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা গেলে শুধুমাত্র বর্তমান বেকারত্ব ঘুচাতে সময় লাগবে ৭ বছর। আবার এই ৭ বছরে অবশ্য নতুন বেকারও কর্মক্ষেত্রে সংযোজিত হচ্ছে। আর বছরে ২৫ লাখ বেকারের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে গেলে ন্যূনপক্ষে সাড়ে ১২ হাজার কোটি টাকার মূলধন বিনিয়োগ করতে হবে। তাই যেখানে অন্ততঃ গড়ে ১২ হাজার কোটি টাকার নতুন পুঁজি বিনিয়োগের প্রয়োজন, সেখানে নতুন পুঁজিতো লগ্নি হচ্ছেই না, বরং পুরাতন পুঁজিও পাততাড়ি গুটাচ্ছে। এর ফলে আমাদের সামগ্রিক অর্থনীতি, বিশেষভাবে শিল্পায়ন স্থবিরতার রাহুগ্রাসে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

বিনিয়োগ পরিস্থিতি অনুকূল নয়

পুঁজি বিনিয়োগের এই নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতির পিছনে নানা কারণের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রকৃত পক্ষে বিশেষভাবে কোনো ব্যবস্থা অবশ্য এই লক্ষ্যে আজও গৃহীত হয়নি। সাধারণতঃ উদ্যোক্তা পুঁজি বিনিয়োগ করে অধিক লাভের আশায়। লাভ-লোকসানের বিবেচনায় যদি উদ্যোক্তা বুঝতে পারেন, বিনিয়োগকৃত মূলধন লাভসহ ফেরৎ আসার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে, তবেই তিনি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উদ্যোগী হবেন। কিন্তু দেশী বিদেশী বিনিয়োগকারীদের মধ্যে এই ধারণার জন্য হয়েছে যে, এখানে বিনিয়োগ পরিস্থিতি যথেষ্ট অনুকূলে নয়। শ্রমিক আন্দোলনে রাজনীতির মাত্রাতিরিক্ত অনুপ্রবেশ, সহিংস শ্রমিক আন্দোলন, কথায় কথায় হরতাল-বন্দ্ এবং শ্রম আইনের কড়াকড়ি প্রয়োগে সরকারের ব্যর্থতা, এই পরিস্থিতির জন্য বিশেষভাবে দায়ী বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

অবকাঠামোগত প্রতিকূলতা

শিল্প স্থাপনে প্রাতিষ্ঠানিক জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রিতা, ব্যাংক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিনিয়োগবিমুখ মানসিকতা, ব্যাংক ঋণের উচ্চ সুদের হার, টাকার অবমূল্যায়ন, শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতার অস্বাভাবিক হ্রাস, বিনিয়োগকারীদের বিরুদ্ধে যথেচ্ছ মামলা-মোকাদ্দমা দায়ের, ব্যাপক চোরাচালান, রফতানী ক্ষেত্রে বিভিন্নমুখী প্রতিবন্ধকতা ও রফতানি সম্ভাবনার সংকোচন এবং অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা, যেমন- বিদ্যুৎ পানি, গ্যাস পরিবহন,

www.pathagar.com

রাস্তা–ঘাট এর অভাব বিনিয়োগ পরিস্থিতিকে এতটা নাজুক অবস্থানে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বস্তুত পক্ষে এসব কারণেই এদেশে বিনিয়োগ উৎসাহীন হয়ে পড়েছে।

বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায়, ১৯৮৫-৯০ সাল পর্যন্ত ৬ বছরে বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগ হয়েছে ১০ মিলিয়ন ডলারেরও কম। অন্যদিকে 'সার্ক' দেশ শ্রীলংকায় প্রতিবছর বিনিয়োগ হয়েছে ২৪ থেকে ৫৮ মিলিয়ন ডলার এবং পাকিস্তানে হয়েছে ১০৬ থেকে ১৭৩ মিলিয়ন ডলার। এই অঞ্চলেরও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশে বিনিয়োগ প্রতবিছরই বেড়ে চলছে। এই প্রেক্ষাপটে দেশী-বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য যেমন শিল্প ও শ্রম ক্ষেত্রে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা একান্ত আবশ্যক, তেমনি আবশ্যকতা রয়েছে বিনিয়োগকে আরও সহজ ও লাভজনক করা এবং অবকাঠামোগত সকল সুযোগ-সুবিধা চাওয়া মাত্র নিশ্চিত করার যথাযথ ও বাস্তবানুগ ব্যবস্থাকরণের।

সুদের হার হ্রাস এ ক্ষেত্রে সহায়ক

বাংলাদেশ ব্যাংক সুদের হার হ্রাস করার মাধ্যমে ব্যাংকিং সেক্টরে শেষ সহায়কের ভূমিকার কার্যকারীতার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। যদি ব্যাংকিং ব্যবস্থা পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্যতা আনায়নে সক্ষম হয়, তাহলে এ সহায়তামূলক পদক্ষেপ বাজার অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে সক্ষম হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়, যদি ব্যবসায়িক কর্মকান্ডে অন্যান্য পরিবেশগত অবস্থানসমূহ অনুকূল দিকে অবস্থান গ্রহণে সক্ষম হয়।

ধার বা ঋণ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ সুদের হার ৮ শতাংশ থেকে ৭ শতাংশ এবং পরবর্তীতে ৬.৫ শতাংশ এমনি সময়ে নির্ধারণ করা হয়েছে, যখন দেশে অফিসিয়াল মুদ্রাস্ফীতির (Inflation) হার ৪.৫ শতাংশ এবং এরই সাথে সঞ্চয়ী মূলধনের (Savings Funds) টার্ম লোনের ফ্লর রেটের একই মাত্রায় সুদের হার হ্রাস বর্তমান বিরাজমান অবস্থার আলোকে যুক্তিযুক্ত হিসেবে প্রতিভাত হচ্ছে। এর ফলশ্রুতিতে অর্থনীতিতে গতি ফিরিয়ে আনার সম্ভাবনা দেখা দেবে এবং বিনিয়োগকারীরাও ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে আরো উৎসাহী হয়ে উঠবে।

যখন মুদ্রাস্ফীতির হার কমে থাকে, তখন ব্যাংকে আমানতকারীদের সঞ্চিত অর্থ থেকে আয় ধনাত্মক হয়ে থাকে। যেহেতু মূল্য বৃদ্ধিজনিত ব্যয়কে তার রিয়েল এস্টেট থেকে অর্জিত আয়ের দ্বারা ছাপিয়ে দেয়া সম্ভব হয়। সাধারণতঃ ব্যাংক এবং অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশকৃত সুদের হারের ভিত্তিতে ঋণের জন্য ব্যবহৃত অর্থ এবং ব্যাংকের গচ্ছিত অর্থের ওপর সুদ গ্রহণ ও প্রদানের হার নির্ধারণ করে থাকে। তাই সুদের হারের হ্রাস বৃদ্ধি ও উঠা নামা, সকল কার্যক্রম কেন্দ্রীয় ব্যাংক-এর নীতি-নির্দেশনার সাথে সামঞ্জস্যপুর্ণ।

পরিবর্তনযোগ্য ব্যবস্থার অভাব

কিন্তু আমাদের দেশে প্রয়োজনানুসারে পরিবর্তনযোগ্য অবস্থার উপস্থিতি আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে নেই, যা আমাদের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক। ব্যাংকসমূহও যথাযথ সংকেত

www.pathagar.com

গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছে না ব্যাংক রেটের সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে। এরা অনেক ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ করে থাকে। ধার প্রদানের ক্ষেত্রে সুদের হার হ্রাস সংগ্রহের ব্যয় অনেক হ্রাস পায়, যদিও এ সকল ঋণগ্রহীতারা একই সেক্টরে কার্যক্রমে নিয়োজিত। এর প্রভাবে ব্যবসায়িক অংগনে রুগ্নতা সৃষ্টির সহায়ক এবং ঋণ সমন্বয়ের ক্ষেত্রে নতুন সমস্যার জন্ম দেবে। এই ব্যবস্থাকে দ্বৈত মানসম্পন্ন হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। কেননা, যেখানে সকল ধরনের সঞ্চয়ীদের ক্ষেত্রে একই প্রকার সুদের হার বিরাজমান, সে ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতাদের জন্য সুদের হারের বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে সুদের হার হ্রাস করার ক্ষেত্রে।

সর্বাগ্রে আমরা বিবেচনা করে থাকি, ঋণের অথবা বিনিয়োগের জন্য অর্থের চাহিদা বিভিন্ন উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে, যার মধ্যে সুদের হার কাঠামো কেবল একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান হিসেবে পরিণগিত। এ ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক পরিবেশে রক্ষণাবেক্ষণ, বুনিয়াদী উপাদান হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে ব্যবসার প্রসার ও শিল্প সম্প্রসারণের উপযোগী পরিবেশের অভাব ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে, এত বছর পরেও আমাদের অর্থনীতিতে শিল্প-বাণিজ্যের সুষ্ঠু বিকাশের ক্ষেত্রে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি বা অবস্থান অর্জিত হয়নি বরং আমরা কেবল পেছনের দিকেই ক্রমান্বয়ে ধাবিত হচ্ছি। তাই এখনো যথাযথ ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং তদঅনুসারে কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব না হলে আমাদের বিরাজমান অচলাবস্থা কাটানো অত্যন্ত দুঃসাধ্য বা কষ্টকর হয়ে উঠবে বলে প্রতিভাত হচ্ছে।

বিশ্বব্যাংকের সুপারিশ

বিশ্বব্যাংকের সুপারিশ দেশের বেসরকারী বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্যে ব্যাংকগুলোর আমানতের হার উদারীকরণের সুপারিশ করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশের বিনিয়োগের হার অত্যন্ত কম ও অর্থনীতি স্থবিরত্বে আক্রান্ত। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের তুলনায় বিনিয়োগের হার বার্ষিক ৫ থেকে ৬ শত মাত্র।

প্যারিস কনসেটিয়াম বৈঠকে উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুতকৃত সাহায্য স্মারকের সুপারিশে বাংলাদেশ ব্যাংকের আরোপিত ফ্লোর রেট তুলে দেয়ার সুপারিশ করা হয়েছিলো। সুপারিশে বিভিন্ন ব্যাংকের সম্প্রতিক সুদের হার হ্রাসের সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানিয়ে বলা হয়েছে-এতে বিনিয়োগ বাড়বে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

বর্তমানে বিভিন্ন মেয়াদী ঋণের ৮ থেকে ১০ শতাংশ সুদের হার উল্লেখ করে বিশ্বব্যাংক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তরল সম্পদের আধিক্য ও স্বল্প চাহিদার জন্য এই হারও বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্যে উপযোগী নয়। দেশের আর্থিক খাতে অদক্ষতার সমালোচনা করে সাহায্য স্মারকে বলা হয়েছে, এতে করে বেসরকারী খাতের অগ্রগতি বিঘ্নিত হচ্ছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো প্রশাসনিক, সঞ্চয় সংগ্রহ ও বিনিয়োগে সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারছে না। রাষ্ট্রয়াত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংগুলো বাজারমুখী আর্থিক প্রক্রিয়ার ক্ষতিসাধন করছে।

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন আর্থিক খাত সংস্কার কর্মসূচীর আওতায় আর্থিক খাতের

www.pathagar.com

সাম্প্রতিক সংস্কারের প্রশংসা করে বলা হয়েছে- সুদের হার উদারীকরণ, নতুন মুদ্রা ব্যবস্থা পৃথক ঋণ ব্যবস্থা অপনোদন, সাহায্যকৃত পুনঃঅর্থায়িত সুবিধা এবং অর্থ ঋণ আদালত প্রশংসনীয় উদ্যোগ হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে।

বাণিজ্যিক ব্যাকগুলোর পুনর্গঠনের জন্যেও বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বাড়ানোর সুপারিশ করা এবং ব্যাংকিং খাতে সরকারের সংস্কারের প্রতি আন্তরিকতার প্রমাণ হিসেবে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে সত্বর বেসরকারীকরণ করার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়।

শ্রেণীবদ্ধ ঋণ আদায়ের গতি মন্থর

অন্যদিকে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো মন্দ ঋণ, নিম্নমানের ঋণের আধিক্যের কারণে শ্রেণীবদ্ধ ঋণ (Caassified Loan) আদায়ের ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ। বাংলাদেশ ব্যাংকের বিধি অনুসারে প্রচেষ্টা গ্রহণ করা সত্ত্বেও প্রধান প্রধান রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ শ্রেণীবদ্ধ ঋণ আদায়ের সফল হয়নি। বিশ্বস্ত সূত্র থেকে জানা যায়, ব্যাংকসমূহে বাণিজ্যিক ঋণের মাত্র ২০ শতাংশ আদায় হয়েছে, রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক, বেসরকারী ব্যাংক ও বিশেষ ব্যাংক উন্নয়নমূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মোট ৮ হাজার কোটি টাকার মতো শ্রেণীবদ্ধ ঋণ বকেয়া রয়েছে।

খেলাপী ঋণগ্রহীতারা '৯০-৯২ সালে সময় মতো পর্যাপ্ত সাড়া না দেয়ার ব্যাংকগুলোর শ্রেণীবদ্ধ ঋণ আদায়ের পরিমাণ ৪শ কোটি টাকা। ব্যাংকগুলোর ধারণা, খেলাপী ঋণগ্রহীতাদের বিরাট অংশ বিশেষ ছাড়ের জন্যে অপেক্ষা করছে। তাই অনাদায়ী ঋণ আদায় না হলে বড় কোন প্রকল্প নতুন করে ঋণ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না বরং এই বকেয়া ঋণ ব্যাংকের মুনাফা নষ্ট করে দিচ্ছে। কয়েকটি বেসরকারী ব্যাংক ও বিদেশী ব্যাংক শ্রেণীবদ্ধ ঋণের কারণে ১৯৯১-৯২ সালে ৪শ কোটি টাকা লোকসান দিয়েছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও বিশ্ব ব্যাংকের (WB) সুপারিশ অনুয়ায়ী শ্রেণীবদ্ধ ঋণের বিধান করা হয়েছে। আর্থিক খাতে সংস্কর কর্মসূচীর আওতায় ১৯৯১-৯২ সালে, এই বিধান যুক্ত করা হয়। এ প্রেক্ষিতে বিশ্ব ব্যাংকের অভিমত হচ্ছে, ব্যাংকের ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে সংশয় পুর্ণ সম্পর্কের কারণে অবস্থার উন্নতি হচ্ছে না।

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার ক্ষেত্রে গতি আনয়নের লক্ষ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে সংস্কার, বিনিয়োগে উদ্বুদ্ধকরণে সহায়তামূলক ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ ও কার্যকরীকরণ, উৎপাদনী প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠুভাবে কর্মকান্ড সম্পাদনের পরিবেশ এর নিশ্চয়তা বিধান, শ্রমিকদের মধ্যে দলাদলি হ্রাসের মাধ্যমে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদান, শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদানের পথ সুগম করা, মূলধন সরবরাহের প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রীতার অবসান, দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে উৎপাদিত সামগ্রীর যথাযথ বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান এবং রফতানী বাজার সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধার পরিধি বর্ধিতকরণের মাধ্যমে পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। ❑

** আজকের কাগজ-এ জুন ২০, ১৯৯৪-এ প্রকাশিত।*

www.pathagar.com

বিদেশী বিনিয়োগ ও বেসরকারিকরণে চাই সাহসী ভূমিকা

আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করে জনসাধারণের আর্থিক উন্নতি, দারিদ্র্যমোচন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকাস্থ বিশ্বব্যাংক মিশনের প্রধান মিঃ পিয়ারে ল্যাণ্ডেল মিলস কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশের আওতায় উল্লেখ করেন, বাংলাদেশ সরকারি এখতিয়ার ও নিয়ন্ত্রণে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বাদ দিলেও এখনো সরকারি পরিচালনাধীন পাটকল, বস্ত্রকল, সার কারখানা, এয়ারলাইন্স, টেলিযোগাযোগ, হোটেল ও অন্যান্য শিল্প এবং উৎপাদনমূলক প্রতিষ্ঠান রয়ে গেছে। সরকারের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুরো জনসাধরণের প্রদত্ত রাজস্বের বিরাট অপচয় করছে।

গত বছর সরকারি প্রতিষ্ঠানগুরো ৩শ' মিলিয়ন ডলার (১২শ' কোটি টাকা) লোকসান দিয়েছে। এর মধ্যে ২শ' ১০ কোটি টাকা লোকসান হয়েছে পাট খাতে। কিন্তু জনসাধারণের ট্যাক্সের টাকা দিয়ে এই লোকসান পূরণ করা হচ্ছে। উন্নয়নকামী বাংলাদেশের পক্ষে অব্যাহতভাবে এই বিরাট অপচয় বহন করার মতো ক্ষমতা নেই, রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকগুলোকেও এই অপচয়ের অংশ বহন করতে হচ্ছে। যার ফলে দুর্বল হয়ে পড়ছে দেশের সামগ্রিক আর্থিক ব্যবস্থা। যদিও অনেকে মনে করেন, সরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপনায় কিছুটা রদবদল করে অবস্থার উন্নতি করা সম্ভব হবে। কিন্তু সারা বিশ্বের অতীত অভিজ্ঞতা এই শিক্ষা দেয় যে, সরকারি সংস্থাগুলো মূলতঃ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় অদক্ষ। তাই এই ধরনের ব্যবসা পরিচালনা করা বাঞ্ছনীয় নয়।

যদিও বাংলাদেশ সরকার ক্রমান্বয়ে সরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বেসরকারিকরণ করতে চায়। তথাপি গত পাঁচ বছরে মাত্র ১২টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বেসরকারি হাতে হস্তান্তর করা হয়েছে, যা হস্তান্তরযোগ্য প্রতিষ্ঠানের মত পাঁচ শতাংশ, নির্বাচন যতই এগিয়ে আসে, আমরা রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে বেসরকারিকরণের ব্যাপারে কোন কথা শুনতে পাই না। রাজনীতিবিদগণ সম্ভবত বেসরকারিকরণকে ভোট হারানোর বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। ট্রেড ইউনিয়নগুলো বেসরকারিকরণে বাধা দিলেও তাদের এটা বুঝানো দরকার হয়, অদক্ষ শিল্প চালানোর জন্যে বছরের পর বছর জনসাধারণের উপর ট্যাক্স ধার্য অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়। সরকারি খাতে একজন শ্রমিককে কাজে রাখার জন্যে ৫৭ হাজার টাকা ব্যয় হচ্ছে। কাজেই সরকারি খাতের লোকসানী প্রতিষ্ঠান থেকে শ্রমিকদেরকে বেসরকারি খাতের লাভজনক প্রতিষ্ঠানে যাবার সুযোগ করে দেয়াও অত্যন্ত আবশ্যক। বরং অদক্ষ সরকারি প্রতিষ্ঠানুগলো লাখ লাখ করদাতা ও ভোটারের উপর অসহনীয় লোকসান চাপিয়ে সার্বিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করছে। আর এটা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেয়া রাজনৈতিক

www.pathagar.com

নেতাদের কাজ। নতুন নতুন বিনিয়োগ ও লাখ লাখ চাকরি সৃষ্টির জন্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ বাড়াতে হবে, পুরানো শিল্পের হস্তান্তর করে আধুনিকীকরণ, সম্প্রসারণ ও প্রতিস্থাপন করাও অত্যন্ত আবশ্যক হিসেবে বিবেচিত। তাছাড়া টেলিযোগাযোগ ও বিমানখাতে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করাও অত্যন্ত জরুরী। কেননা, এসকল খাতে নিযুক্ত কয়েক হাজার শ্রমিকেরা বিরোধিতার ফলে জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ দারুণভাবে ব্যহত হচ্ছে। যার ফলে বাড়ছে না বিনিয়োগ, আর ব্যবস্থা হচ্ছে না অধিক সংখ্যক চাকরির এবং সার্বিকভাবে সাফল্যমণ্ডিত হচ্ছে না দারিদ্র্যদূরীকরণের চেষ্টা।

এক্ষেত্রে সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক দায়িত্ব ছাড়াও বর্তমানে যে পদ্ধতিতে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো নামমাত্র মূল্যে চলে যাচ্ছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে- এই আশঙ্কা দূর করার জন্যে শ্রমিকদেরকে শেয়ারের মালিকানা দিয়ে স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে শেয়ার বিক্রি করে শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকানা দিয়ে স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে শেয়ার বিক্রি করে শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকানা ব্যাপকতর ভিত্তিতে শেয়ারহোল্ডারদের কাছে হস্তান্তর করার পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

বিদেশী বিনিয়োগকারীদের সহযোগিতা

এটা অবশ্য সত্য যে, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে সম্প্রসারণ করে লাভজনক করার জন্যে দেশীয় উদ্যোক্তাদের সাথে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। শুধু মূলধন নয়, বিদেশী সহযোগিদেরকে কারিগরি জ্ঞান এবং ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা এবং বিদেশের বাজারে উৎপাদিত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের বিষয়ে সহায়তাও প্রদান করতে হবে। বিদ্যুৎ, গ্যাস ও টেলিযোগাযোগখাতে বিপুল মূলধনের প্রয়োজন। বর্তমানে বাংলাদেশের জিডিপি-এর ১৫ শতাংশ হচ্ছে বার্ষিক বিনিয়োগের হার। বিনিয়োগের এই হার বাড়িয়ে ২০ শতাংশে উন্নীত করতে হবে। বিদেশী বেসরকারি খাতের বিপুল মূলধন বাংলাদেশে আসতে শুরু করলে বাংলাদেশ অন্যান্য দেশের সঙ্গে মিলিতভাবে বিভিন্ন খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করতে পারবে। যার মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে বিশ্বের অন্য সকল দেশসমূহের মত মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার প্রত্যাশা করা যাচ্ছে।

মনে রাখা দরকার যে, বাংলাদেশকে বর্তমানে প্রতিযোগিতায় পূর্ণ বিশ্বে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অগ্রগতি সাধন করতে হবে। যারা সবচেয়ে বেশি উদ্যোগী এবং যারা সঠিকভাবে কাজ করে, তারাই এগিয়ে যায়। এক্ষেত্রে সহায়তার জন্যে শুল্ক সংরক্ষণের হার ১৫ শতাংশের বেশি না রাখা, এক্সচেঞ্জ রেট প্রতিযোগিতামূলক দ্রব্য উৎপাদন করার এবং রফতানীমুখী শিল্পোন্নয়ন নীতি গ্রহণের আবশ্যকতা রয়েছে।

ট্যাক্স হোলি-ডে'র আবশ্যকতা

ট্যাক্স হোলি-ডে-এর ক্ষেত্রে দেখা যায়, যারা ভাল বিনিয়োগকারী নয়, তারা তাড়াতাড়ি তাদের বিনিয়োগকৃত মূলধন ফেরত পেতে চায়, তারাই ট্যাক্স হোলি-ডে চায়। এমনকি ভারত পাকিস্তন থেকে ইসরাইল পর্যন্ত বিভিন্নখাতে বিনিয়োগের জন্য ট্যাক্স হোলি-ডে

www.pathagar.com

দিচ্ছে। আর বাংলাদেশ যদি ট্যাক্স হোলি-ডে না দেয়, তাহলে এখানে দেশী ও বিদেশী কোন বিনিয়োগ বাড়বে না। যদিও আমাদের অর্থমন্ত্রী এই বাস্তব সত্য অস্বীকার করে তাঁর বাজেট বক্তৃতায় ট্যাক্স হোলি-ডে'র বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছেন। তাতে বিনিয়োগকারীরা দারুণভাবে নিরুৎসাহিত হয়েছেন।

প্রাইভেটাইজেশন বোর্ডে'র প্রক্রিয়া

প্রাইভেটাইজেশন বোর্ড গঠিত হবার পর থেকে এ পর্যন্ত মাত্র ১২টি শিল্প প্রতিষ্ঠান দরপত্রের মাধ্যমে বিক্রি করা সম্ভব হয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠান বিক্রি করে ১শ' ৯ কোটি ৭১ লাখ ৮৫ হাজার টাকা পাওয়া গেছে। বিক্রির লক্ষ্যে বোর্ড ৬৬টি শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট করেছে এবং ২শ' ১৭টি প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত ও ৪৫টি প্রতিষ্ঠান মূল্যায়নের কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

গত বছরের ('৯৫) জানুয়ারি মাস পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের ৩৭টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বিক্রি করার উদ্দেশ্যে প্রাইভেটাইজেশন বোর্ড দরপত্র আহ্বান করে। তার মধ্যে ২১টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের দরপত্র যথাযথ বলে বিবেচিত হয়। এসকল দরপত্রের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়ার জন্যে বোর্ড তা অর্থ ও অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রীপরিষদ কমিটিতে পেশ করে। মন্ত্রীপরিষদ কমিটি ১২টি দরপত্রের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়। সে অনুযায়ী এসকল প্রতিষ্ঠান সফল দরপত্রদাতাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। যার মধ্যে ৪টি শিল্প প্রতিষ্ঠান কেমিক্যাল খাতের, ৬টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বস্ত্র খাতের, ১টি প্রতিষ্ঠান ইস্পাত ও প্রকৌশল খাতের এবং ১টি চিনি ও খাদ্যশিল্প খাতের। বাকি ৯টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন কারণে হস্তান্তর করা সম্ভব হয়নি।

যদিও প্রাইভেটাইজেশন বোর্ড ১৯৯৫ সালের জন্যে মোট ৬৬টি প্রতিষ্ঠান বেসরকারিকরণের লক্ষ্যে চিহ্নিত করে, তথাপি রাজনৈতিক অস্থিরতাজনিত প্রতিকূল পরিবেশ বিরাজিত থাকায় কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান বিক্রির উদ্দেশ্যে বোর্ড দরপত্র আহ্বান করতে পারেনি। এই একই সময়ে বোর্ড আরও ২শ' ১৭টি প্রতিষ্ঠান বেসরকারিকরণের উদ্দেশ্যে চিহ্নিত ও ৪৫টি প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়নে করা কাজে নিয়োজিত ছিলো।

বিক্রির উদ্দেশ্যে যে সকল প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে,তার মধ্যে রয়েছে পাটকল খাতের ১৩টি, বস্ত্রখাতের ১১টি, ইস্পাত ও প্রকৌশল খাতের ৫টি, চিনি ও খাদ্য শিল্পখাতের ৪টি এবং অন্যান্য খাতের ১০টি। আর যে সকল প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন করা হচ্ছে, তার মধ্যে আছে- পাটকল খাতের ৩টি, বস্ত্রখাতের ৫টি, ইস্পাত ও প্রকৌশল এবং বিবিধ খাতের ১৩টি, চিনি ও খাদ্য খাতের ৯টি, কেমিক্যাল খাতের ৯টি এবং বহুজাতিক খাতের ৪টি। প্রাইভেটাইজেশন বোর্ড শিল্প প্রতিষ্ঠান বেসরকারি মালিকানায় হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় বিক্রির মাধ্যমে প্রায় ৫২ কোটি টাকা এ পর্যন্ত সরকারি কোষাগারে জমা দিয়েছে। যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠান বেসরকারি মালিকানায় হস্তান্তর করা হয়েছে, তার প্রায় ১শ' কোটি টাকার দেনা নতুন মালিকরা গ্রহণ করেছেন।

www.pathagar.com

মূল্য আদায়ে অচলাবস্থা

কিন্তু বেসরকারি খাতে হস্তান্তরিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মূল্য আদায়ের ক্ষেত্রে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয় পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে নতুন করে চিন্তা ভাবনা করতে শুরু করেছে।

কেননা, বেসরকারি খাতে হস্তান্তরিত ৩৬টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাছে মোট ৪০ কোটি ৮২ লাখ ৮৯ হাজার ৭০ টাকা ৬২ পয়সা অনাদায়ী রয়েছে। তার মধ্যে আসল ২৪ কোটি ৭৪ লাখ ৬১ হাজার ৫শ' ৪০ টাকা ৫৯ পয়সা ও সুদ ১৬ কোটি ৮ লাখ ২৭ হাজার ৫শ' ৩০ টাকা ৩ পয়সা।

তাছাড়া ৩৬টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৭টি পুরোপুলি পরিত্যক্ত, ৪টি আংশিক পরিত্যক্ত, ১২টি সাব-কমিটির, ২টি বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থার এবং ১টি বহুজাতিক কোম্পানির শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিলো সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন। বিভিন্ন সময়ে এসব শিল্প প্রতিষ্ঠান দরপত্রের মাধ্যমে সরকার বিক্রি করে দেয়। নতুন মালিকানা গ্রহণ করেন। বাকি টাকা পরিশোধ করার জন্যে কিস্তি করে দেয়া হয়, কিন্তু অনেকেই কিস্তি পরিশোধ করেননি।

এই ৩৬টি প্রতিষ্ঠানের মোট দাম ধরা হয়েছিলো ৫১ কোটি ৩৮ লাখ ৪৭ হাজার ৩শ' ৭২ টাকা। আর মালিকানা হস্তান্তর করার সময় এবং পরে আদায় হয় ২৬ কোটি ৫২ লাখ ৩৯ হাজার ৪শ' ২৬ টাকা। কিন্তু অধিকাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠানের নতুন মালিক কিস্তি পরিশোধ করা থেকে বিরত থাকেন, বার বার তাগিদ দেয়া সত্ত্বেও পাওনা পরিশোধ করার ব্যাপারে এসব মালিকের তেমন কোনো তাগিদ দেখা যাচ্ছে না। এই প্রেক্ষিতে পাওনা টাকা পরিশোধে ব্যর্থ মালিকদের শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকানা ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে সরকার সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে।

অর্থনীতিতে ব্যাপক সংস্কার

আমাদের অর্থনীতির ব্যাপক সংস্কারের মূল স্তম্ভগুলোর একটি হলো সরকারি মালিকানায় শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর বেসরকারিকরণ। বিশেষ করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে লোকসানি প্রতিষ্ঠানগুলো বিক্রি করে দেয়া এবং ক্রেতা না পাওয়া গেলে বন্ধ করে দেয়া। সেবা সংস্থাগুলোর বিরাষ্ট্রীয়করণও এই কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত।

সরকারি মালিকানার শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের অর্থনীতির ওপর জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসে আছে। এদের ঋণের পরিমাণ পর্বতপ্রমাণ। আর প্রতিবছর কয়েক হাজার কোটি টাকার লোকসান সরকারকে গুণতে হচ্ছে। অনেক কল-কারখানা মান্ধাতা আমলের যন্ত্রপাতি নিয়ে ধুঁকে ধুঁকে চলছে। প্রায় সবগুলোতেই প্রয়োজনের তুলনায় কর্মচারী-কর্মকর্তার সংখ্যা অনেক বেশি। সরকারি আমলাদের আধিপাত্যের ফলে ব্যবস্থাপনাদক্ষতা নেই, শ্রমিক-কর্মচারীদের নিয়মানুবর্তিতার অভাবে উৎপাদনশীলতা নেই।

যে সব প্রতিষ্ঠান সরকারের গলায় ফাঁস হয়ে আছে সেগুলো বেসরকারি মালিকানায় দিলে

www.pathagar.com

সরকার অনেক ঝক্কি-ঝামেলা থেকে মুক্ত হতো। বিক্রি করে দিলে এককালীন হলেও সরকারের হাতে কিছু টাকা পয়সা আসতো। সবচেয়ে বড় কথা প্রতিবছর লোকসানের দায় থেকে ছাড়া পেয়ে সরকারের টাকা উন্নয়ন ও দারিদ্র্যবিমোচন কাজে লাগানো সম্ভব হতো। পৃথিবীর সকল উন্নয়নশীল দেশের অভিজ্ঞতাই সে রকম। যারা ব্যাপক বেসরকারিকরণে সফল হয়েছে, তাদের দেশে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বেড়েছে, বেকারত্ব কমেছে, শিক্ষা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার জন্যে টাকা যোগাড় করা সহজ হয়েছে। আমরা সে কাজটা করতেও যে সক্ষম হচ্ছি না।

বেসরকারিকরণ অ-জনপ্রিয়

বেসরকারিকরণে আমাদের প্রধান সমস্যাটা হচ্ছে রাজনৈতিক। সরকারের ধারণা, বেসরকারিকরণের কাজ জোরদার করা হলে বড় ধরনের রাজনৈতিক খেসারত দিতে হবে। প্রধান বিরোধী দলগুলোও মেনে নিয়েছে যে, কলকারখানা বা সেবা প্রতিষ্ঠানগুলো দক্ষ ও লাভজনকভাবে চালানো সরকারের সাধ্যের বাইরে। শুধু আমাদের দেশেই নয়, প্রতিবেশী দেশগুলোর অভিজ্ঞতাও তাই এই ধারণা পোষণ করে। অথচ পূর্ববর্তী সরকারের তরফ থেকে উদযোগ নিয়ে সংস্কার নীতির ব্যাপারে বিরোধী দলের সঙ্গে মতৈক্য গড়ে তোলার কোন চেষ্টাই করা হয়নি। নির্বাচনের বছরের সরকারি দল নিজেও এধরনের 'অ-জনপ্রিয়' কর্মসূচীর পক্ষে মুখ খুলতে নারাজ। তাই রাজনৈতিক দিক থেকে বেসরকারিকরণের সপক্ষে বলার মত লোক পাওয়া অত্যন্ত দূরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তথাপি দেশের অর্থনৈতিক বাস্তবতা সবার জানা দরকার। রাজনীতি ছাড়া যেমন দেশ চলে না, তেমনি মাপা যায় এমন অর্থনৈতিক উন্নয়ন দেখাতে না পারলে দেশে গণতান্ত্রিক রাজনীতিও সফল হবে না।

বেসরকারিকরণ যে আটকে গেছে, তার কারণ কাঠামোগত নয়। সর্বোচ্চ তত্ত্বাবধানে প্রাইভেটাইজেশন বোর্ড রয়েছে। নীতিগত দিক দিয়ে সদিচ্ছাও হয়তো আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো প্রস্তুতিও আছে। কিন্তু রাজনৈতিক বাস্তবতা গত কয়েক বছর ধরে এই কর্মসূচীকে পঙ্গু করে রেখেছে। আমাদের রাজনৈতিক পরিবেশে বেসরকারিকরণকে রাজনৈতিক ইস্যু করে ফেললে ফল উল্টো হতে পারে। তাই প্রয়োজন হচ্ছে- রাজনৈতিক নেতাদের অর্থনৈতিক বাস্তবতা উপলব্ধি করা এবং অর্থনৈতিক সংস্কারে সাহসী ভূমিকা পালন করা। ❑

** বাংলাবাজার পত্রিকা-এ জুন ২২, ১৯৯৬-এ প্রকাশিত।*

www.pathagar.com

সংস্কার কর্মসূচির স্থবিরতা দূর করা আবশ্যক

বিশ্বব্যাংকের আবাসিক মিশন প্রধান পিয়েরে ল্যান্ডেল-মিলস সম্প্রতি উল্লেখ করেন, উদারীকরণ, বিনিয়ন্ত্রণ, বিরাষ্ট্রীয়করণসহ সরকারের গৃহীত বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নে বর্তমানে স্থবিরতা বিরাজ করছে। এটা কাঙ্ক্ষিত নয় এবং বর্তমান অবস্থা দেশটির ক্ষতি করছে এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতি নিশ্চিতকরাসহ বাংলাদেশের বৃহত্তর স্বার্থে অসমাপ্ত সংস্কার কর্মসূচিসমূহ এগিয়ে নিতে হবে। এজন্যে একটি ব্যাপকভিত্তিক ঐকমত্য অত্যন্ত জরুরীভাবে আবশ্যক। এছাড়া তিনি আরো উল্লেখ করেন, ১৯৯৪-৯৫ অর্থবছরে বিশ্বব্যাংক বিশ্বব্যাপী ২২ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার ঋণ প্রদান করেছে। এই সময়ে শীর্ষ দল ঋণ গ্রহণকারী দেশ হচ্ছে- চীন (২২৯ কোটি ৯৫ লাখ ডলার), মেক্সিকো (২৩৮ কোটি ৭৪ লাখ ডলার), ভারত (২০৬ কোটি ৩৫ লাখ ডলার), রাশিয়া (১৪৭ কোটি ১৩ লাখ ডলার), আর্জেন্টিনা (১৪২ কোটি ৫০ লাখ ডলার), ইন্দোনেশিয়া (১৪১ কোটি ৭০ লাখ ডলার), পাকিস্তান (৭০ কোটি ৬০ লাখ ডলার), ইউক্রেইন (৬৪ কোটি ডলার) এবং থাইল্যান্ড (৫১ কোটি ৩১ লাখ ডলার)।

বিশ্বব্যাংক দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্য হিসেবে 'মাইক্রো ক্রেডিট ফান্ড' নামে ২০ কোটি ডলারের একটি তহবিল গঠন করছে। এটি পরিচালনার জন্যে কনসালটেটিভ গ্রুপ টু এসিস্ট দি পুওরেস্ট (সিজিএপি) গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশ মাইক্রোক্রেডিটের ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করছে। কেননা, বিভিন্ন প্রকল্পে সার্বিকভাবে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে মাইক্রোক্রেডিট হিসেবে ১২ কোটি ডলার দেবে।

ঋণ সরবরাহের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে মানব উন্নয়নকে অগ্রাধিকার প্রদান করে শ্রমবাজার, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, এনজিওদের ভূমিকা, কৃষিউন্নয়ন সম্পর্কিত প্রকল্পসমূহে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে।

বাংলাদেশে শ্রমবাজার, কর্মসংস্থান ও আয়, শিল্প-খাত, সরকারি-খাত ব্যবস্থাপনা, সরকারি ব্যয়ের উপর বিশ্বব্যাংক কয়েকটি সমীক্ষা চালাচ্ছে এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনার বিষয়ে পকিল্পনা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সংলাপে অংশ নিয়েছে।

উন্নয়ন একটি দীর্ঘমেয়াদী বিষয়। অন্যদিকে প্রকৃতিগত কারণেই রাজনীতি একটি স্বল্পমেয়াদী বিষয়। বিশ্বব্যাংক সব সময়ে দীর্ঘমেয়াদী বিষয় নিয়ে এগিয়ে যেতেই অত্যন্ত আগ্রহী। কেননা, বাংলাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জসমূহ ও সুযোগের একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিপ্রেক্ষিত রয়েছে। বিশ্বব্যাপী বেসরকারি-খাতের ভূমিকায় বিশ্বব্যাংক সন্তুষ্ট। বাংলাদেশেও এক্ষেত্রে গত পাঁচ বছরে অনেকে উদারনীতি গ্রহণ করা হয়েছে। জ্বালানি-খাত বেসরকারি উদ্যোক্তাদের জন্যে উন্মুক্ত করা হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোও আজ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের বিপক্ষে। বেসরকারি-খাতই এখন এখানকার প্রবৃদ্ধির ইঞ্জিন।

www.pathagar.com

বিভিন্ন উদারনীতির ক্ষেত্রেও বেসরকারি-খাত যথেষ্ট ভালভাবে সাড়া দিচ্ছে। এ সত্ত্বেও কিছু কিছু বাধা রয়ে গেছে, সংস্কার কর্মসূচি অনেক ক্ষেত্রে অসমাপ্ত রয়ে গেছে। দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগে আকৃষ্ট করতে হলে এই বাধাসমূহ দূর করতে হবে এবং সম্পন্ন করতে হবে অবকাঠামোর উন্নয়নও।

বিদ্যুৎ সরবরাহ, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, বন্দর উন্নয়ন, আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে কাস্টমস ব্যবস্থা, আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা আরো সুবিধাজনক পর্যায়ে উন্নীত করা আবশ্যক। এক্ষেত্রে বেসরকারি-খাত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। বেসরকারি-খাতের বিনিয়োগ সম্পৃক্ত করার জন্যে এধরনের বহু সুযোগ বাংলাদেশে রয়েছে।

পাট-খাত সমন্বয় কর্মসূচি প্রকল্পে ঋণ সরবরাহ বন্ধের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়, এই কর্মসূচির অধীনে কিছু সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়নি বলে বিশ্বব্যাংক এক্ষেত্রে ঋণ সরবরাহ বন্ধ রেখেছে। কিছু মিল বন্ধ এবং কিছু বেসরকারিকরণ না করলে এই খাত লাভজনক হবে না। যদিও এগুলো করা হয়নি। তাই এ পরিস্থিতিতে ঋণ ছাড় দেয়ার কোনো যুক্তি নেই।

বাংলাদেশের অর্থনীতি স্থবির হয়ে নেই, বরং সংস্কার কর্মসূচি স্থবির হয়ে আছে। যদিও সংস্কারের বিষয়ে সকল রাজনৈতিক দলের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে। অথচ অনেক ক্ষেত্রে সংস্কার কর্মসূচি সরকার বাস্তবায়ন করছে না- এই ভয়ে যে, অন্যান্য রাজনৈতিক দলসমূহ একে সরকারের দূর্বলতা বলে ব্যবহার করবে। কিন্তু সবদলের ম্যানিফেস্টোতে সংস্কারের সমর্থন রয়েছে। তাছাড়া দলগুলো এও মনে করে যে, বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্যে সংস্কার অত্যন্ত জরুরী। আর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কখনো এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেননি, এবং সংস্কার কর্মসূচি, রাজনৈতিক বিতর্কের জন্যে সক্রিয় কোন বিষয়েও নয়। এটা বিশ্বাস করা কষ্টকর, কোন রাজনৈতিক দল চাইবে না যে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত থাকুক, বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা অনুন্নত থাকুক। তাই সংস্কার না হওয়ার বিষয়টির প্রতি জাতীয় স্বার্থের দিকে খেয়াল রেখে সকল রাজনৈতিক দলের নজর দেয়ার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত আবশ্যক হিসেবে বিবেচিত।

নদীর মাঝে থামা যায় না

এমসিসিআই আয়োজিত এক আলোচনা সভায় (২৬ জুলাই, '৯৫) অর্থমন্ত্রী উল্লেখ করেন, 'আগামী নির্বাচনে কি হবে জানিনা। অর্থমন্ত্রীর দায়িত্বটি হয়তো ছাড়তে হবে। সেক্ষেত্রে সামগ্রিক একটি হতাশা নিয়েই দায়িত্ব ছাড়তে হবে। কারণ যে সব সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করেছি, তার অনেকগুলোই শেষ করা সম্ভব হয়নি।' (ভোরের কাগজ: ২৭ জুলাই '৯৫)

এই প্রসঙ্গে তিনি আরো উল্লেখ করেন, ভবিষ্যতে যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক না কেন, সংস্কার কর্মসূচি তাকে সমাপ্ত করতেই হবে। কারণ নদীর মাঝপথে গিয়ে থেমে থাকা যায় না। আর অর্ধ সমাপ্ত সংস্কার ভালোর চেয়ে ক্ষতি করে বেশি। রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের লোকসান কমানো, আইন কাঠামোকে যুযোপযোগী করা, ব্যাংকিং খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে

www.pathagar.com

আনা- এই সকল বিষয়ে গভীর হতাশা ব্যক্ত করে তিনি উল্লেখ করেন, সংস্কার কর্মসূচি পৃথিবীর সর্বত্রই বাধার সম্মুখীন। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। তাছাড়া বিরাষ্ট্রীয়করণ কর্মসূচিকে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি রাজনৈতিক চাপ এবং সামাজিক অনিশ্চয়তা সৃষ্টির আশঙ্কা থেকে। কেননা, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃবৃন্দ সভা-সেমিনারে গিয়ে বিরাষ্ট্রীয়করণের কথা বলেন। কিন্তু সরকার এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে গেলে সর্বাগ্রে বিরোধিতা আসে তাদের কাছ থেকেই। তাই রাজনৈতিক ঐকমত্য ও সমঝোতা ছাড়া রাষ্ট্রীয়করণ কর্মসূচি অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের বিপুল পরিমাণ লোকসান হজম করা কঠিন। কিন্তু বাস্তবতা হলো, সরকারকে বছরের পর বছর তা হজম করতে হচ্ছে। রাজনীতি যদি অর্থনীতির ভাষা না বোঝে তবে সেই রাজনীতি অর্থহীন, তা জনগণের কোন কল্যাণ বয়ে আনে না।

রাজনৈতিক চাপ নেই, এমন কিছু ক্ষেত্রেও দুঃখজনকভাবে সংস্কার কর্মসূচি সম্পন্ন করা যায়নি। এক্ষেত্রে বিভিন্ন আইনগত সংস্কার কর্মসূচি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেননা, আইনগত সংস্কার কর্মসূচি নিয়ে ব্যবসায়ীরা হতাশার মধ্যে বিরাজ করছে। ব্যাংকিং সেক্টর সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করা হলেও অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। এমনকি অর্থমন্ত্রণালয়েও অনেক সংস্কার কর্মসূচি সম্পন্ন করা যায়নি।

জাতির প্রয়োজনে সংস্কার উদযোগ

অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে আনার লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯৯১-৯২ সালে বাংলাদেশে আর্থিক-খাত সংস্কারের উদযোগ নেয়া হয়। একটি দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং আর্থিক নীতিমালা ও তার প্রয়োগ হচ্ছে ঐতিহাসিক শক্তির বহুমুখীনতার উপাদান। একটি দেশে এই শক্তি দীর্ঘ সময়ের জন্যে কার্যকর থাকে এবং বিশ্বের কোথাও বড় ধরনের আর্থিক সংস্কার প্রায়শই বড় ধরনের পরিবর্তনের দিকে যায় না। জাতির বিশেষ প্রয়োজনের সময়ই এধরনের সংস্কার উদযোগ নেয়া হয়। আর এই চাহিদার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত থাকে:

১. সরকারের অর্পিত বর্ধিত দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়ে ওঠার জন্যে সরকারের রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করা,
২. অর্থনীতির সামগ্রিক উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি-খাতের পারস্পরিক সম্পর্ক ও অবস্থানে পরিবর্তন,
৩. সমাজে আয় বন্টনের অবস্থার উন্নয়নকরণ।

এসকল উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে ১৯৯১ সালে গৃহীত আর্থিক সংস্কারের কর্মসূচির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সুদীর্ঘ সময়ের পুরানো এবং জটিল বিপণন করের বিপরীতে মূল্য সংযোজন কর তথা ভ্যাট প্রথার প্রতিস্থাপন। আর্থিক সংস্কারের অপর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, আমদানি-রফতানি শুল্ক কাঠামোকে সরলীকরণ এবং উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাসকরণ।

বিশ্ব প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ এবং আন্তর্জাতিক বাজারের উপযোগী করে দেশজ

www.pathagar.com

অর্থনীতিকে গড়ে তোলার জন্যে আমদানি-রফতানিকে এতোটা উদার করা হয়েছে যে, রফতানির ওপর বাহ্যতঃ কোন করারোপ করা হয়নি। অন্যদিকে, নামমাত্র কর ধার্যের মাধ্যমে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী ট্যারিফ ব্যবস্থাকে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে এবং আমদানির ওপর শতকরা ১৫ ভাগ ভ্যাট আরোপিত রাখা হয়েছে। এসকল পদক্ষেপের মূল উদ্দেশ্যই ছিলো দেশের শিল্প ও বাণিজ্য-খাতকে উৎসাহিত করা।

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ১৯৯১ সালের আর্থিক-খাত সংস্কার কর্মসূচির বাস্তবায়ন আয় বন্টন ব্যবস্থার কোনো উন্নয়ন সাধন করবে না, বরং ক্ষতিগ্রস্ত করবে। কেননা, ভ্যাট প্রয়োগের ফলে যদিও সরকারের রাজস্ব আয়ের পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পাবে কিন্তু প্রত্যক্ষ করের অবস্থার তেমন কোন পরিবর্তন হবে না। বেসরকারি-প্রতিষ্ঠানের কর্মদক্ষতা, দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের আনুপাতিক হার, বৈদেশিক পুঁজির প্রবাহ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এতোই নৈরাজ্যজনক ছিল যে, ত্বরান্বিত টেকসই উন্নয়নের জন্যে প্রাপ্ত বিনিয়োগ আকর্ষণে আর্থিক সুবিধাভোগে বিনিয়োগকারীরা কতোটা সফল হবে তা নিয়েও সংশয় থেকে যায়।

তাই এসকল অবস্থার বিচারে বলা যেতে পারে, ১৯৯০-৯১ সালের আর্থিক সংস্কার কর্মসূচি সাধারণ মানুষের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারেনি। সংস্কারের সবচেয়ে মারাত্মক প্রভাব পড়বে কর্মসংস্থান ব্যবস্থার ওপর। এতে করে কর্মসংস্থানের সুযোগ ব্যাপকভাবে হ্রাস পাবে। স্থবির বেসরকারিখাত কর্তৃক আর্থনীতিক কর্মকান্ড থেকে সরকারি-খাতের তৎপরতা ক্রম প্রতিস্থাপন ইতোমধ্যে দেশের অর্থনৈতিক বিপদ ডেকে এনেছে। যদি সরকারের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির এবং আয় নীতিমালা পরিবর্তিত না হয়। তাহলে অর্থনীতি ব্যাপক মজ্জার মধ্যে পতিত হবে, যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া হয়ে উঠবে অসাধ্য।

উদারিকরণ ও বেসরকারি-খাত

বেসরকারি-খাতের প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে একটি কাঠামো বিনির্মাণের জন্যে সম্প্রতি যে উদারিকরণ প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে, অর্থনৈতিক খাত সংস্কার কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হলো তা দৃঢ় এবং ব্যাপক করা। এই সকল সংস্কার কার্যক্রমের ফলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে অর্থনৈতিক দক্ষতার সমাবেশ ঘটে। বৈদেশিক মুদ্রার বাজার এবং বাণিজ্য ব্যবস্থায়ও পরিবর্তন ঘটে। অর্থনৈতিক সংস্কার বেসরকারি বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়ে থাকে।

উদাররিকরণ ও বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিকরণ বর্তমান সংস্কার কার্যক্রমের একটি অন্যতম নিদর্শনহিসেবে বিবেচিত। নিয়ন্ত্রিত এবং ব্যাপক সরকারি কর্মকান্ডের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তে বাংলাদেশ এখন সম্পূর্ণ বাজারভিত্তিক অর্থনীতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বেসরকারি-খাতের নেয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যদি কার্যক্রম চালানো হয় তাহলে বিনিয়োগ এবং সঞ্চয়, দক্ষতা এবং টিকে থাকার সামর্থ অর্জিত হয়। অর্থনৈতিক সংস্কারকে সফলভাবে কার্যকর করার জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংককে শক্তিশালী করা অত্যন্ত আবশ্যক

www.pathagar.com

হিসেবে বিবেচিত। এই ব্যাংকের মাধ্যমে কঠোর শৃঙ্খলা বিধান করে ঋণ সংগ্রহে চাপ সৃষ্টি এবং খেলাপী গ্রাহকরা যাতে আরো ঋণ নিতে না পারে তার ব্যবস্থা করা হয়। ঋণ খেলাপীদের সম্পর্কে তথ্য দেয়ার জন্যে একটি ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো প্রতিষ্ঠাসহ অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। অর্থনৈতিক-খাতগুলোকে পূর্ণ কার্যক্ষম রাখার জন্যে আর্থিক ব্যবস্থায় এই সংস্কার কার্যক্রম অব্যাহত রাখা অত্যন্ত জরুরী হিসেবে বিবেচিত।

নীতি ও বাস্তবায়নে পার্থক্য

বাংলাদেশে মুক্তবাজার অর্থনীতির লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সংস্কারমূলক কর্মকান্ড অব্যাহত রয়েছে। শিল্প ও বাণিজ্য সর্বাধিক উদার করা হয়েছে। সরকার বেসরকারী-খাতকে ক্রমাগত প্রাধান্য দিয়ে রফতানিবাহিত উন্নয়ন কৌশলকে প্রবৃদ্ধির কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছে। কিন্তু সবসময়েই অব্যাহত থাকছে প্রণীত সুন্দর সুন্দর নীতি ও বাস্তবায়নের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য। যদিও এই ধরনের নীতিমালা বাস্তবায়ন করে প্রতিবেশী দেশ ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও নেপালসহ এশিয়ার এই অঞ্চলের প্রতিটি দেশই বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধিতে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। আর সঞ্চয়ে এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে তাদের মাথাপিছু আয়ও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছে।

দেশে মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রক্রিয়া চলছে বিগত চার বছর ধরে। এ বিষয়ে সরকারের বিশেষজ্ঞ মহল মনে করেন, এর ফলে ম্যাক্রোইকোনমির সূচকসমূহ মুদ্রাস্ফীতি, আর্থিক ঘাটতি চলতি হিসাবের ভারসাম্য এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বর্তমানে অনুকূলে রয়েছে। অন্যদিকে সরকারের বাইরের অভিজ্ঞমহল মনে করেন, অর্থনীতির এসকল সুবিধা উন্নতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান এবং ব্যাপক জনগোষ্ঠী তথা সীমিত আয়ের মানুষের আয় বৃদ্ধিতে কোনো অবদানই রাখতে পারেনি। বর্তমানে মুক্তবাজার অর্থনীতির আওতায় অবাধ আমদানির সুবাদে বিদেশী পণ্যসামগ্রী ব্যবহারের প্রবণতা যেভাবে বাড়ছে, তাতে আগামী একদশকে দেশবাসীর জন্যে কি পরিমাণ অভিসম্পাত হয়ে দাঁড়াবে তা ভেবে দেখার অবকাশে রয়েছে।

ভারত, পাকিস্তান, তাইওয়ান, থাইল্যান্ডে উৎপাদিত যে সকল পণ্যে বাংলাদেশ সয়লাব হয়ে আছে এই অবাধ আমদানির সুবাদে, এ সকল পন্য এখানে উৎপাদনের একটা অবকাঠামো গড়ে উঠেছিলো গত একদেড় যুগের অক্লান্ত প্রচেষ্টায়। কিন্তু উৎপাদন খাতের সেই অবকাঠামো মুক্তবাজারের ধাক্কায় তিলে তিলে রাহুগ্রস্ত হচ্ছে, আর ধ্বংস হচ্ছে প্রতিটি শিল্পখাত। কেননা, আমাদানিকৃত অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মার খাচ্ছে দেশীয় পণ্য। আগে যে বিদেশী পণ্য আমদানি হয়নি, তা নয়। এদেশে অনেক পণ্য আমদানী হতো যা তখন দেশেও উৎপন্ন হতো। কিন্তু তখনকার সময়ে আমদানিকৃত পণ্যের বেলায় শুল্কায়নের বিষয়টি এতই সূক্ষ্মভাবে নির্ধারণ করা হতো, যাতে আমদানিকৃত পণ্য দেশীয় পণ্যের ওপর কোনো প্রকার প্রভাব বিস্তার করতে না পারে।

www.pathagar.com

কিন্তু মুক্তবাজার অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। বিদেশী পণ্যের অবাধ আমদানি অবারিত করা হয়েছে অত্যন্ত স্বাভাবিক বা নামমাত্র শুল্কের বিনিময়ে। অন্যদিকে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত শিল্পের কাঁচামাল আমদানির বেলায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমদানি শুল্কের হার প্রতি বাজেটে বাড়ানো হচ্ছে অথবা বর্ধিত হারের শুল্কে আমদানি করা কাঁচামাল দিয়ে পণ্য উৎপাদনের পর এই পণ্য আমাদনি করা বিদেশী পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না। এছাড়া কথায় কথায় বিশ্বব্যাংকসহ দাতাগোষ্ঠীর খবরদারির কথাতো খোদ অর্থমন্ত্রীর মুখেও প্রায়ই উচ্চারিত হয়ে থাকে এবং অন্যান্য মহল থেকেও বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও এডিবি সহ দাতাগোষ্ঠীর কড়াকড়ি শর্তারোপের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। বরং আমরা যেন অসহায় বোধ করছি। বর্তমানে দেশে উৎপাদন ও অবাধ আমদানির ক্ষেত্রে যে অবস্থা বিরাজ করছে, তা দেশকে যে একটি অনুৎপাদনশীল ক্ষেত্রে পরিণত করে ক্রমান্বয়ে ভয়াবহ অর্থনীতির দিকে ধাবিত করছে তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। একথাটি সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারকদের গুরুত্বের সঙ্গে অনুধাবনের দাবি রাখে। আর একই সঙ্গে শিল্পায়নে সরকারের শিল্পনীতি বিশেষ করে ব্যাংকের হয়রানি ও জটিলতার বেড়াজাল নিরসনেও জরুরী ভিত্তিতে একটি কার্যকর নীতিমালা প্রণয়নের আবশ্যকতা অনুভূত হচ্ছে।

সংস্কার আধাআধি ক্ষতিকর

আমাদের কারো পক্ষেই অস্বীকার করার অবকাশ নেই যে, সংস্কার কর্মসূচিতে আদৌ হাত না দেয়ার চেয়ে খারাপ পরিস্থিতি একটিই হতে পারে, তা হচ্ছে- সংস্কারকে আধাআধি অবস্থায় ফেলে রাখা। সরকার আইন সংস্কারের কাজ বহু আগেই শুরু করেছেন। আজ চার বছর অতিবাহিত হবার পর ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এক আলোচনাকালে অর্থমন্ত্রী উল্লেখ করেন, এর গতি অত্যন্ত মন্থর এবং আমাদের আইন-কানুনের ধারা অত্যন্ত শ্লথ ও হতাশাব্যঞ্জক। এর ফলে অনেক উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে বলে অর্থমন্ত্রী স্বয়ং স্বীকার করেন। কিছুদিন আগে জাপানী বিনিয়োগকারীদের তরফ থেকে বলা হয়, বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থা জাপানী বিনিয়োগের অন্যতম বড় অন্তরায়। আর বিশ্বব্যাংকের তরফ থেকে গত ক'বছর ধরে আইন সংস্কারের তাগাদা দেয়া হচ্ছে। একাজে তারা 'কারিগরি সাহায্য'ও অব্যাহত রেখেছেন। দেশের সকল খাতে আইন-কানুনের আমূল সংস্কারের চাপ আসছে সব দিক থেকে এবং এই সংস্কারের অপেক্ষায় অনেক কিছুই আটকে যাচ্ছে।

অর্থমন্ত্রী একথাও বলেছেন, আইন ব্যবস্থার সংস্কার করা না হলে কোন বিদেশী বিনিয়োগকারী এদেশে বিনিয়োগ করতে আসবে না। যদিও গত চার বছরে এদেশে আইনের কোনো উল্লেখযোগ্য সংস্কার হয়নি। তথাপি সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে ও মহল থেকে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের ডাকাডাকি করা হচ্ছে।

সম্প্রতি একটি বেসরকারি ব্যবসায়ী দলও ইউরোপ-আমেরিকায় যেয়ে বিনিযোগকারীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বাংলাদেশে বিনিয়োগের সুযোগ গ্রহণের জন্যে। কিন্তু আইন-

www.pathagar.com

কানুনের ব্যাপারে অর্থমন্ত্রীর ডায়েগনসিস যদি সত্যিই হয়, তবে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের ডাকাডাকি করাতো পণ্ডশ্রম।

অর্থমন্ত্রী স্বভাবত বলে থাকেন, বাংলাদেশে এখন বিদেশী বিনিয়োগের চমৎকার পরিবেশ আছে। কিন্তু এখন আবার তিনি বলছেন, আইন সংস্কার না হলে কেউ আসবে না। বিদেশী বিনিয়োগকারীরা যদি বাংলাদেশের 'ম্যাক্রো অর্থনীতি'র মাহাত্ম্য বুঝতে না পেরে ঢাকা ভ্রমণ করেই চলে যান, কিংবা পুরানো বিনিয়োগকারীরা ব্যবসা গুটিয়ে নেন, তবে তাদের আর দোষ দেয়ার অবকাশ থাকছে না।

বর্তমান সরকারের আয়ুষ্কালে এদেশে আইনের সংস্কার হবে বলে নিশ্চিতভাবে প্রত্যাশা করা যায় না। কমিশন গঠন একটি অতি পরিচিত ও প্রাথমিক পদক্ষেপ। তারপর কতগুলো কমিটির কততম বৈঠকে এই কমিশনের রিপোর্ট বিচেনা করবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। প্রশাসনিক সংস্কার নিয়ে কি হচ্ছে, তা এ ধরনের কাজের বাস্তব প্রমাণ বলা যায়।

সরকারের কর্মকান্ডে স্বচ্ছতার অভাবের অন্যতম কারণ দেশের আইন-কানুনের অস্বচ্ছতা। ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন কোম্পানি আইন, অর্থঋণ ও খেলাপী ঋণ সংক্রান্ত আইন সবকিছুই যেন তালগোল পাকিয়ে আছে। দেশ ও জাতির অগ্রগতি ও কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে এসকল বিষয়ে জরুরীভিত্তিতে যথাযথ ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যন্ত আবশ্যক হিসেবে বিবেচিত। ❑

** সংবাদ-এ আগস্ট ২০, ১৯৯৫-এ প্রকাশিত।*

www.pathagar.com

এডিবি'র নীতিনির্ভর ঋণ উন্নয়নে সহায়ক হবে কি?

এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর বেসরকারী খাত বিষয়ক পরিচালক মিঃ একুশম্যান মে, বেসরকারী খাতকে দক্ষ এবং সক্ষম করে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে অক্টোবর '৯২-এ বাংলাদেশ সফরকালে উল্লেখ করেছেন, বাংলাদেশের জাতীয় উৎপাদনে উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণে বেসরকারী উদ্যোক্তাদের (Private Investors) বিপুল উৎসাহ রয়েছে এবং এ দেশের উন্নয়নে বেসরকারী খাত অভূতপূর্ব, অনন্য ভূমিকা রাখতে পারে।

এই প্রেক্ষিতে তিনি বস্ত্রশিল্পে উদ্যোক্তাদের হতোদ্যম করার বাংলাদেশের নীতি-নির্ধারকদের ধারণার বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন। কেননা, এ দেশের কম মূল্যের কঠোর পরিশ্রমী এবং গতিশীল উদ্যোমী শ্রমশক্তির সঙ্গে উন্নত প্রযুক্তির আধুনিক সমন্বয় হলে বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বাজারেও বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম সেরা বস্ত্র উৎপাদনকারী দেশ হতে পারে। এছাড়া তিনি এ দেশের পুঁজিবাজার সম্ভাব্যতাকে আশাব্যঞ্জক বলে অভিহিত করে উল্লেখ করেন, পুঁজি বাজার হিসেবে বাংলাদেশ কেবল নিজেকে পরিচিত করছে। এর কার্যকারিতা থেকে বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রবাহ সৃষ্টি হওয়া পর্যন্ত বেশ নাজুক এবং প্রতিকূল সময় অতিক্রম করতে হবে। বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রাভিত্তিক বড় প্রকল্প বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে পারছে না, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার অভাবের কারণে। কেননা, বাংলাদেশের সদ্য শিল্পায়ন উদযোগী দেশে প্রাথমিক অবস্থায় এ ধরনের সরকারী নিরাপত্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় বিনিয়োগকারীদের অধিক হারে একের পর এক বিভিন্ন প্রকল্পে যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত পুঁজি পাচারের হাত থেকে বৈদেশিক বিনিয়োগকে নিরাপত্তা প্রদানের ব্যবস্থা থাকা অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়।

বেসরকারী পর্যায়ে এডিবি-র সহায়তা

বর্তমানে বাংলাদেশে ২ কোটি মার্কিন ডলার ইকুইটি মূল্যের পদ্মা টেক্সাইল মিলস লিঃ, ইউনাইটেড লিজিং কোম্পানী এবং কাদের সিনথেটিক টেক্সটাইল মিলস লিমিটেডে এডিবি'র বেসরকারী পর্যায়ে অর্থ সহায়তা রয়েছে। এর মধ্যে প্রথম দু'টির ব্যবসায়িক অগ্রগতি আশাতীত সফলতা পরিলক্ষিত হয়। এবং কাদের সিনথেটিকের প্রকল্প বাস্তবায়নে বেসরকারী ব্যবস্থাপনা সন্তোষজনকভাবে দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে। আগামী বছর এর উৎপাদন শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এতোমধ্যে দেশের বেশ কিছুসংখ্যক ভালো উদ্যোক্তা নতুন প্রকল্পের জন্য এডিবি-র কাছে উৎসাহ নিয়ে যোগাযোগ করছে। তাই আগামী বছর আরো তিনটি বেসরকারী প্রকল্পে তাদের অর্থায়ন হতে পারে বলে আভাস পাওয়া যায়। বাংলাদেশে এডিবি-র 'নীতিনির্ভর ঋণ খুবই সফল হয়েছে। এর উদাহরণ হিসেবে সারের ওপর ভূর্তুকি প্রত্যাহারের নীতি প্রসংগে

www.pathagar.com

উল্লেখ করা হয় যে, খাদ্যশস্য খাতের ঋণে এ ধরনের নীতি-নির্ধারণের আন্তবায়ন বাংলাদেশে নেতিবাচক ফল আসেনি। সারের ওপর সরকারী ভর্তুকি প্রত্যাহারের প্রক্রিয়ায় খাদ্য উৎপাদন মোটেও হ্রাস পায়নি। বরং এ দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ ও বিদ্যুৎ খাতে বিপুল পরিমাণে নতুন বিনিয়োগের প্রয়োজন রয়েছে। বেসরকারী পর্যায়ে নতুন বিনিয়োগের সুযোগ দেয়ার কথা বলা হচ্ছে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধির স্বার্থ বিবেচনা করে। তাদের মতে, এ ধরনের ক্ষেত্রে বেসরকারী এবং যৌথ বিনিয়োগ পেতে হলে দেশের আইনগত ও নীতিগত কাঠামোতে মৌলিক পরিবর্তন আনতে হবে। বিশেষ করে টেলিযোগাযোগ বা বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্টন ও ব্যবসায়ে সরকারের একটি প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণাধিকার দিয়ে প্রচলিত যে আইন রয়েছে তার সংস্কার করে ব্যক্তি বা বেসরারী প্রতিষ্ঠানের সুযোগ রেখে আইন করার বাঞ্ছনীয়তা দেখা দিয়েছে। এ সঙ্গে অনিয়মের শাস্তির বিধান প্রবর্তন করার অবকাশ থাকতে হবে।

ভৌত অবকাঠামো বিনির্মাণ, বিদ্যুৎ প্লান্ট স্থাপন, বিদ্যুৎ বন্টন এবং অন্যান্য সেবা-সহায়তা প্রদানের মতো বড় বড় প্রকল্পের ক্ষেত্রে এ দেশের বেসরকারী খাতের অবদান রাখার মতো যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এগুলোকে সরকারী নিয়ন্ত্রমুক্ত থাকা অত্যন্ত জরুরী।

এশিয়ায় উন্নয়নের হাওয়া

এডিবি-এর একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা সম্প্রতি উল্লেখ করেন, এশিয়ায় যদিও অর্থনৈতিক উন্নতির উন্মেষের হাওয়া কিছু অঞ্চলে লেগেছে, তথাপি এ অংশ বিশ্বের অধিকাংশই দারিদ্র্যের আওতাভুক্ত হওয়াতে এখনও এই এলাকায় উন্নয়ন সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। পূর্ব ইউরোপ ও প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে প্রতিযোগিতামূলক ঋণের চাহিদা থাকাতে এই অঞ্চলের জন্য 'অফিসিয়াল ডেভেলেপমেন্ট এ্যাসিসন্ট্যান্ট' (ODA) সংকুচিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তথাপি দাতারা এশিয়ার জন্য তাদের সমর্থন অব্যাহত রাখার অংগীকারের কথা পুনঃব্যক্ত করেছে। এশিয়ার দেশসমূহের জন্য যে (Capital) মূলধনের প্রয়োজন তার পরিমাণ বেশ ব্যাপক এবং এদের সমস্যার ব্যাপ্তিও অনেক বিস্তৃত। দরিদ্র দেশসমূহের উন্নয়নের সহায়তামূলক মূলধনের বাঞ্ছনীয়তা রয়েছে, কিন্তু ওডিএ-তে সীমাবদ্ধতা এসে গেলে তাদের উন্নয়ন প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়াই স্বাভাবিক। কেননা, বিশ্বের সত্তর শতাংশের অধিক দরিদ্র এশিয়ায় বাস করে, আবার যার অর্ধেকের অবস্থান দক্ষিণ এশিয়াতে- 'উইলিয়াম থমসন', ভাইস-প্রেসিডেন্টে, এডিবি, ম্যানিলা হেডকোয়ার্টার-এ অভিমত ব্যক্ত করেন। এশিয়ার দুইটি প্রতিচ্ছবি রয়েছে, একটি হচ্ছে করুণ দারিদ্র্যের। সাফল্যের কাহিনীর অংশীদারিত্বের দাবিদার হংকং, কোরিয়া, সিংগাপুর ও তাইওয়ান। যাদের জিডিপি (GDP) ১৯৯০ সনের ৬.৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯১ সনে ৭.৬ শতাংশ উন্নীত হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা ও বাংলাদেশের অবস্থান রয়েছে, যাদের GDP-এর অবস্থান গত বছরে পৌঁছে

www.pathagar.com

২.৭ শতাংশে এবং ১৯৯০-এ ছিলো ৫.৫ শতাংশ, যা এই অঞ্চলে অত্যন্ত নিম্নহারের।

এশিয়ার নব্য শিল্পোন্নত দেশসমূহের বাণিজ্যিক ঋণের বাজারে প্রবেশাধিকার রয়েছে, তথাপি কিছুসংখ্যক কোনো বিশেষ ঋণ প্রদানীয় নয়। এ ক্ষেত্রে প্রাইভেট ক্যাপিটাল-এর বৃহৎ সম্ভার সংকুলানের ক্ষেত্রে ক্যাটালিস্টের ভূমিকায় এডিবি ও বিশ্বব্যাংকের অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আরো ব্যাপকভাবে অনুভূত হচ্ছে।

এডিবি ১৯৯১-এ তার উন্নয়নশীল সদস্য দেশসমূহের মধ্যে ৫ বিলিয়ন ডলার ঋণ ও বিনিয়োগের অর্থ অগ্রবর্তী করছে, যা ১৯৯০-এর পরিমাণ ৪ বিলিয়ন ডলারের ওপর ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি হিসেবে দেখা যায়। এই ঋণের মধ্যে সর্বাধিক ৩৫ শতাংশ দেয়া হয়েছে শক্তি (Energy) খাতে। এর পরবর্তী পর্যায়ে রয়েছে কৃষি ও কৃষি-ভিত্তিক শিল্পের অনুকূলে- যার পরিমাণ হচ্ছে ২০ শতাংশ।

ঘাটতি বাজেট ও বাস্তবসম্মত বিনিময় হার

রাষ্ট্রীয় 'ম্যাক্রো ইকোনমিক পলিসিতে' স্বল্প পরিসরের ঘাটতি বাজেট এবং বাস্তবসম্মত বিনিময় হার অন্তর্ভূক্তকরণই হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান সহায়ক শক্তি। অক্টোবর'৯২-এ ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত এডিবি-এর সম্মেলনে এই ধারণা ব্যাপ্তি লাভ করে।

সিউল ও তাইপেই-এর সরকার তাদের অর্থনৈতিক প্রান্তরে ব্যাপক খবরদারি করছেন, তথাপি যে সকল স্থানে স্বল্প বাজেট ঘাটতি ও বাস্তবসম্মমত বিনিময় হার ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন ম্যাক্রো ইকোনিমক পলিসির বিদ্ধমানতা রয়েছে, যা তাদের অগ্রগতির পথে ধাবমানের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করছে। কেননা, ব্যাপক দক্ষ ম্যাক্রো ইকোনমিক নীতিসমূহ বৃহৎ ও বর্ধিষ্ণু অসামঞ্জস্য আর্থিক অবস্থা সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান করে থাকে। এ ধরনের নীতি যদিও স্বলমেয়াদী প্রবৃদ্ধি প্রদান করতে পারে, কিন্তু এর স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে ব্যাপক অনিশ্চয়তা রয়েছে। আবার আমদানি, শিল্পনীতি ও অধিক সমতারভিত্তিতে অনেক ক্ষেত্রে আয় বিভাজনে ব্যর্থতায় পর্যবস্তি হয়ে থাকে এবং যার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই দরিদ্র শ্রেণী এর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। উন্নয়নশীল দেশসমূহে গৃহীত দরিদ্রতর সহায়তামূলক নীতিসমূহ এদের ভাগ্য পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয় না।

এডিবি-এর কর্ম প্রক্রিয়া

এডিবি-এর আর্থিক সম্পদ অর্ডিনারি ক্যাপিটাল রিসোর্স (OCR), যা গ্রাহকদের মূলধন রিজার্ভ-এর সহযোগে গঠিত হয়ে থাকে এবং বিশেষ ফান্ড সদস্যভূক্ত দেশসমূহের চাঁদার মাধ্যমে গঠিত হয়ে থাকে। ব্যাংক-এর ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ওসিআর অথবা বিশেষ ফান্ড এর সহায়তা নিয়ে থাকে। ওসিআর থেকে প্রদানকৃত লোন যা ব্যাংকের ঋণের ৬৬ শতাংশ অংশ হিসেবে পরিগণিত এবং এটা সাধারণত অত্যন্ত হ্রাসকৃত হারে উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য দেয়া হয়। ব্যাংক তিনটি বিশেষ ধরনের ফান্ডের সহায়তা প্রদান করে

www.pathagar.com

থাকে-

(১) এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (ADF),

(২) টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্ট স্পেশাল ফান্ড (TASF),

(৩) জাপান স্পেশাল ফান (JSF)।

যে সকল দেশের (সদস্য) নিম্ন পার কেপিটাল জিএনপি ও ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত, তাদের জন্য এডিএফ-এর আওতায় ঋণ কর্মসূচী গৃহীত হয়ে থাকে। ডিসেম্বর '৯১ পর্যন্ত ব্যাংক ১২.৪১ বিলিয়ন ডলার এডিএফ-এর আওতায় অনুমোদন দান করেছে। টিএএসএফ ব্যাংকের কারিগরি ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তামূলক একটি অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ অনুদান প্রদানমূলক উৎস হিসেবে পরিগণিত। ব্যাংক ৩১ ডিসেম্বর '৯১ পর্যন্ত সহায়তামূলক ঋণ ও অনুদান হিসেবে ২.৭ বিলিয়ন ডলার অনুমোদন প্রদান করেছে। জেএসএফ জাপান ব্যাংকের সঙ্গে এক চুক্তির আওতায় গ্লোবাল পরিবর্তনের ধারায় বিনিয়োগ সুযোগ বৃদ্ধির জন্য উন্নয়নশীল দেশসমূহকে সহায়তা প্রদানের জন্য ১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ৩১ ডিসেম্বর '৯১ পর্যন্ত জাপান সরকার জেএসএফ-এর জন্য ১৯৯৮ মিলিয়ন ডলার প্রদান করেছে। ব্যাংকের ঋণ কর্মকান্ড বিশেষতঃ সাধারণ ও বিশেষ প্রকল্প সম্পাদনের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়ে থাকে। এই দুই ধরনের ফান্ডই সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে গৃহীত ব্যাংকের ঋণের প্রকল্পসমূহে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

এডিবি থেকে উন্নয়নে সহায়তামূলক প্রকল্পের বিপরীতেই কেবল ঋণের সহায়তা প্রদান করা হয়। ব্যাংকের ঋণ প্রদানের কার্যক্রম উন্নয়নশীল সদস্য দেশসমূহের স্বল্প মেয়াদী ও মাঝারী মেয়াদী উন্নয়ন সহায়ক ও প্রথাগত প্রকল্পে বিস্তৃত থাকে। ব্যাংক দেশ এবং প্রকল্পসমূহ-এর ঋণ কার্যক্রম সাধারণ মূলধন, সম্পদ এবং এডিএফ থেকে প্রদান করে থাকে। এই সকল সহায়তা উন্নয়নশীল দেশসমূহের প্রতি দেয়া হয়, যারা প্রান্তিকভাবে হ্রাসকৃত বিশেষ আওতায় ঋণ পাওয়ার যোগ্য।

এডিবি'র বাংলাদেশ সেক্টর ভিত্তিক ঋণ
(৩১ আগস্ট'৯২ পর্যন্ত)

সেক্টর	ঋণের সংখ্যা	পরিমাণ (ইউএস মিলি ডলার)	শতকরা হার
কৃষি/কৃষি বিষয়ক শিল্প	৪৮	১,৫৮১.৩৪	৪৩.৪
জ্বালানি শক্তি	১৫	৭৭৮.৩৫	২১.৩
সামাজিক অবকাঠামো	১৪	৪৯১.৭৫	১৩.৫
যানবাহন ও যোগাযোগ	১০	৪৩৫.১০	১১.৯
শিল্প/জ্বালানি খনিজ	৭	২২৫.৫০	৬.১
আর্থিক	৭	১৩৭.৬০	৩.৮
মোট	১০১	৩৬৪৬.৬৪	১০০.০০

www.pathagar.com

দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী

কৃষি ঋণ ও দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীর নয় কোটি ডলার ঋণ প্রদানের বিষয়টি এডিবি স্থগিত রেখেছে। কৃষি ঋণ মওকুফ-এর কারণে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে জানা যায়। পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণ মওকুফের বিষয়টি দাতা সংস্থাসমূহ নেতিবাচক দৃষ্টিতে বিচার করছে। এরা মনে করেন, এই মওকুফের ফলে পরবর্তীতে যদি ঋণ দেয়া হয়, সে ঋণগ্রহীতারাও কিস্তি পরিশোধ না করে মওকুফের আশায় বসে থাকবে। দাতারা বলেন, এই মওকুফে প্রকৃত কৃষকদের কতটুকু উপকার হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। কৃষি ঋণ খাতে যত সাহায্যই দেয়া হোক না কেন, সে অর্থ ফেরত আসার সম্ভাবনা নেই। এদিকে কৃষি ঋণ মওকুফের কারণে ব্যাংকগুলোকে প্রভূত ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। চলতি বছর মওকুফকৃত ঋণের মধ্যে ৮শ' কোটি টাকা ব্যাংকগুলোকে দেয়ার বিষয় সরকার চিন্তা ভাবনা করছে। কিন্তু বিভিন্ন ব্যাংকের সূত্র এ পরিমাণকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলে আখ্যায়িত করেছে। পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণ মওকুফের আওতায় গত অক্টোবর '৯১ পর্যন্ত এ পরিমাণ সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকায় পৌছেছে।

ঋণ মওকুফে দুর্নীতিবাজরা লাভবান

দাতা দেশ ও সংস্থা প্রথম হতেই এ মুওকুফের বিরোধী ছিলো। এরা বর্তমানে এ ঋণ মওকুফে ব্যাংক এবং প্রকৃত কৃষকের কতটুকু উপকার পেয়েছে, সরকারের কাছে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট তথ্য জানতে চেয়েছে। কেননা, দাতাদের সন্দেহ- এই ঋণ মওকুফের ফলে এক শ্রেণীর স্থানীয় টাউট ও দূর্নীতিবাজ কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ লাভবান হয়েছে। দাতাদের এ ধরনের অভিযোগের মুখে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কয়েকটি টিম বিভিন্ন ব্যাংকের কৃষি ঋণ মওকুফ কর্মকান্ড তদন্ত করছে। কৃষি ঋণ ও মওকুফের সুনির্দিষ্ট তথ্যের ক্ষেত্রে দাতাদের অনঢ় মনোভাবের কোনো পরিবর্তন হয়নি। ঋণ মওকুফের টাকা সরকার ব্যাংকগুলোর সঙ্গে কিভাবে সমন্বয় করছে তারা তাও জানতে চেয়েছে। দাতাদের সাহায্য ছাড়া সরকারের পক্ষে কৃষি ঋণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ দুরূহ হয়ে পড়বে। সরকার তাই দাতাদের চাহিদা মত তথ্য সরবরাহ কাজে গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং সে লক্ষ্যেই পদক্ষেপ নিচ্ছেন। সংশ্লিস্ট একটি সূত্র অবহিত করে, বাংলাদেশ ব্যাংকের তদন্ত রিপোর্ট পাবার পর সরকারের কৃষিঋণ খাতে সৃষ্ট অচলাবস্থা দূর হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এর ভিত্তিতে এডিবি-এর কৃষি ঋণ খাতে সাড়ে ৬ কোটি ডলার সাহায্য ও দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীতে আড়াই কোটি ডলার ঋণ প্রদানের কথা রয়েছে।

বৈদেশিক নির্ভরতা হ্রাসের প্রচেষ্টা

চলতি অর্থ বছর থেকে বাংলাদেশে বৈদেশিক খাদ্য সাহায্য শতকরা ৩১ ভাগ হ্রাস পাবে। এবার বিদেশ থেকে সর্বোচ্চ ৪ লাখ ১৩ হাজার মেট্রিক টন গম সাহায্য খাতে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সরকার গম খাতে ঘাটতি মিটানোর জন্যে ইতোমধ্যে নগদ

www.pathagar.com

বাণিজ্যিক খাতে ও বেসরকারী খাতে গম আমাদানির উদযোগ গ্রহণ করেছেন। এছাড়া সাড়ে ৪ লাখ মেট্রিক টন উদ্বৃত্ত চাউল আন্তর্জাতিক বাজারে বিনিময় বা বিক্রি করা গেলে দেশের মোট গম ঘাটতির প্রায় অর্ধেক পরিমাণ গম সংগ্রহ করা যাবে।

গত ক'বছর ধরে বাংলাদেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন মোটামুটি ভাল থাকার ফলেই এটা সম্ভব হচ্ছে। তাই আশা করা যায়, বৈদেশিক খাদ্য সাহায্য ব্যাপকভাবে হ্রাস পেলেও তা দেশের খাদ্য পরিস্থিতিতে তেমন কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারবে না। এর মাধ্যমে আজ এই সত্যই উদ্ভাসিত হয়েছে যে, আমরা যদি আত্মশক্তির উদ্বোধনের মাধ্যমে জাতীয় উৎপাদন খাতকে আরো চলিষ্ণু করতে পারি, তাহলে আজকের বৈদেশিক নির্ভরতা অবশ্যই বহুলাংশে হ্রাস পাবে। আর তা করতে ব্যর্থ হলে, সত্যিকার আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসাবে আমরা কখনই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবো না। তাই বৈদেশিক নির্ভরতা হ্রাস করার জন্য প্রয়োজন প্রাপ্ত বৈদেশিক সহায়তাকে উৎপাদন খাতে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহারে নিয়োজিত করা। এর কোনো বিকল্প নেই বলেই এ ব্যাপারে গভীর মনোযোগ এবং আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার প্রমাণ রাখা অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় হয়ে দেখা দিয়েছে। ❑

** খবর-এ মার্চ ১৭, ১৯৯৩-এ প্রকাশিত।*

www.pathagar.com

গ্যাট কি শোষণের হাতিয়ার

শেষ মুহূর্তে শ্বাসরুদ্ধকর আলোচনা, দর কষাকষি, প্রবল উত্তেজনার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হলো উরুগুয়ে রাউন্ডের আলোচনা। আর একই সাথে গত ১৫ ডিসেম্বর '৯৩ পিটার সুদ্যারল্যাণ্ড, 'গ্যাট' (GATT) এর মহাপরিচালক, বিশ্বের তথাকথিত সবচেয়ে উচ্চাকাঙ্খী বাণিজ্য চুক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন করেন। সুদ্যারল্যাণ্ডের ভাষায় ৭ বছরব্যাপী দীর্ঘ আলোচনার ফল এই চুক্তি 'গ্যাট' বা 'জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ট্যারিফ এ্যান্ড বিশ্বের বাণিজ্য, চাকরির সুযোগ ও আয়ের হারকে বাড়িয়ে দেবে। গ্যাট এই চুক্তিটির লক্ষ্য সমগ্র বিশ্বের বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে শুল্কের হার গড়ে ৩৩ শতাংশ কমিয়ে ও নতুন বাজার সৃষ্টি করে বিশ্ব অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তোলা। ১৯৯৫ সালের ১ জানুয়ারী থেকে এটি কার্যকর হতে যাচ্ছে। এই চুক্তি স্বাক্ষর আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে কতটা প্রভাব ফেলবে বা আদৌ ফেলবে কি-না সে বিষয়ে আলোকপাত করার অবকাশ রয়েছে বলে অনুমিত হচ্ছে।

বর্তমান শতাব্দীর বিশ্ব অর্থনীতিতে 'গ্যাট' বহুল আলোচিত একটি প্রসংগ। বিশেষ করে '৯০ এর দশকে এসে বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পতন শুরু হলে গ্যাট বা উরুগুয়ে আলোচনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। গ্যাট আলোচনার মূল কথাই হচ্ছে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উদার ও বাধা বন্ধনহীন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। শিল্প, ব্যবসায় বাণিজ্য, মানবাধিকারসহ সকল ক্ষেত্রে একই রকম এবং উদ্ধার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। বাণিজ্য ক্ষেত্রে বিদ্যমান করের হার সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনা এবং দ্বৈত কর ব্যবস্থা রহিত করা। মোটকথা, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সকল ধরনের সংরক্ষণবাদ তিরোহিত করাই গ্যাটের মূল উদ্দেশ্য।

একটি স্বাধীন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যেমন অবাধে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সম্পাদিত হয়ে থাকে গ্যাটভুক্ত দেশগুলোর মাঝেও তেমনিভাবে সম্পাদিত হবে। চূড়ান্ত পর্যায়ের গ্যাট আলোচনা শুরু হয় ১৯৮৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উরুগুয়েতে। আর তাই এটা উরুগুয়ে রাউন্ড গ্যাট আলোচনা নামে সর্বাধিক পরিচিত। দীর্ঘপথ পরিক্রমার পর গ্যাট আলোচনা বর্তমান পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে গ্যাট আলোচনা শুরু হয়। বর্তমান শতাব্দীর ত্রিশের দশকে বিভিন্ন দেশে বিদ্যমান উচ্চ শুল্ক হার বিশ্বব্যাপী ভয়াবহ মন্দার সৃষ্টি করে। এ অবস্থার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সে জন্য ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে কয়েকটি দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংগঠন বা আইটিও (ITO) গঠনের লক্ষ্যে আলাপ আলোচনা করতে থাকে। সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, আইটিও বাণিজ্যের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় বাণিজ্য ক্ষেত্রে সরকারী প্রতিবন্ধকতা হ্রাস, যুযোগযোগী শ্রমনীতি প্রণয়ন, মুজুরি ও বাণিজ্য শুল্ক প্রভৃতি দেখা শোনা করবে। পরবর্তীতে আইটিও কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে গ্যাট-এ রূপান্তরিত হয়।

www.pathagar.com

গ্যাট-এর অগ্রগতি ধারা

গ্যাট অবশ্য প্রথম প্রণীত হয় বা কিছুটা হলেও বাস্তবায়িত হয় ১৯৪৮ সালে। এই চুক্তিতে শুল্ক হ্রাস করা ছাড়াও সর্বাধিক সুবিধাপ্রাপ্ত দেশের মর্যাদা ও জাতীয় আচরণ নির্ধারণের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরপর ১৯৪৯ থেকে ১৯৬২ সালের মধ্যে আরো চার দফা গ্যাট আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬৭ সালে শেষ হওয়া গ্যাট আলোচনার কেনেডী রাউন্ডে বেশ কিছু ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়। এতে পণ্যভিত্তিক শুল্ক হ্রাসের পরিবর্তে সকল পণ্যের জন্যে সামগ্রিক শুল্ক হ্রাসের পরিবর্তে সকল পন্যের জন্য সামগ্রিক শুল্ক হ্রাসের কথা বলা হয়। শিল্পজাত পন্যের ওপর শুল্কহার প্রায় ৩৫ শতাংশ হ্রাস করা হয়। এতে উৎপাদন ব্যয়ের চেয়ে কম মূল্যে বিদেশে পণ্য বিক্রি সম্পর্কে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৭৯ সালে ৬ বছর আলোচনার ফলশ্রুতিতে স্বাক্ষরিত টোকিও রাউন্ড চুক্তিতে ১২ হাজার ৬শ' কোটি ডলার বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পুনরায় শুল্ক হ্রাস করা হয়। মোট ৯৯টি উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ এতে অংশগ্রহণ করে। এতে বেশ কিছু আচরণবিধি প্রণয়ন করা হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে শিল্পজাত পণ্যের ওপর রপ্তানি ভূর্তকির ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করা। এছাড়া উন্নয়নশীল দেশগুলোর বাণিজ্যিক অগ্রাধিকার সম্প্রসারিত করা হয়।

১৯৮৬ সালে উরুগুয়েতে শুরু হয় গ্যাট আলোচনার চূড়ান্ত পর্যায়। উরুগুয়ে আলোচনার প্রধান লক্ষ্য ছিলো গ্যাটকে অবিলম্বে কার্যকর করার চূড়ান্ত ব্যবস্থা করা। বর্তমানে গ্যাটের সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১শ' ১৭তে, এছাড়া আরো ২৩টি দেশ গ্যাটের নিয়মাবলি মেনে চলছে। এরা ইতোমধ্যে বাণিজ্য শুল্ক হ্রাস করতে শুরু করেছে। কৃষি পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ভর্তুকি প্রদানের ফলে অধিকাংশ উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশের কৃষি পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে মার খাওয়া প্রতিনিয়ত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থা তাদের এক সাম্প্রতিক সমীক্ষায় বলেছে, সংরক্ষণবাদ বর্তমান পর্যায়ের মতো অপরিবর্তিত রেখেও যদি 'ডুঙ্কেল খড়সা' অনুয়ায়ী গ্যাট পরিপুর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা যায়, তাহলে ২০০২ সালে বিশ্বব্যাপী আয় বর্তমান মুল্যে ২৭ হাজার ৪শ' কোটি ডলারে বৃদ্ধি পাবে যার ৮ হাজার ৬শ' কোটি ডলারই হবে উন্নয়নশীল দেশে।

১৯৪৬ সালে 'ব্রেটন উড' চুক্তি সম্পাদনের ফলশ্রুতিতে জেনেভাভিত্তিক এই বিশ্ব বাণিজ্য ও শুল্ক সংস্থার উদ্ভব ঘটে। সাম্প্রতিক সম্পাদিত 'গ্যাট চুক্তি'কে পর্যবেক্ষক মহল 'প্যাকেজ ডিল' বলে মনে করেন। কেননা, সামগ্রিকভাবে বৈষম্য বিমোচন ও শুল্ক প্রতিবন্ধকতা প্রত্যাহারের অংগীকার নিয়েই এই চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষরকারী বহুজাতিক প্রতিনিধিবৃন্দ আশা প্রকাশ করে উল্লেখ করেন, এই সমঝোতার ফলে বছরে ২শ' মিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য বাড়বে।

ম্যাসট্রিখট চুক্তি

ইউরোপীয় ঐক্যের সম্মতিজ্ঞাপক 'ম্যাসটিখট চুক্তি' ইউরোপের একেকটি দেশে একক

www.pathagar.com

রকম সমর্থন লাভ করে। খোদ ফ্রান্সেই চুক্তি পাস করা নিয়ে জন্ম হয় অচলবস্থার। আঞ্চলিক ঐক্যের যেখানে ব্যাপক বা নিরঙ্কুশ জনসমর্থন থেকে বঞ্চিত হয়, সেখানে আপন জাতিগত বা জাতিগোষ্ঠীগত স্বার্থের সাথে আপোষ করে শুল্ক বিমুক্ত অবাধ বিশ্ব বাণিজ্যের উদ্যোগ নিষ্কন্টক হবে না এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় গোষ্ঠীর মধ্যে বাণিজ্য যুদ্ধের পর্যায়েই চলে যাচ্ছিলো। এক পর্যায়ে যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় রফতানী পণ্যের ওপর ২শ' ভাগ শাস্তিমূলক শুল্ক আরোপের হুমকি দেয়া। ফলে অধিকতর বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যেই তড়িঘড়ি করে ইউরোপীয় গোষ্ঠী চুক্তিতে উপনীত হয়। কৃষি ভর্তুকি সম্পর্কিত এই ট্রান্স আটলান্টিক সমঝোতা গ্যাট আলোচনায় নেতিবাচক প্রভাব রেখেছে বলেই অনুমিত হয়। কিন্তু বিপদের মুখ থেকে ফিরে আসার ব্যাকুলতা ও যুক্তিযুক্ত বন্ধন বিমুক্তির রাজনৈতিক সদিচ্ছার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে।

বহুজাতিক বাণিজ্য ও স্বার্থ সংঘাত

অবশ্য এটা বোঝা দরকার যে, বহুজাতিক বাণিজ্য আলোচনায় বড় শক্তিগুলোর অবস্থান ও লক্ষ্য অনেক সময় নিজেদের মাঝে সংঘাতের সৃষ্টি করে। যেমন, যুক্তরাষ্ট্র চায় ইউরোপীয় সম্প্রদায়, বিশেষত ফ্রান্স কিছু কৃষিজাত পণ্য (খাদ্যশস্য ও তেল বীজ)-এর ওপর হতে ভর্তুকি তুলে নিক। অন্যদিকে ফ্রান্সের মত হলো ভর্তুকি তুলে দিলে তবে উৎপাদকরা প্রতিযোগিতামূলক খাদ্যশস্য ও তেল বীজসহ অন্যান্য কিছু পণ্য রপ্তানী করতে পারবে না। যুক্তরাষ্ট্র জাপানকে বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি মোটর গাড়ি ও অন্যান্য জিনিসের আমদানী বাড়াতে। জাপানকে চাল আমদানী করার চাপ দেয়া হচ্ছে। অন্যদিকে জাপান অভিযুক্ত করছে ইউরোপীয় গোষ্ঠীকে এই বলে যে, ইসি'র (EC) বর্তমান অবস্থানই উরুগুয়ে রাউন্ড করার পথে প্রধান প্রতিবন্ধক। দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসি'র মাঝে অনেক বিষয়ে গুরুতর মতভেদ রয়েছে। জাপান বলছে, আগে এই দুই বাণিজ্য শক্তি নিজেদের মতৈক্যে আসুক। তারপর জাপান নিজে নতুন উদ্যোগ নিবে। সে আরো বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রের দেয়া সুবিধাগুলোর মধ্যে আগের চেয়ে বেশি সুবিধার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না।

উরুগুয়ে রাউন্ডে আলোচ্য বিষয়ের মাঝে যুক্তরাষ্ট্র কতগুলো নতুন বিষয় উত্থাপন করেছে। তা হচ্ছে সার্ভিসেস বা সেবা জাতীয় ক্ষেত্রে বাণিজ্য (ট্যুরিজমসহ) ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অধিকারের বাণিজ্য সম্পৃক্ত বিনিয়োগ ব্যবস্থাবলি এবং হাইটেক বা উচ্চ প্রযুক্তিগত বাণিজ্য।

অন্যদিকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অবস্থান হলো বোনা কাপড়ের ও পোশাকের বাণিজ্যে আরো উদারনীতিকরণ, বিষুবীয় এলাকার পণ্যের বাণিজ্যের অবাধকরণ এবং উন্নয়নশীল দেশের উৎপাদিত পণ্যের প্রতি স্বতন্ত্র ও বিশেষ আচরণ প্রদর্শন করা। আর বলাবাহুল্য অনেক উন্নয়নশীল দেশ এখন তাদের নিজস্ব অর্থনীতিতে কাঠামোগত ব্যাপক পরিবর্তন ঘটানোর প্রক্রিয়ায় ব্যস্ত। প্রাইভেটাইজেশন ও উদারনীতিকরণ এর মধ্যে অন্যতম।

www.pathagar.com

আমাদের সুফলের সম্ভাবনা কতটুকু

বর্তমান গ্যাট নিয়ে সারা বিশ্বের অর্থনৈতিক মহলে যে আলোচনা চলছে এটা আমাদের জন্য কি সুফল বয়ে আনবে সে ব্যাপারে সঙ্গতকারণে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। কেননা, গ্যাটের প্রকৃতির মাঝেই লুকিয়ে রয়েছে এর সুফল বা কুফল। এক কাথায় বলা যায় গ্যাট বাস্তবায়নের পর স্বল্প শুল্কে অবাধ বাণিজ্য ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে আমাদের মতো দেশগুলোর বাজার বিদেশী পণ্যে ভরে যাবে। নিধারুণভাবে ব্যাহত হবে শিল্প বিকাশ। আর এর পুর্বে সুযোগ লাভ করবে শিল্পোন্নত দেশসমূহ। এরা তাদের উৎপাদিত পণ্য বিশ্বব্যাপী বাজারজাতকরণের ব্যাপক সুবিধা পাবে।

এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, জাপানী ইলেক্ট্রনিক্স দ্রব্য অবাধে বাংলাদেশে প্রবেশের অনুমতি পেলে বাংলাদেশে নিজস্ব ইলেক্ট্রনিক্স শিল্প কখনোই বিকাশ লাভ করতে পারবে না। অন্যদিকে জনশক্তি অবাধে যাতায়াতের সুযোগ পেলে আমাদের মতো দরিদ্র দেশগুলোতে পেশাজীবীদের বেকার হয়ে পড়ার আশংকা থাকবে। বিশ্বব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরিতে অবাধ ও তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হবে। ফলে এ থেকে অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশগুলো ষোলআনা ফায়দা তুলে নিতে পারলেও দরিদ্র দেশগুলো নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

সম্প্রতি এশিয়া প্যাসিফিক ইকনমিক কো-আপারেশন বা অ্যাপেক (APEC) গঠিত হয়েছে। এতে পৃথিবীর প্রধান প্রধান শিল্পোন্নত দেশ অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এদের অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে তুলনা করলেই বুঝতে পারবো, আমরা অর্থনৈতিক দূরবস্থার কোন পর্যায়ে রয়েছি।

অ্যাপেকভূক্ত দেশসমূহের অর্থনৈতিক সুচক

দেশের নাম	জনসংখ্যা (কোটিতে)	মাথাপিছু আয় (মার্কিন ডলারে)	জিডিপিবৃদ্ধির হার	বার্ষিক রপ্তানী (বিলিয়ন ডলারে)
চীন	১১৮.৪৪	৩৮৫	১৩.০০	৮৮.৮০
হংকন	.৫৯	১৬৮.৭৫	৫.৩০	১২৮.০০
সিঙ্গাপুর	.৩১	১৬.২০০	১০.১০	৭২.০০
জাপান	১২.৯০	৩৬.৬১৫	২.০০	৩৫৪.০০
তাইয়ান	২.০৯	৯.৮০৫	৬.২০	৮৬.৬০
থাইল্যণ্ড	৫.৯২	১.৯০৫	৭.৪০	৩৩.২০
ইন্দোনেশিয়া	১৮.৯০	৬৪৫	৫.৮০	৩৩.৯০
দক্ষিণ কোরিয়া	৪.৪২	৬.৭৪০	৪.৩০	৭৯.০০
মালয়েশিয়া	১.৮৯	৩.১১৫	১০.৪০	৪৩.৫৩
যুক্তরাষ্ট্র	২৫.৭৩	২৪.০৭৫	২.৮০	৪৪৮.০০
নিউজিল্যান্ড	.৩৫	১১.৫০০	২.৯০	১০.১০
কানাডা	২.৭৮	১৮.৫২৫	৩৫০	১৩৪.০০
ফিলিপাইন	৬.৪৪	৮.০৫	১.৭০	১০.০০
ব্রুনাই	০.০৩	১৭.৫০০	৩.০০	২.৬০
অষ্ট্রেলিয়া	১.৭৮	১৪.৮৭০	৩.৩০	৪২.৮০

www.pathagar.com

উপরোক্ত চিত্র থেকে খুব সহজেই অনুমিত হচ্ছে, অ্যাপেকভুক্ত দেশগুলোর সার্বিক অর্থনীতি কত মজবুত। গ্যাটের প্রভাবে এ সকল দেশগুলোই বিশ্ব অর্থনীতিতে নেতৃত্ব দেবে। তাই এদের সাথে খোলা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হলে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশসমূহের অবস্থা কেমন হবে তা সহজেই বোধগম্য। ট্রাকের চেসিজে জেট বিমানের ইঞ্জিন সংযোজন করলে যে অবস্থা হয়, আমাদেরও সে অবস্থা হওয়ার সম্ভাবনাই প্রকট। আর এদের সাথে প্রতিযোগিতা করতে গেলে প্রতি মুহূর্তে আমাদের মুখ থুবড়ে পড়তে হবে। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশসহ সার্কভুক্ত দেশসমূহের অর্থনৈতিক সুচকের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যেতে পারে।

'সার্ক' দেশসমূহের অর্থনৈতিক সূচক

দেশের নাম	জনসংখ্যা কোটি	মাথাপিছু বার্ষিক আয় (মার্কিন ডলার)	বয়স্ক শিক্ষার হার(%) গ্রহণের হার (%)	দৈনিক চাহিদার তুলনায় ক্যালরী (জিডিপির %)	সামরিক খাতে
বাংলাদেশ	১২.৪০	২১০	৩৫	৮৮	১.৬
পাকিস্তান	১২.৩৪	৪০০	৩৫	৯৯	৬.৬
ভারত	৮৮.৭৭	৩৬০	৪৮	১০১	৩.৩
শ্রীলংকা	১.৭৭	৪৭০	৮৮	১০১	৪.৮
নেপাল	২.০৫	১৮০	২৬	১০০	৪.৮
ভূটান	.১৪	১৯০	৩৮	১২৮	তথ্য পাওয়া যায়নি।
মালদ্বীপ	.০২	৪৫০	৫৫	৮০	তথ্য পাওয়া যায়নি।

সূত্র: ইউএনডিপি এবং বিশ্বব্যাংকের রিপোর্ট ১৯৯৩ থেকে

'অ্যাপেক'ভুক্ত দেশসমূহের সাথে সার্কভুক্ত দেশগুলোর অর্থনৈতিক সুচকসমূহের তুলনামূলক বিচার-বিবেচনা করলে সহজেই আমাদের আর্থিক দীনতা ধরা পড়বে। আর একথা নির্দ্বিধায় এবং একশ' ভাগ নিশ্চিত করে বলা চলে যে, 'গ্যাট'-এর নেতৃত্বদানকারী দেশগুলোর সাথে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ তথা সার্কভুক্ত দেশগুলোর টিকে থাকা খুবই অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়াবে। যদিও উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির নানা প্রলোভন দেখানো হচ্ছে, কিন্তু তা সত্বেও নিশ্চিত হবার কোনো অবকাশ নেই। যত কিছুই বলা হোক না কেন, 'গ্যাট' হচ্ছে উন্নত দেশ কর্তৃক দরিদ্র ও অনুন্নত দেশগুলোকে শোষণ করারই একটি আইনানুগ কৌশল মাত্র।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের রীতি

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সাধারণতঃ তিন ধরনের রীতি অনুসৃত হয়ে থাকেঃ

(ক) উদার ও খোলাবাজার নীতি

(খ) সং রক্ষণবাদ এবং

(গ) মিশ্র নীতি।

www.pathagar.com

উদার ও খোলাবাজার নীতি বলতে আমরা অনেকটা নিয়ন্ত্রণমুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থাকে বুঝে থাকি অর্থাৎ যেখানে বাণিজ্য ব্যবস্থা চাহিদা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, সরকারী নিয়ন্ত্রণ থাকবে সর্বনিম্ন পর্যায়ে।

সংরক্ষণবাদ বলতে বুঝি নিয়ন্ত্রণমুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থা, যেখানে সরকার বাণিজ্য ব্যবস্থা তথা রপ্তানি এবং আমদানীকে নিজে নিয়ন্ত্রণ করে। চাহিদা নয়, সরকারী নীতিমালাই এখানে প্রাধান্য পাবে।

মিশ্র নীতি বলতে আমরা সেই নীতিকে বুঝতে পারি, যেখানে রপ্তানিকে সরকারীভাবেই বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রদান করা হবে। আবার অন্যদিকে আমদানীকে সাংঘাতিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কি ধরনের পণ্য, কি পরিমাণে আমদানী করা হবে, তা নির্ধারণ করে দেবে সরকারই। এটা করা হয় সাধারণতঃ দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে নিজেদের অনুকূলে রাখার জন্যে। আমাদের মতো দরিদ্র দেশের জন্য মিশ্র বাণিজ্য নীতিই সবচেয়ে বেশি উপযোগী বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

আমাদের বর্তমান অবস্থান

স্বাধীনতা উত্তর ২৩ বছরে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭০ হাজার কোটি টাকারও বেশি। বর্তমান সরকার দাতা দেশ ও সংস্থাসমূহের চাপে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ আনেকাংশে তুলে নিয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে দেশ আজ বিদেশী, বিশেষ করে ভারতীয় পণ্যে ছেয়ে যাচ্ছে। যা রপ্তানি হচ্ছে, তার চেয়ে ২/৩ গুণ বেশি আমদানী করা হচ্ছে, ফলে বিদ্যমান বাণিজ্য ঘাটতি কমার পরিবর্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর তাই সাম্প্রতিক নজির থেকে প্রতীয়মান হয়েছে যে, আমাদের জন্য খোলাবাজার ও উদার বাণিজ্য নীতি উপযোগী নয়। শিল্পোন্নত দেশগুলোর সমপর্যায়ে না এসে উদার বাণিজ্যনীতি অনুসরণ করা হলে তা হবে আমাদের আত্মহত্যারই নামান্তর।

এশীয় দেশের সমঝোতা আবশ্যক

গ্যাটের আওতায় বর্তমান চুক্তির পর কেউ কেউ বলছেন, এশীয় দেশগুলোর নিজেদের মধ্যে সমঝোতায় আসা উচিত, যাতে তারা ভবিষ্যতে উত্তরের উন্নত দেশগুলোর সাথে কথা বলতে পারে শক্তির অবস্থান থেকে যাঁরা এ প্রস্তাব দিচ্ছেন। তাঁরা এশীয় দেশগুলোর মাঝে জাপান, পূর্ব এশীয় দেশগুলোর উপস্থিতি ও তার সাথে এশিয়ার বিরাট আয়তনের কথা মনে রেখেই যে বলেছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর এটা যদি সম্ভব হয়, তাহলে দক্ষিণের সব দেশ না হোক, এশীয় দেশগুলোর যে সুবিধা হবে তা সহজেই অনুমেয়।

চীন থেকে শুরু করে বাংলাদেশ বা সাহারা অঞ্চলের দেশগুলো পর্যন্ত সবাই উন্নয়নশীল দেশের তালিকাভুক্ত হলেও সবার অবস্থান বা স্বার্থ যে এক নয়, তা বলাইবাহুল্য। আর জোটবদ্ধতার বিষয়টি স্বার্থ ছাড়া হয় না। একটা সময় ছিল, যখন অর্থনৈতিক প্রশ্নকেও

www.pathagar.com

ছাপিয়ে উঠতো অনেক সময়ে। বর্তমানে দিনকাল অনেক পাল্টেছে। আর সে দৃষ্টিকোণ থেকেই বর্তমানে জোটবদ্ধতার পেছনে অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রশ্ন অনেক বেশি সক্রিয়। ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠনের পেছনে অন্য সব কারণের সাথে অর্থনৈতিক প্রশ্নটি একটি বড় উপাদান হিসেবে যে কাজ করেছে তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

উরুগুয়ে রাউন্ডের সমাপ্তিতে যে চুক্তি সম্পাদিত হলো তাতে তো বাংলাদেশের খুব বেশি কিছু পাবার নেই। কারণ অত্যন্ত সহজ। কেননা, রপ্তানিযোগ্য পণ্য আমাদের তেমন কিছু নেই। তৈরি পোশাক দিয়ে বেশি দূর এগোনো যাবে না। আর জনশক্তি রপ্তানির বিষয়টি এই চুক্তির আওতাভুক্ত নয়। অন্যদিকে গ্যাটের আওতায় সম্পাদিত চুক্তির ফলে এমনিতেই উদার বাণিজ্য আরো উদার করার চাপ বাড়বে। অর্থনৈতিক জোটবদ্ধতার প্রশ্নে আমাদের এখানে দু'টি নাম বেশি উচ্চারিত হয়ে থাকে।
(ক) একটি দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর সাথে জোট বা সহযোগিতা।
(খ) অপরটি ইসলামিক সম্মেলনের দেশগুলোর সাথে।

'সার্ক' জোট 'সাপটা'

দক্ষিণ এশীয় বা সার্কভুক্ত দেশগুলো সমবায় অর্থনৈতিক জোটের বিষয়টি অনেক দিন থেকে নানা মহলে আলোচিত। 'সার্কভুক্ত' দেশগুলো ঘনিষ্ঠ সহযোগতিার জন্য 'সাপটা' চুক্তিও সাক্ষর করেছে। কিন্তু তা বেশি দূর অগ্রসর হয়নি। এর মূল কারণ রাজনৈতিক।

পাকিস্থানের সাথে ভারতের নানা প্রশ্নে বিরোধ, ভারতের সাথে বাংলাদেশের কতগুলো অমীমাংসিত সমস্যা ও এই সমস্যাগুলো সমাধানে ভারতের দিক থেকে সব সময় যথাযথ উদ্যোগের অভাব, নেপালের সাথে ভারতের সম্পকের ক্ষেত্রে নানা সময়ে নানা সন্দেহের সৃষ্টি। সর্বোপরি এ অঞ্চলে বৃহৎ দেশ হিসেবে ভারতের ভূমিকা সম্পর্কে শ্রীলংকা, নেপাল, বাংলাদেশের ন্যায় ক্ষুদ্র দেশগুলোর সন্দেহ অবিশ্বাস কার্যক্রর অর্থনৈতিক জোট গড়ে তোলার পথে অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে এখনো।

অথচ এই অঞ্চলের দেশগুলোর মাঝে একমাত্র পাকিস্তান ছাড়া অন্য সব দেশের ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মাঝে ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং ক্রমান্বয়ে সম্ভব হলে অর্থনৈতিক জোট গড়ে তোলাটা বর্তমান বিশ্বে এই মূহুর্তে সংশ্লিষ্ট সবার অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য অত্যন্ত জরুরী।

আমাদের জন্য যা আবশ্যক

বাংলাদেশ উন্নয়শীল দেশগুলোর একটি। সে জাতিসংঘের অধীনস্থ বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংগঠন (UNCTAD) এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান শুল্ক ও বাণিজ্য সংক্রান্ত সাধারণ চুক্তি 'গ্যাট' এর সদস্য। বাংলাদেশ উরুগুয়ে রাউন্ডে আলোচনায় শরিক হয়েছে। যেমন- সে শরিক ছিলো টোকিও রাউন্ড (১৯৭৩-৭৯) আলোচনা ও চুক্তিতে। উরুগুয়ে রাউন্ড আলোচনা ও চুক্তি পুর্ণ ফায়দা নেয়ার জন্যে প্রয়োজন বেসরকারী খাত বা ব্যবসায়ীদের এবং সরকারের সমন্বিত প্রচেষ্টার কোনো, রাউন্ডের আলোচনায় আপনা

www.pathagar.com

থেকে ফায়দা আসে না। প্রত্যেক দেশকে তার নিজের সুবিধামত এর সুযোগ নিতে হয়। এ দায়িত্ব দেশের ব্যবসায়ীগোষ্ঠী ও রপ্তানিকারকদের। তবে সরকারের সাহায্য ও সহযোগিতামূলক মূল্যে তা বিক্রির ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য আমাদের পণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন ও প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে স্থিতিশীলতা দরকার। কেবল অবাধ বাণিজ্যের দ্বার খুলে দিলেই কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে না। বরং বিনিময় ও উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্যে সরকারী ও বেসরকারী খাতের সুপারিশগুলো বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখা অত্যন্ত জারুরি হিসেবে পরিগণিত।

গ্যাট আর কিছুই নয়, দারিদ্র দেশগুলোকে শোষণ করার হাতিয়ার মাত্র। তাই আমাদের মতো দেশগুলোকে গ্যাটভুক্ত হবার সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে পুনর্বার চিন্তা করার অবকাশ রয়েছে বহুলাংশে। ❑

* *খবর-এ মার্চ ১২, ১৯৯৪-এ প্রকাশিত।*

www.pathagar.com

দারিদ্র্য থেকে সমৃদ্ধি

বাস্তবতার আলোকে উন্নয়ন মডেল

বাংলাদেশ শিল্প-বণিক সমিতি ফেডারেশন-এর সাবেক সভাপতি সালমান এফ রহমান সম্প্রত ব্যক্তি মালিকানা খাতভিত্তিক দশ বছর মেয়াদী একটি জাতীয় উন্নয়ন মডেল আমাদের দেশের জন্যে উত্থাপন করেন। যার লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে ২০০৫ সালের মধ্যে প্রবৃদ্ধির (জিডিপি) হার বর্তমানের চেয়ে দ্বিগুণ পর্যায়ে অর্থাৎ দশ শতাংশে উন্নীতকরণ। এই প্রেক্ষিতে তিনি নয় দফা নীতিমালা সম্বলিত সুপারিশ উপস্থাপন করেন, যা দেশের বাৎসরিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পরিমাণ আগামী দশকের সময়ের পরিসরে ন্যূনতমভাবে ৮ থেকে ১০ শতাংশে পৌছার ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। তিনি আবেগজড়িত ও শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে তাদের পারস্পরিক মতবিরোধ মিটিয়ে দারিদ্র্য থেকে দেশকে উন্নয়নমুখী করার আহ্বান জানিয়ে উল্লেখ করেনঃ

১. আমাদের পুনরায় একটি সুস্পষ্ট সাধারণ ঐক্য আবশ্যক যা ১৯৯১-এ সম্পন্ন হয়েছিলো। এছাড়া অত্যন্ত জরুরীভাবে প্রয়োজন রাজনৈতিক বিবাদ মেটানোর জন্যে সুস্থ বোধশক্তি সম্মন্ন নির্দেশনার,

২. দারিদ্র্যকে বিদায় জানানোর জন্যে এখনই উপযুক্ত সময় এবং একই সাথে সম্ভব সমৃদ্ধি যুগের জাহাজে আরোহণ করার,

৩. রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের জাতির নাড়ের বোদ্ধা হওয়ার মাধ্যমে জনসাধারণের আকাংখার প্রতি সাড়া দেয়ারও আবশ্যকতা রয়েছে,

৪. দেশে রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিক ও একটি গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি শিকড় গাড়ার প্রক্রিয়াধীনে এবং দেশের ধনাত্মক ভাবমূর্তি বহির্বিশ্বের বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার নিমিত্তে প্রচারের ব্যবস্থা করা বাঞ্চনীয়। যা সরকার এবং শিল্প ও বণিক নেতৃত্বের জন্য আবশ্যকীয় কর্তব্য,

৫. দেশের সাধারণ মানুষ অত্যন্ত কর্মঠ, কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃবর্গ জাতিকে দারিদ্র্যের কাছ থেকে মুক্ত করার নিমিত্তে একটি সহায়কমূলক পরিবেশ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন বলে বিরাজমান অবস্থার আলোকে অনুমিত হচ্ছে,

৬. বিদেশে অবস্থানকারীদের বাংলাদেশের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি পরিলক্ষিত হচ্ছে,

৭. সরকারী এবং ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ ও জনপ্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিনিধি দল যে সকল দেশ ভ্রমণ করে থাকেন তাদের উদ্দেশ্যে আমাদের সাফল্যের চিত্র মেলে ধরার অবকাশ তারা পান, তা কার্যকরভাবে সদ্ব্যহার করা অত্যন্ত জরুরী।

www.pathagar.com

এছাড়া তাঁর এই অর্থনৈতিক মডেলের সফলতার জন্যে গৃহীতব্য পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করেনঃ

ক. একটি উচ্চ প্রবৃদ্ধির কৌশল সংযোজন সহযোগে ব্যাপক ভিত্তিক দারিদ্র্য নিরসন কার্যক্রম গ্রহণ,

খ. কৃষি খাতে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনের প্রয়োজনীয়তা এবং শ্রমভিত্তিক রপ্তানির বেগবান গতিকে লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণকরণ। এর আওতায় দ্রব্য সামগ্রী, সেবা ও জনশক্তি যা রপ্তানিযোগ্য, তা সহযোগী শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ার আওতাভুক্ত করা একান্ত অপরিহার্য,

গ. এর মাধ্যমে বর্ধিত হারে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবার অবকাশ সৃষ্টি হবে এবং আভ্যন্তরীণ ভোগ ও উৎপাদনে সহায়তার নিমিত্তে ক্যাপিটাল গুডস আমদানির ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রার যোগান বৃদ্ধির প্রবণতা সৃষ্টি হবে, যার ফলশ্রুতিতে বিনিয়োগের মাত্রাও বৃদ্ধির সম্ভাবনা বেড়ে যাবে,

ঘ. শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বহুমুখীকরণ এবং পশু পালন ও মৎস্য খাতের কার্যক্রমে আরো ব্যাপ্তি ঘটানোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে ব্যাপকভাবে,

ঙ. কৃষি উৎপাদন এবং এর জন্য ব্যবহৃত উপাদানসমূহের মূল্য স্থিতি করার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত জরুরী,

চ. কৃষিখাতে পাঁচ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে সক্ষম বলে বিবেচিত এবং এজন্যে প্রয়োজন উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বীজ, বর্ধিত সুবজ সংস্কৃতির সমর্থন দানসহ গবেষণা ও কৃষকদের ঋণ সরবরাহের প্রসারতা ঘটানো।

শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে তিনটি অগ্রাধিকারকে কৌশল হিসেবে নেয়া যেতে পারেঃ

ক. শ্রম-ঘন উৎপাদন সামগ্রীর রফতানির দ্রুত বৃদ্ধি করা,

খ. রেডিমেড গার্মেন্টস (আরএমজি)-এর রফতানি প্রতি পাঁচ বছরে দ্বিগুণে উন্নীত করা,

গ. অভ্যন্তরীণ ও রফতানি বাজারের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে সহায়তা প্রদানের জন্য বস্ত্রখাতে ইনটেনসিভ ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ সুবিধার প্রসারতা,

ঘ. মুল্য সংযোজনের অবশ্য পালনীয় বাঁধাসমূহ দূর করার মাধ্যমে রেডিমেড গার্মেন্টস সামগ্রীর মান উন্নীত করা, যা কেবল শিল্পসমূহকে শ্বাসরুদ্ধ করে ফেলে। কাস্টমস কর্মকর্তাসহ অন্যান্যের সৃষ্ট প্রশাসনিক প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীভূত করাও অত্যন্ত জরুরী,

ঙ. বর্তমানে মানব সম্পদ রফতানির মাধ্যমে বিদেশ থেকে বৈদেশিক মুদ্রার আয় দ্বিগুণ পরিমাণে উন্নীত করার জন্যে অধিক দক্ষ জনশক্তি প্রেরণের ব্যবস্থা করা,

চ. শ্রমিক বাহিনীকে জনশক্তিতে পরিণত করতে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব

www.pathagar.com

অপরিসীম। যা বিদেশীদের প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের জন্যে আকৃষ্ট করতে সহায়ক শর্ত হিসেবে বিবেচিত এবং এর সফলতার মাধ্যমে এশীয় বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে তাদের প্ল্যান্ট পুনঃস্থাপনের জন্যে আগ্রহী করে তুলতে পারে,

ছ. স্থানীয় কারিগরি ভিত্তির ব্যাপ্তি ঘটানোর মাধ্যমে এদেশের প্রবেশ ইচ্ছুক বিদেশী বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করে তোলা যেতে পারে ,

জ. স্বল্প শ্রমিক মজুরি প্রথায় আকৃষ্ট হয়ে এশীয় বিনিয়োগকারীরা এখানে আসার ক্ষেত্রে উৎসাহী হয়ে থাকে। যার জন্য সহায়ক হিসেবে তাদের উপযুক্ত জমি, ইমারত, আধুনিক সুবিধাসম্পন্ন অবকাঠামো এবং একটি সাম্প্রতিক সময়োপযোগী আইনগত ব্যবস্থার প্রাপ্যতা অত্যন্ত আবশ্যক হিসেবে বিবেচিত,

ঝ. নিম্ন মুদ্রাস্ফীতির হার সংরক্ষণ এবং ম্যাক্রো ইকোনমিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ক্রমাগত স্থিতিশীলতা বজায় রাখা,

ট. প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে সুযোগ সন্নিবেসনের জন্যে শহরায়নসহ শিক্ষা ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধাণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে,

ঠ. বিদ্যুৎ সরবরাহ, টেলিযোগাযোগ, সামুদ্রিক বন্দর, বিমান বন্দর ও অভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন এবং এই ক্ষেত্রসমূহে ব্যক্তিমালিকানা খাতের অংশগ্রহণে উৎসাহ দান।

সরকারের গৃহীত বর্তমান নীতিসমূহ ছিলো উৎপাদন প্রতিকূল এবং প্রাথমিকভাবে যার উদ্দেশ্য হিসেবে রাজস্ব সংগ্রহের কার্যক্রমকেই নির্ধারণ করেছিলো। বিদ্যুৎ, বিমান, যোগাযোগ এবং টেলিযোগাযোগ শিল্পসমূহ বৃহৎ আকারে ব্যক্তিমালিকানা খাতে ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু হওয়াতে সরকারের রাজস্ব অর্জনের পরিমাণ বৃদ্ধির অবকাশ সৃষ্টি হয়েছে এবং তা অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিতে সহায়তা দিতে সক্ষম হবে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা আরো ব্যাপকভাবে পরিস্ফটিত হওয়া বাঞ্চনীয়। কম্পিউটারভিত্তিক একটি সাক্ষরতা কার্যক্রম দ্বিগুণ হারে সাক্ষরতা অর্জনের লক্ষ্যের সফলতা এবং যুবকদের দক্ষতা অর্জনের সহায়তায় সক্ষম হবে, জীবিকা খুঁজে বের করে তা প্রাপ্তির জন্যে। এই শিক্ষা ব্যবস্থা বহুসংখ্যক মেধাবী পুরুষ ও মহিলাকে সামাজিক ব্যবসায়িক ও কারিগরী ক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষমতাসম্পন্নদের সৃষ্টিতে সহায়ক হবে, যা দেশের জন্যে ভবিষ্যতে প্রয়োজন হিসেবে দেখা দিবে।

কর্মক্ষম লোকদের একটি ছোট এলাকাতে কর্মকান্ডে নিয়োজিত হবার প্রবণতা রোধকল্পে পৌর উন্নয়ন পরিকল্পিতভাবে হতে হবে এবং পয়ঃপ্রণালীর সুব্যবস্থাসহ পানি সরবরাহের সুবিধাসমূহ যথাযথভাবে ব্যবস্থাকরণ আবশ্যক।

বেসরকারী সংস্থাসমূহের (এনজিও) কার্যকরী সমর্থনের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমের বাস্তবায়নে সাফল্য অর্জনের পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যক।

www.pathagar.com

সংস্থার কার্যক্রমের বাস্তবতা

সমৃদ্ধির অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌছার জন্যে বাংলাদেশের উন্নয়ন গতিকে ত্বরান্বিত করতে এ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমিকভাবে বহু সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহের যদিও এখন পর্যন্ত সিংহভাগই অনিষ্পন্ন অবস্থায় রয়ে গেছে, তথাপি এ সকল কার্যক্রম সামগ্রিকভাবে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের কৌশল নির্ধারণসহ দারিদ্র্যের দুষ্টু চক্রকে ভাঙ্গার প্রত্যয়ে নীতি নির্ধারণের সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তাদানে সফলতা দিয়েছে বলে অনুমিত হচ্ছে।

বর্তমানে বিরাজমান অবস্থার আলোকে এফবিসিসিআই-এর সভাপতি কর্তৃক উপস্থাপিত উল্লেখিত 'উন্নয়ন কৌশল' সুবিবেচনার দাবী রাখে। দেশের ব্যক্তি মালিকানা খাতের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসা উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক এই প্রস্তাবনায় সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে দারিদ্র্য ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসার নিমিত্তে কিছুসংখ্যক গৃহীতব্য কার্যক্রম সম্বন্ধে ইঙ্গিতদান করছেন।

দারিদ্র্য থেকে সমৃদ্ধি-প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সুযোগ (From Poverty to Prosperity Opportunities and Challenge) শীর্ষক ধারণার বিশদ ব্যাখ্যাকালে একই সাথে তিনি যেমন উন্নয়নের প্রধান সমস্যাসমূহ তালিকায়িত করেছেন, তেমনি এই সমস্যাসমূহ কাটিয়ে উঠার পথ ও উপায় নির্দেশ করেছেন যা ২০০৫ সালেরমধ্যে দ্বিসংখ্যায় প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে।

তাঁর চিন্তা জাগরিত একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রুত কৃষিখাত-এ প্রবৃদ্ধি এবং শ্রমঘন কারিগরিভিত্তিক উৎপাদনের দ্বিগুণ প্রসারের বিষয়ে দ্বিমত প্রকাশের কোন অবকাশ নেই।

কিন্তু আগামী দশ বছরে লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারিত দ্বি-সংখ্যায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের অত্যন্ত জরুরী কার্যক্রম হিসেবে সংস্কার কর্মকান্ডের প্রবাহ অক্ষুন্ন রাখা, নিয়ন্ত্রণমুক্ত অর্থনীতি অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন এবং শিক্ষা, বিদ্যুৎ টেলিযোগাযোগ, অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ, বন্দর ও আকাশপথে যোগাযোগ ব্যবস্থার মতো সেবা ও সামাজিক খাতসমূহ ব্যক্তি মালিকানাভিত্তিক বিনিয়োগকারীদের জন্য উন্মুক্তকরণের আবশ্যকতার উপর জোর দেয়া হয়েছে।

ইতোমধ্যে বিগত কয়েক বছর যাবত সংস্কার কার্যক্রম চলে আসছে, আর্থিক ব্যবস্থাকে ক্রমান্বয়ে নিয়ন্ত্রনমুক্ত করা হয়েছে এবং বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগের মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহ ব্যক্তিমালিকানা বিনিয়োগকারীদের জন্যে উন্মুক্ত করা হয়। কিন্তু এটা সহজেই স্বীকার করে নেয়া যেতে পারে, এ সকল সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবতা লাভের চেয়ে এর অবস্থান কাগজের মধ্যেই স্পষ্ট রয়েছে অধিকভাবে। এ ছাড়া বিভিন্ন বিনিয়োগের প্রস্তাব কার্যক্রম করা হচ্ছে না।

এ সম্পর্কিত কর্মক্ষম আইনের এ পর্যন্ত বাস্তবরূপ লাভ করার অপেক্ষায় থাকার জন্যে এ পর্যন্ত আংশিক সংস্কামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হওয়া সত্ত্বেও কোনো কোনো কারণের

www.pathagar.com

জন্যে বিনিয়োগের মাত্রা অত্যন্ত নিম্নপর্যায়ে রয়েছে, তা তিনি অন্যান্য উপাদানের সাথে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন।

তিনি ম্যাক্রো পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সমর্থনের ঘাটতির বিষয়টি সঠিকভাবেই নির্দেশ করেছেন, যা উচ্চ প্রবৃদ্ধির প্রদর্শনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতার সহায়ক হিসেবে পরিগণিত।

বিনিয়োগের উৎসাহের ঢেউ

বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন অনেকাংশে উন্মুক্ত হওয়াতে এশীয় বহু বিনিয়োগকারীরা পক্ষান্তরে নিজে থেকেই এখানে আসার ক্ষেত্রে উৎসাহ বোধ করে থাকেন। এই নতুন বিনিয়োগের উৎসাহের ঢেউকে বশে আনার অন্যতম করণীয় হচ্ছে শিল্প ও কৃষি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়তাদান করা।

এই প্রসঙ্গে ফেডারেশনের সভাপতি অত্যন্ত যথার্থভাবেই ব্যবসাভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে সরাসরি সরকারি নিয়ন্ত্রণ তুলে নেয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। এর ফলে একদিকে যেমন লোকসান, ভর্তুকি হ্রাস পাবে অন্যদিকে সরকারের বাজারভিত্তিক অর্থনৈতিক নীতির প্রতি ব্যক্তিমালিকানা খাতের বিশ্বস্ততা অর্জনের পথ সুগম হবে বলে প্রত্যাশা করা যাচ্ছে।

একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাই আর্থ-সামাজিক বিতর্কের বিষয়ে জাতীয় ঐক্যে পৌঁছার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধক হিসেবে বিবেচিত। কোন উন্নয়নমূলক কৌশলই কার্যকর হিসেবে পরিগণিত হতে পারে না যদি কোন উল্লেখযোগ্য বিষয়ে জাতি দ্বিধাবিভক্ত থাকে। অতএব অত্যন্ত নির্দ্বিধায় প্রত্যাশা করা যেতে পারে, প্রাথমিকভাবে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ একত্রিতভাবে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে প্রধান বিষয়ে মতপার্থক্য দূর করার মাধ্যমে পরবর্তী পর্যায়ে আর্থিক বিষয়সমূহ বিবেচনার জন্যে গ্রহণ করবেন। রাজনৈতিক অবস্থাটা স্থিতিশীল না হলে অর্থনীতির কোন অগ্রগতি অর্জনে সফলতা লাভ করতে সক্ষম হবে না এবং দ্রুত প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সকল কর্মপরিকল্পনা ও প্রত্যাশাসমূহ কেবল কল্পনার আকাশেই ভাস্বর হয়ে থাকবে।

বাংলাদেশ তার 'ঝুড়ি বিষয়' (Basket Case)-এর ভাবমূর্তিতে ঝাঁকুনি সৃষ্টি করে ইতোমধ্যে দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে। এখন পর্যন্ত বিদেশের কাছে বাংলাদেশের ঋণাত্মক ভাবমূর্তি যা বিরাজ করছিলো তা বিলম্বে হলেও ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হওয়া শুরু হয়েছে। কিন্তু সরকার ও বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির দীর্ঘায়িত রাজনৈতিক অচলাবস্থাটা পূর্বের বিরূপ ভাবমূর্তিকে আরো উন্নীত করার প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করছে। এক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত আবশ্যকীয় হিসেবে বিবেচনার দাবিদার যে, রাজনৈতিক পক্ষসমূহ অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে জাতীয় প্রয়োজনকে সর্বাগ্রে স্থান প্রদান করবে এবং জনসাধারণের চাওয়া পাওয়ার অবস্থানকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বাস্তবায়নের সহায়তা দিতে সচেষ্ট থাকবে। আবশ্যকীয়ভাবে স্থিতিশীলতা ও প্রবৃদ্ধিই হচ্ছে জনগণের জন্যে।

www.pathagar.com

এই প্রস্তাবিত অভিনব বিষয়টি সম্ভবত দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে সম্পর্কিত। এফবিসিসিআই-এর সভাপতি তারতম্যহীন বিশ্লেষণাত্মক অংকের খেলায় তাঁর এই বিষয়সমূহ তুলে ধরেছেন, যার বাস্তবায়ন উৎসাহ-উদ্দীপনা ও দৃঢ় বিশ্বাসযোগ্যতার উপর অধিকভাবে নির্ভরশীল বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। বাংলাদেশের পিছনের ইতিহাস থেকে দেখা যাচ্ছে, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সুষ্ঠু অগ্রগতির গতিহীনতার প্রধান কারণ হিসেবে আমাদের নেতৃস্থানীয় পরিকল্পনা, প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক ব্যবধানকেই অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মাইক্রো ইকনমিক সুস্থিতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য বাংলাদেশের জন্যে বর্তমানে দ্রুত উন্নয়ন প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে সফলতা লাভ অত্যন্ত আবশ্যক হিসেবে পরিগণিত। দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব না হলে আমাদের দারিদ্র্য নিরসনের কার্যক্রম ধীরলয়ের গতি সঞ্চারে বাধ্য। এখনও আমাদের দারিদ্র্যের অবস্থান অত্যন্ত উঁচু মাত্রায় অবস্থান করছে। যার ফলে অত্যন্ত জরুরী ভিত্তিতে উন্নয়ন ধাবিত সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের দ্রুত গতিসন্নিবেশনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে। এ ধরনের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের গতি অর্জন কৃষি ও কারিগরি খাতে মধ্যমেয়াদী থেকে দীর্ঘমেয়াদী পর্যায়ে সম্ভাব্য গৃহীতব্য উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত।

উচ্চ উন্নয়ন প্রবৃদ্ধির কৌশল

এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, উচ্চ উন্নয়ন প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে কৃষিখাতের অবদানের কৌশল অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন। কেননা সার্বিক জিডিপিতে এর তুলনামূলক অংশীদারিত্ব অর্থনীতিতে উৎপাদিত সেবা ও সামগ্রীর বা বাৎসরিক পুঞ্জীকৃত মূল্য- অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত। বর্ধিষ্ণু শ্রম শক্তি আত্মিকরণ এবং দারিদ্র্য নিরসনের ক্ষেত্রে অবদান সংযোজনের জন্যে কৃষি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য খাত হিসেবে পরিচিত। তথাপি কৃষির প্রবৃদ্ধি কেবল মাত্র খাদ্য শস্য উৎপাদনের সফলতার মধ্যে নিহিত নয়। এর সুষ্ঠু ও নিবিড় প্রবৃদ্ধির জন্যে উৎপাদনের উপকরণসমূহের সন্নিবেশন ব্যতিরেকে দক্ষতার উন্নীতকরণ ও শস্যের বহুমূখীকরণ প্রক্রিয়াকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেয়া আবশ্যক। এছাড়া, অকৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, যা গ্রামীণ খামার কার্যক্রম পরিবৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত জরুরী, তার অধিকাংশ কর্মক্ষমতাই অব্যবহৃত অবস্থায় রয়ে গেছে।

সন্দেহাতীতভাবে সার্বিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে কৃষি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম, কিন্তু পুঞ্জীকৃত জিডিপির প্রবৃদ্ধি নিরবচ্ছিন্নভাবে সম্পন্নের জন্যে কারিগরি ক্ষেত্রে উন্নয়নের মাধ্যমে সহায়তা দিতে সক্ষম হয়ে থাকে। এই অবস্থার বিরাজমানতা চীনসহ উচ্চ অর্থনৈতিক কর্মক্ষমতা পূর্ব-এশিয়ায় পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশ এই ধরনের প্রক্রিয়ার কার্যকারিতার অপেক্ষায় রত রয়েছে। এর কারিগরি খাতসমূহ এদের ক্ষুদ্র পরিসরে কেন যে অসন্তোষজনক পর্যায়ে কর্মক্ষমতা প্রকাশ করছে, এর কারণ খুঁজে বের করাও কোনো কঠিন বিষয় নয়। অধিকাংশ কৃষি খামারের উৎপাদিত সামগ্রী নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট বাজার-এর চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে অনেকটা অগ্রগতি লাভ করেছে। যদিও এর পূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতা এখনও সম্পূর্ণভাবে ব্যবহারে নিয়োজিত হতে সক্ষম হচ্ছে না।

www.pathagar.com

এর ভিত্তিতে বাংলাদেশের কারিগরি খাতসমূহে দ্রুত গতিসম্পন্ন প্রবৃদ্ধি অর্জন বিদেশী বিনিয়োগের বা কারিগরি প্রবাহের অনুগমনতা, সুষ্ঠু আন্তর্জাতিক বাজারের প্রসারের ক্ষেত্রে বার বার হোঁচট খাবার জন্যে রফতানিযোগ্য তৈরি পোশাক শিল্পের উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।

এছাড়া ও বাংলাদেশে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে আরো কিছু সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। এর আওতায় সুসংগঠিত ও যথাযথ কার্যকরী উপযুক্ত আইনগত ব্যবস্থার অনুপস্থিতি অন্যতম বিষয় হিসেবে বিবেচিত। সাধারণতঃ উদ্যোক্তাগণ চুক্তির বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতা, তথা আবেদন প্রক্রিয়ায় ও কষ্টসাধ্য সামঞ্জস্য সাধনের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে। এই সকল সীমাবদ্ধতা অতিক্রমের জন্যে ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধির মাত্রা সংযোজিত হয়ে থাকে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের নিমিত্তে আইনগত সংস্কারের বিশেষ করে কোর্টসমূহকে অধিক কর্মক্ষমসহ বিচার ব্যবস্থার উন্নয়নের দিকে দৃষ্টিদান করার প্রয়োজনীয়তা অনুমিত হচ্ছে।

দ্রুতগতিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে সরকারি ও ব্যক্তিখাতে বৃহৎ পরিমাণ বিনিয়োগ ও এর গুণগত মানবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বর্তমানে বিরাজমান অচলাবস্থাটা থেকে সংস্কারমূলক কার্যক্রমের গতি আনয়নের মাধ্যমে নিম্নপর্যায়ের প্রবৃদ্ধির অবস্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। যথাযথ দৃঢ় নীতি গ্রহণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা অর্জনের সবুজ সংকেত পেলেই কেবল অর্থনীতিকে উন্মুক্ত করার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে উৎসাবোধ করতে পারে। এই ধরনের সংকেত কেবল সংস্কারমূলক কর্মসূচী গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি থেকেই প্রত্যাশা করা যেতে পারে।

উৎসাহব্যঞ্জক বিনিয়োগও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের কার্যকরী পরিকল্পনা সফলতা লাভ করতে সক্ষম হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সার্বিক উৎপাদন সম্ভাব্যতা ও উৎপাদনের উপকরণসমূহের অচলাবস্থা দূরীভূতকরণের সংস্কারমূলক কার্যক্রমে নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতি সাদিত না হয়। এই ধরনের প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্যে ব্যাপক কৌশল অবলম্বন বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য উপাদানের উপর নির্ভর করে থাকে। আর এই উপাদনসমূহ একটি প্যাকেজ গঠন করতে পারে, যা আংশিক অবস্থার চেয়ে সার্বিক বিষয়ে প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতেও সক্ষম। তাই অর্থনৈতিক সুষ্ঠু কর্মসাফল্য লাভের সফলতা অর্জনের জন্যে দেশের অভ্যন্তরে একটি ব্যাপকভিত্তিক রাজনৈতিক মতৈক্য অর্জনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার কোন অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। এই ধারণার আলোকে কার্যকরী সংস্কারভিত্তিক একটি ব্যাপক পলিসি প্যাকেজে সর্বাগ্রে মতৈক্যে পৌছা যেতে পারে। এই ধরনের একটি মতৈক্যে পৌছা সম্ভব না হলে বাংলাদেশ দারিদ্র্য অবস্থা থেকে সমৃদ্ধি ও সচ্ছলতার পথে অগ্রসরের ক্ষেত্রে কঠিন বাধার সম্মুখীন হতে বাধ্য। ❑

** সাপ্তাহিক পূর্ণিমা-এ মার্চ ১০, ১৯৯৭-এ প্রকাশিত।*

www.pathagar.com

বাংলাদেশে উন্নয়নের গতিপ্রকৃতি

পঁচিশ বছরে অর্থনীতির চালচিত্র

এক সাগর রক্তের মূল্যে, ত্রিশ লক্ষ শহীদের আত্মাহুতি, দু'লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আর হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান-এর নেতৃত্বে, নির্দেশনায় ন'মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে বিশ্ব মানচিত্রে ৫৫ হাজার বর্গমাইলের যে ভূ-খণ্ডটি প্রচন্ড চিৎকারে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করেছিলো একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাঙালিদের আবাসভূমি হিসেবে, তাঁর বিকাশ-বর্ধনের আর্থ-সামাজিক চিত্রটা কেমন, সে হিসাব মিলানোর সময় এসেছে সিকি শতাব্দীর সময়ের ব্যবধানে। এই পঁচিশ বছরেও আমাদের সেই '৭১-এর মতো বিশ্ববাসীকে হতবাক করার পরিস্থিতি কেন সৃষ্টি হলো না জাতীয় জীবনে বাংলাদেশের অধিবাসীদের,তার যোগ-বিয়োগ করা অত্যন্ত জরুরী হিসেবে বিবেচনার দাবী রাখে। যে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের প্রত্যাশা নিয়ে আমরা ১৯৭১ সালে হাজার মাইলের ব্যবধানের একান্নবর্তী সংসার ভেঙ্গে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ নামে আলাদা সংসার শুরু করেছিলাম, সেই প্রত্যাশার পূরণ করতে যেয়ে আমরা এখনও যেন অনেক অপূর্ণতার সাথেই কসরৎ করে যাচ্ছি পরিপূর্ণ করার লক্ষ্যে। সেই '৭১-এ যে তেজ ও উদ্দীপনা নিয়ে আমরা পাহাড়সম অবিচল কঠিন ঐক্যে দৃঢ় ছিলাম, সে দৃঢ়তা এখন যেন আর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কোনো ক্ষেত্রেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক আমাদের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধই ছিলো বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম চালিকা শক্তি। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে 'দু' অর্থনীতি তত্ত্ব। সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি অর্থনৈতিক আকাঙ্খা কাজ করেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পিছনে। যার মূল বক্তব্য ছিলো সকল ধরণের অর্থনৈতিক শোষণের অবসান, অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি। আর তাই বাংলার মানুষ স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলো অর্থনৈতিক এ আকাঙ্খাকে লক্ষ্য হিসাবে নির্দিষ্ট করে। অন্যান্য জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মতো বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে ভবিষ্যতে বাঙালি পুঁজিপতিদেরও পূর্ণ সমর্থন ছিলো। কেননা, তখন পাকিস্তানের বিশাল পুঁজির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার মতো ক্ষমতা তাদের ছিলো না এবং তাদের ক্ষুদ্র পুঁজির বিকাশের জন্যে একটি আলাদা সার্বভৌম ভূখন্ডের প্রয়োজন ছিলো। এ কারণেই আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরুতেই ভবিষ্যৎ বাঙালি ও বাংলার সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক আকাঙ্খার ভিন্নতা লক্ষণীয়, যা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের অর্থনীতির বিভিন্ন গতিময়তা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

www.pathagar.com

সারা বিশ্ব অবাক বিস্ময়ে দেখেছে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের সম্ভাবনার আর মুক্তির আকাঙ্খাকে বাস্তবে রূপদানের সফল পরিণতির দিকের অভিযাত্রা। মাত্র ৬ দশমিক ৫৯ মার্কিন ডলার মাথাপিছু ঋণ নিয়ে আমরা '৭২-৭৩ সালে সোনার বাংলা গড়ার যাত্রা শুরু করেছিলাম। সে ঋণের ভার আড়াই দশকে আমাদের মস্তক অবনত করে দিয়েছে। আর তাতে বর্তমানে মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৩৫ মার্কিন ডলার। বাংলাদেশের মোট ঋণ ১৯৭১-৭২ সালে ছিলো ২৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। তা ২৪ গুণ বেড়ে ১৯৯৪-৯৫ সালে দাঁড়িয়েছে ৬০৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার-এ। আমরা ক্রমান্বয়ে ব্যাপকভাবে দাতাগোষ্ঠীর কাছে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছি যদিও আমরা একাত্তরে অর্থনৈতিক মুক্তির আকাঙ্খায় উদ্দীপ্ত ছিলাম। তথাপি এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আমাদের মাথাপিছু আয় বেড়েছে মাত্র ৩ গুণ। দেশের লোকদের '৭১-৭২ সালে মাথাপিছু গড় আয় ছিলো ৭০ মার্কিন ডলার। আর তা '৯৪-৯৫ সালে এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র ২৩০ মার্কিন ডলারে।

অন্যদিকে জিডিপিতে ১৯৭২ সালে কৃষি খাতের অংশ ছিলো ৬০ শতাংশ। কিন্তু বর্তমানে কৃষি খাতের অংশ হ্রাস পেয়ে ৩০ শতাংশে এসে পৌঁছেছে।

বিদেশী সাহায্যদাতা ও বিনিয়োগকারীদের কাছে বাংলাদেশ ধর্মঘট, হরতাল, অবরোধ, সন্ত্রাস আর অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতার দেশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের দারিদ্রের পরিমাণ ষাটের দশকে ছিলো ২০/২৫ ভাগের মতো। যার পরিমাণ আজ দাঁড়িয়েছে কমপক্ষে ৬০ ভাগে। দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞরা মনে করেন এর কারণ হচ্ছে, ক্ষমতাসীন বিভিন্ন সময়ের সরকারসমূহের ভ্রান্তনীতি এবং দারিদ্র নিরসনে আন্তরিকতার অভাব।

স্বাধীনতা-উত্তর প্রক্রিয়া:

১৯৭১ সালে ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামো ধ্বংসকারী একটি রক্তক্ষয়ী মুক্তিসংগ্রামের পর বাংলাদেশের মত একটি জনবহুল, সম্পদ-অপ্রতুল ও বৈষম্যপূর্ণ সমাজে সর্বস্তরের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি ও সাম্য নিশ্চিত করার প্রত্যাশায় বৃহত্তর উৎপাদন উপাদানের সামাজিকীকরণ ভিন্ন অন্য কোনো পথ ছিলো না। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের রাষ্ট্রযন্ত্র এ চরম সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করেই দেশের বৃহৎ শিল্প ও বৈদেশিক বাণিজ্যসমূহকে জাতীয়করণ সম্পন্ন করে। এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে- দেশের অন্যতম খাত-কৃষি খাত, যা থেকে জাতীয় আয়ের প্রায় ৪০ শতাংশ আসে, ক্ষুদ্র শিল্প এবং সেবামূলক খাতের একটি বড় অংশ বেসরকারি মালিকানায় রেখে দেয়া হয়। তাই হয়তো এ কথা বলার অবকাশ রয়েছে যে, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে যে সমাজতন্ত্রের কথা বলা হয়েছিলো, তা সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক সৃষ্টিশীলতাকে সীমিত করার জন্যে নয়, বরং বৃহত্তর স্বার্থান্বেষী বিশেষ অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর কর্মকান্ডকে খর্ব করার জন্যে। কিন্তু উদ্দেশ্যের ব্যাপক সততা সত্ত্বেও আমাদের স্বাধীনতা-উত্তর জাতীয়করণ নীতির একটি বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন করলে দু'টো মৌলিক দুর্বলতার সন্ধান পাওয়া যায়—

www.pathagar.com

(১) কোন যথার্থ নির্ণায়ক ভিন্নই অনেকটা ঢালাওভাবে বৃহৎ শিল্পের জাতীয়করণ করা হয়, যার ফলে বহু শিল্প প্রতিষ্ঠানকে অনাবশ্যকভাবে সরকারি খাতে নিয়ে আসা হয়, যা উৎপাদনশীলতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং

(২) বিভিন্ন জাতীয়করণকৃত শিল্পে দক্ষ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার মতো জনশক্তি সরকারি খাতে ছিলো না।

এতে একদিকে যেমন বহু ক্ষেত্রে সাধারণ সরকারি কর্মকর্তাদের রাষ্ট্রীয়করণকৃত শিল্পের ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত করা হয়েছিলো, তেমনি অন্যদিকে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা-নিয়োগ প্রক্রিয়া ছিলো সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক। যদিও এর কোনটাই দেশের অর্থনীতির জন্য কাম্য ছিলো না এবং এর প্রভাবে একদিকে যেমন বহু শিল্প প্রতিষ্ঠানে অদক্ষতা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেয়, অন্যদিকে বহু শিল্প প্রতিষ্ঠানই ব্যবস্থাপকদের সম্পদ লুণ্ঠনের কোষাগারে রূপান্তরিত হয়। তথাপি, এ কথা অস্বীকার করার কোন অবকাশ নেই যে, স্বাধীনতা-উত্তর সময়কালে সৃষ্ট শূন্যতায় এ দেশের রাষ্ট্রীয় শিল্পখাত একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছিলো।

রাজনৈতিক পরিবর্তন ও সংস্কার:

প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে গত ২৫ বছরে অর্থনৈতিক কর্মসূচী রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে একাত্ম হয়ে পড়েছে। আর এর আলোকে নব্বই দশকের শুরুতে সর্বশেষ নীতিমালা পরিবর্তন বা সংস্কার কর্মসূচী গৃহীত হয়। এর মাধ্যমে অর্থনীতিতে ভারসাম্য বা স্থিতিশীলতা কিছুটা অর্জিত হলেও সংস্কার কর্মসূচীর প্রধান যে লক্ষ্য স্থিতিকরণ থেকে প্রবৃদ্ধির পর্যায়ে সেটি এখনও অর্জিত হয়নি। আমাদের অর্থনীতির সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে আয়, সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের অত্যন্ত নিম্নহার। যাকে তাত্ত্বিক ভাষায় দারিদ্রের দুষ্ট চক্রের আবর্তে (Vicious Circle of Poverty) নিমজ্জিত বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। বিনিয়োগের হারে কিছুটা উর্ধ্বগতি পরিলক্ষিত হয় সত্তর দশকের শেষ দিক থেকে আশির দশকের শুরু পর্যন্ত। বৈদেশিক সাহায্যের ওপর একান্তভাবেই নির্ভরশীল ছিলো এ স্বল্পস্থায়ী বিনিয়োগের প্রবৃদ্ধি। বরং দেশীয় সঞ্চয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তেমন কোনো প্রয়াস নেয়া হয়নি তখন। আর যার ফলশ্রুতিতে সংকট প্রকট হয়ে ওঠে যখন বিদেশী সাহায্যের কমতি দেখা যায়। তাই বিশ্বব্যাংক ও আই এম এফ-এর সমর্থনে অর্থনৈতিক স্থিতিকরণ এবং কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচী প্রবর্তন করা হয় আশির দশকের গোড়ায় সামগ্রিক অর্থনীতির এই ভারসাম্যহীনতার প্রেক্ষাপটে। হ্রাসমান বৈদেশিক সাহায্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাণিজ্য ও বাজেটের ঘাটতির পরিমাণ কমিয়ে আনা এবং জাতীয় সঞ্চয় ও বিনোয়োগ হারের ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই এ সংস্কার কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য ছিলো। যদিও এক্ষেত্রে বিনিয়োগের হার না কমিয়ে এবং সরকারের চলতি খরচ নিয়ন্ত্রণ এবং বর্ধিত রাজস্ব সংগ্রহের মাধ্যমে জাতীয় সঞ্চয়ের হার বৃদ্ধির প্রচেষ্টা জোরদার করাই ছিলো একান্ত কাম্য পদক্ষেপ। বরং যে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তাতে সরকারের নেয়া উন্নয়ন বাজেটের ব্যয় বরাদ্দ হ্রাস এবং বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ সংকোচনের ফলে বিনিয়োগই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বেশি।

www.pathagar.com

পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তান আর্থিক দ্বন্দ্ব:

বাংলাদেশ থেকে স্বাধীনতার আগে প্রাথমিক দ্রব্যাদি রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী পশ্চিম পাকিস্তানে সরবরাহ করা হতো। আবার পশ্চিম পাকিস্তানি পণ্যের অবাধবাজারে পরিণত হয়েছিলো বাংলাদেশ। তাছাড়া পশ্চিম পাকিস্তান এদেশের বর্হিবাণিজ্য খাতের উদ্বৃত্ত আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্য ঘাটতি পূরণে ব্যবহার করতো ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতে তার একাধিপত্য থাকার সুবাদে। এ দেশের সম্পদ-অবস্থানকে এই প্রথা খুবই দুর্বল করে তোলে। এর ফলে বস্তুতঃ বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় বলতে বাংলাদেশের কিছুই ছিলো না ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনকালে। তাছাড়া বহির্বিশ্বের দারস্থ হতে হয়েছিলো আমদানির এক দীর্ঘ তালিকা নিয়ে। যার ফলে দেখা দিয়েছিলো স্বাধীনতার শুরুতেই বিশাল বাণিজ্য ঘাটতি। কিন্তু বাংলাদেশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার প্রয়োজনীয় প্রেরণার জন্যে স্বাধীনতার পর প্রথম কয়েক বছর বর্হিবিশ্বের দ্বারস্থ হতে অনিচ্ছুক ছিলো। কেননা, ভবিষ্যতের অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বাড়ানোর ওপর প্রচেষ্টা ছিলো উন্নয়নের জন্যে অভ্যন্তরীণ সম্পদ সমাবেশের ওপর নির্ভর করে এ ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করা। যদিও পরবর্তীতে কার্যকর হয়নি তাও। বরং আমাদের রফতানি কাঠামোতে প্রচলিত ও অপ্রচলিত পণ্যের অংশ পরিবর্তিত হয়েছে সময়ের বিবর্তনের আবর্তে। বাংলাদেশ মূলতঃ আশির দশকের পূর্বে পাট ও পাটজাত দ্রব্য, চামড়া, চা রফতানি করতো বৈদেশিক বাজারে। অন্যদিকে এর সাথে রফতানি পণ্যের তালিকায় তৈরি পোশাক, হিমায়িত চিংড়ি, নিউজপ্রিন্ট-এর মতো অপ্রচলিত পণ্য স্থান লাভ করে আশির দশক থেকে।

আমাদের রফতানি আয় আমদানি ব্যয়ের মাত্র ৩০ শতাংশ পূরণ করতো সত্তর দশক থেকে আশির দশকের প্রথম ভাগ সময় পর্যন্ত। আশির দশকে চলতি হিসাব খাতে বাংলাদেশের ঘাটতি ছিলো স্থূল দেশজ উৎপাদনের দশ শতাংশের বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই বিশাল ঘাটতির ফলে। আমাদের লেনদেনের ভারসাম্যে বিরাট চাপ সৃষ্টি করে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রতিকূল শর্তাবলী ও কোনো কোনো বছর বৈদেশিক সাহায্যের প্রবাহে স্থবিরতার কারণে। তথাপি আমাদের চলতি হিসাব খাতে ঘাটতি হ্রাসকরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাঠানো বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহ।

শিল্প বিনিয়োগে আশা ভঙ্গ:

বাংলাদেশে আশানুরূপ শিল্প বিনিয়োগ হয়নি স্বাধীনতার পঁচিশ বছর পরও। এ সম্পর্কে মতামতের ভিন্নতা রয়েছে। আই এম এফ ও বিশ্বব্যাংকের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী আশির দশকের শেষ পর্যায়ে আমদানি উদারীকরণ নীতি গৃহীত হলো, তখন থেকেই আমদানিকৃত বিদেশি দ্রব্যের কাছে এবং চোরাচালানকৃত দ্রব্যের কাছে দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্য মার খেতে শুরু করে। বাংলাদেশ বর্তমানে শিল্পায়নের কৌশল হিসেবে আমদানি বিকল্প শিল্পের পরিবর্তে বিদেশিদের চাপিয়ে দেয়া 'কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচী'র অন্তর্ভুক্ত রফতানিচালিত শিল্পকেই শিল্পায়নের প্রধান দর্শন হিসেবে গ্রহণ করেছে। আশানুরূপ আসেনি এখানে বিদেশি পুঁজি। বিদেশি পুঁজিকে আকর্ষণ করার জন্যে নীতি প্রণেতাদের প্রয়াস এখনো

www.pathagar.com

সফল হয়নি বলে অনুমিত হচ্ছে। এতে দেদার সুযোগ-সুবিধা কাগজে-কলমে দেয়ার পরও বিদেশি পুঁজি কেন দেশে আসছে না সে সম্বন্ধেও পরিষ্কার ধারণা করাও অত্যন্ত দুরূহ বিষয় হিসেবে বিবেচিত।

আমাদের অর্থনীতিতে বর্তমানে স্বল্পমেয়াদী বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচক স্বল্পকালীন স্থিতিশীলতা বজার রাখার ইঙ্গিত বহন করছে। নিম্ন মুদ্রাস্ফীতির হার, খাদ্য উৎপাদনে প্রায় স্বয়ম্ভরতা অর্জন, লেনদেনের ভারসাম্যের চলতি হিসাবে ঘাটতির ক্রমহ্রাসমান প্রবণতা, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের স্ফীতি, টাকার স্থিতিশীল বৈদেশিক মূল্যমান, সরকারি রাজস্ব আহরণে উর্ধ্বগতি, অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় হারের ক্রমোন্নতি এগুলো সবই আপাত: বিবেচনায় সুলক্ষণ হিসেবে অভিহিত হওয়ার দাবিদার। কিন্তু এ বাস্তবতাকে অস্বীকার করার কোন অবকাশ নেই যে, 'আমাদের মতো নিম্ন-আয়, ভারসাম্যের ফাঁদে আটকে থাকা একটি দেশের জন্যে এসকল সূচকগুলো অর্থনীতির স্থবিরতাকেই ফুটিয়ে তুলছে প্রকটভাবে। কেননা, ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে বিভিন্ন খাতে গতি সঞ্চার এবং ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধি অর্জন করা না গেলে আমাদের দুর্গতি আদৌ ঘুচবে বলে মনে হচ্ছে না।'

স্থবিরতার অচলায়তন:

কেবল সামষ্টিক অর্থনীতির জিকির তুলেই যে স্থবিরতার অচলায়তন দূর করা যাবে না সে বিষয়েও ভেবে দেখার অবকাশ রয়েছে। কেননা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে ধাবিত হওয়া একটি দীর্ঘমেয়াদী জটিল প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচিত।। যদিও অর্থনীতিতে স্বল্পমেয়াদী যে স্থিতিশীলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে তা যে দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়াকে জোরদার করার জন্যে স্বস্তিদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ আছে বলে মনে হচ্ছে না। এ কথা সত্য, অর্থনীতির বর্তমান স্থিতিশীলতার পেছনে আমাদের খাদ্য উৎপাদনে অর্জিত অগ্রগতি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

কেননা, ১৯৭৪ সালের বন্যা ও দুর্ভিক্ষের পর গোটা দেশে গ্রামীণ উন্নয়নের বিভিন্ন কার্যক্রমের যে সূচনা করা হয়েছিলো তার প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি ছিলো পরবর্তী বছরের বাম্পার ফসল উৎপাদন। ঐ বছরে প্রাকৃতিক দুর্যোগমুক্ত বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদনে অর্জিত সাফল্যের ফলশ্রুতিতে '৭৫-৭৬ এবং '৭৬-৭৭ অর্থ বছরেও মুদ্রাস্ফীতির হার কমে গিয়েছিলো। যদিও পরবর্তী পর্যায়ে সরকারি নীতিতে ক্রমাগতভাবে কৃষক ও কৃষি খাতের প্রতি বৈরী হওয়ার প্রবণতাই পরিলক্ষিত হয়েছে।

এছাড়া একদিকে সাহায্যের মাধ্যমে প্রাপ্ত খাদ্যদ্রব্য বাজারে খাদ্যের দাম অস্বাভাবিকভাবে দাবিয়ে রাখছে, অন্যদিকে কৃষি উপকরণ প্রদত্ত ভর্তুকি ক্রমাগতভাবে প্রত্যাহার করার কারণে কৃষিকাজ ক্রমান্বয়ে অলাভজনক ও অনাকর্ষণীয় হয়ে পড়েছে। আর কৃষকশ্রেণী অর্থনীতিতে আত্মপোষণমূলক উৎপাদন ব্যবস্থায় খরচ পোষানোর ব্যবস্থা কৃষকদের পেটের দায়ে কৃষকদের উৎপাদন কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হওয়াতে সরকারের এই দ্বৈত

www.pathagar.com

উৎসাহহীনতার পরেও কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগমুক্ত বছরগুলোতে। এভাবে কৃষক সমাজ সরকারি নীতির নেতিবাচক প্রভাবের বিপরীতেও কৃষির এ সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। তাই এই কৃতিত্ব কোনো সরকারের নয়।

যদিও ভূমি সংস্কার বা কৃষি সংস্কার কর্মসূচীর প্রতি ব্যাপক বৈরিতা পোষণ করে চলেছে ১৯৭৫ সাল পরবর্তী প্রতিটি সরকার। আর দিন দিন যেন বেড়েই চলছে ভূমি সংস্কার ইস্যুটির অবহেলার প্রবণতা। তাছাড়া পুরোপুরি কাগজ-কলমেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে ১৯৮৪ সাল প্রণীত কৃষি সংস্কার নীতিগুলো। এই আইনগুলো বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা এরশাদ সরকারতো নেয়নি, এমনকি বিএনপি সরকারও এদিকে দৃষ্টি দেয়নি।

কেননা, ভূমি সংস্কার বিশ্ব ব্যাংক, আই.এম.এফ'র কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচীর আওতাভুক্ত প্রেসক্রিপশন হিসেবে বিবেচিত নয়। অন্যদিকে বরং প্রেসক্রিপশন মানতে গিয়ে কায়েমী গোষ্ঠী স্বার্থকে সন্তুষ্ট রাখার তাগিদে খাদ্য সাহায্য অব্যাহত, ভর্তুকি প্রত্যাহার, এবং আমদানি উদারকরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হয়েছিল।

সঞ্চয়-বিনিয়োগ অবস্থান:

আমাদের জাতীয় সঞ্চয়ের হার সাম্প্রতিককালে বৃদ্ধি পেয়েছে। যা গড়ে জাতীয় আয়ের পাঁচ শতাংশ ছিল সত্তর ও আশির দশকে। আর তা দশ শতাংশের উপরে উঠে গেছে নব্বই-এর দশকে। যদিও এর আরও প্রবৃদ্ধির আবশ্যকতা অনুমিত হচ্ছে, কেননা দ্রুত প্রবৃদ্ধির সহায়ক মূলধনের জন্যে বর্তমানে অনুমিত চৌদ্দ শতাংশ যথেষ্ট নয়। চলতি খাতে সরকারী বাজেট ঘাটতি সামষ্টিক উৎপাদনের শতাংশ হিসাবে নব্বই'র দশকে সত্তর বা আশির দশকের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়া জাতীয় সঞ্চয় বৃদ্ধির একটি কারণ হিসাবে বিবেচিত।

সরকারী বিনিয়োগ কমে যাবার কারণে আমাদের বিনিয়োগের হার নব্বই-এর দশকে সামষ্টিক উৎপাদনের শতাংশ হিসাবে সত্তরের দশক বা আশির দশকের প্রথম ভাগ থেকে কমে গেছে। আসেনি বৈদেশিক বিনিয়োগ, আর বিভিন্ন প্রণোদনা সত্ত্বেও বাড়েনি বেসরকারী বিনিয়োগ। তাছাড়া বিদেশী সাহায্যের বিনিয়োগ সরকার সময়মত করতে সমর্থ হয়নি। অধিকন্তু মানব সম্পদ সৃষ্টিতে বিনিয়োগ এ হিসাবের বাইরে থেকে গেছে। তাই একথা সহজেই অনুমেয়, দ্রুত প্রবৃদ্ধির জন্যে যে পরিমাণ বিনিয়োগের প্রয়োজন সে পর্যায়ে আমাদের প্রকৃত বিনিয়োগ পৌছেনি।

বৈদেশিক সঞ্চয় বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের ব্যবধান মিটিয়ে দেয়, যা কেবল বৈদেশিক সাহায্য ও বৈদেশিক বিনিয়োগের মাধ্যমে আসে আমাদের দেশে। সত্তরের দশকে বৈদেশিক বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হয়নি জাতীয় রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বহুজাতিক সংস্থার ঐতিহাসিক ভূমিকার কারণে। আশির দশকে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে শুরু করলেও উন্নয়নশীল দেশে প্রধানতঃ বাণিজ্য উদারীকরণ, সরকারী খাতের সংকোচন, শুল্ক সুষমকরণ ও মুদ্রাস্ফীতির নিয়ন্ত্রণই প্রাধান্য পেয়েছে। বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের জন্যে সমস্ত নীতিমালার উদারীকরণ হওয়ার পরও বৈদেশিক

www.pathagar.com

বিনিয়োগ হয়নি। কারণ দেশের ধনিক শ্রেণী বৈদেশিক বিনিয়োগ কর্তাদের উপর নির্ভর করতে চেয়েছেন অত্যধিক পরিমাণে। প্রকৃতমূল্যে কমেছে বৈদেশিক সাহায্য। ফলে বৈদেশিক সঞ্চয় যা এদেশে বিনিয়োগ হয়েছে তার পরিমাণ ক্রমাগত কমে গেছে। এ অবস্থাকে আত্মনির্ভরতা বলে চালাবার প্রচেষ্টা আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া অন্য কোনভাবে বিবেচনার অবকাশ থাকবে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে না।

সামষ্টিক উৎপাদন:

প্রতিনিয়ত শোনা যায়, বর্তমানে আমাদের মাথাপিছু আয় ২৩০ মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে, যা স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে ছিলো ৭০ মার্কিন ডলারে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরও মাথাপিছু এই আয় বৃদ্ধিতে অনেকেই আত্মতৃপ্তি লাভ করতে পারেন। যদিও আবার অবমূল্যায়ন হয়েছে টাকার। তথাপি জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার সত্তরের দশকের তুলনায় কমেছে আশির দশকে এবং নব্বইয়ের দশকে কমেছে বরং আশির দশকের তুলনায়। তাছাড়া মাথাপিছু আয়ের বর্তমান প্রবৃদ্ধির হার, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে যাওয়া সত্ত্বেও সত্তরের দশকের চেয়ে কম। আমাদের উৎপাদন প্রচেষ্টা যে যথাযথভাবে ফললাভে সক্ষম হচ্ছে না এ অবস্থা তারই ইঙ্গিতবাহী।

যদিও গত পঁচিশ বছরে খাতওয়ারীভাবে সামষ্টিক উৎপাদন বেশ পরিবর্তিত হয়েছে। আর সামষ্টিক উৎপাদনে কৃষিখাতের অংশ সত্তরের দশকে ছিলো অর্ধেকেরও বেশি, কিন্তু নব্বই-এর দশকে এটি এক তৃতীয়াংশেরও কম। এর কারণ হিসেবে কৃষিখাতের গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার সত্তর বা আশির দশকের চেয়ে বর্তমানে উল্লেখযোগ্যভাবে কমকেই বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। বিদ্যুৎ, জ্বালানি, ইউটিলিটি ও নির্মাণখাতে লক্ষণীয়ভাবে প্রবৃদ্ধি ঘটলেও শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধি দ্রুততর হয়নি। এ থেকেই স্পষ্টতর ধারণা গ্রহণ করা যেতে পারে যে, সেবা খাতে (পরিবহন, যোগাযোগ, গৃহায়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংকিং, প্রশাসন) এখন আমাদের সামষ্টিক খাতে প্রাধান্য লাভ করেছে এবং এ খাতের প্রবৃদ্ধির হার সত্তর দশকের তুলনায় বর্তমানে উল্লেখ করার মতো বেশি। এ ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে- প্রাথমিক খাতে যখন অর্থবহ প্রবৃদ্ধি ঘটছে না, তখন সেবা খাতে বা শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধি টেকসইভাবে ঘটার অবকাশ পাচ্ছে না।

শিল্পখাতে বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধি:

আমাদের শিল্প ও শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধি কোনো অবস্থাতেই শতকরা ৪/৫ ভাগের বেশি হতে পারছে না। যদিও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য কিছু দেশ যখন শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধি জিডিপি'র শতকরা ১০ ভাগের ওপরে। এ থেকে আমাদের অর্জন প্রতিটি পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ৪০ ভাগের বেশি হতে পারছে না। আর এখাতের অবদান আজো জিডিপি'র এক দশমাংশও হতে পারছে না। প্রকৃতপক্ষে বিনিয়োগের স্বচ্ছ পরিবেশ না থাকাতেই শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধি কাঙ্খিত হারে হচ্ছে না সে বিষয়ে কোনো দ্বিমতের অবকাশ আছে বলে মনে হচ্ছে না।

www.pathagar.com

তাছাড়া পাট ও শিল্পের বিপর্যয়ের কারণেই প্রধানতঃ শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না। যদিও রাসায়ানিক সার, পোশাক ও তরলপানীয় শিল্পের প্রবৃদ্ধির অবস্থা অনেকটা আশাপ্রদ হিসেবে বিবেচনার দাবী রাখে। পোশাক শিল্প একাই মোট রফতানী আয়ের অর্ধেক অর্জন করছে। অন্যান্য অনানুষ্ঠানিক শিল্পখাতে যত শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে তার সমান সংখ্যক শ্রমিক এখন পোশাক শিল্পে কর্মরত আছে, যার সিংহভাগই মহিলা। যদিও তাদের জীবন-যাপনের ধারার ক্ষেত্রে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে না। আবার ক্ষুদে শিল্পের চেয়ে বড়ো বড়ো শিল্পখাতে প্রচুর ব্যাংক ঋণ ঢেলে আমরা বহু ঋণখেলাপী শিল্পপতি তৈরি করলেও শিল্পায়নের ফসল ঘরে তুলতে পারছি না।

শিল্প বিনিয়োগ চিত্র বেশ হতাশাব্যঞ্জক। এই সিকি শতাব্দী সময়েও আমাদের বিনিয়োগ চিত্র আশানুরূপভাবে প্রস্ফুটিত হয়নি। যদিও নীতিমালার ব্যাপক পবিরর্তন সহ একাধিক উদযোগ শিল্পবিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্যে গ্রহণ করা হয়েছে, তথাপি বাস্তব ক্ষেত্রে তা কোনো সুফল বয়ে আনেনি। বরং দিন অতিবাহিত হওয়ার সাথে শিল্পবিনিয়োগের চিত্রও ক্রমান্বয়ে আরো করুণ হচ্ছে এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে রুগ্ন শিল্পের সংখ্যা। আর সেক্টর কর্পোরেশনগুলো শ্বেত হস্তীতে পরিণত হয়েছে স্বাধীনতার পর লোকসান দেয়ার প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকাতে।

১৯৭২ সালের জানুয়ারি ২৯-এ আওয়ামী লীগ সরকার সর্বপ্রথম জলযানে সরকারি একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং মার্চ ২৫, '৭২-এ পাঁচটি আইনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাতীয়করণ সম্পন্ন করেন। যার ফলে '৭২ সালেই শিল্পখাতের প্রায় ৮৫ শতাংশ সরকারি মালিকানায় এসে যায়। আর '৭৪ সালের জুলাই মাসে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কৌশল পুনর্বিবেচনা করে আওয়ামী লীগ সরকারই নিয়ন্ত্রণ শিথিলের প্রথম উদযোগ গ্রহণ করে সরাসরি বৈদেশিক পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ করে দেয় এবং ব্যক্তিমালিকানার পরিধি বিস্তৃত করা হয় শিল্প খাতে। আর মাত্র আঠারোটি শিল্পকে সরকারি খাতে রেখে বাকিগুলোকে ব্যক্তি মালিকানা বা যৌথ খাতে ছেড়ে দেয়া হয়। এ ছাড়াও সিদ্ধান্ত নেয়া হয় পরিত্যক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তরের।

পরবর্তিতে রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের পর ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বরে জেনারেল জিয়াউর রহমান আরো উদারনৈতিক শিল্পবিনিয়োগ নীতি গ্রহণ করেন। এতে পরিত্যক্ত সম্পত্তির বিক্রয় প্রক্রিয়া শুরু হয়। আর ব্যক্তি মালিকানায় এ সময় বিনিয়োগর সর্বোচ্চ সীমা দশ কোটি টাকায় নির্ধারণ করা হয়। যার পলে আট-এ এসে দাঁড়ায় সরকারি খাতে সংরক্ষিত শিল্পের সংখ্যা। একটি বৈদেশিক পুঁজি বিনিয়োগ আইন পাশ করা হয় ১৯৮০তে, এবং প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা নেয়া হয় রফতানি শিল্পের জন্যে উন্মুক্ত এলাকার। শিল্প বিনিয়োগের ধরণ স্বাধীনতাপূর্ব অবস্থায় ফিরে আসে '৭৬-৭৭ সালে। তখন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধির হার নির্ধারণ করা হয় শতকরা ৮.৪ ভাগ এবং ১৯৮২ সালে নতুন শিল্প নীতি ঘোষণা করা হয়, যাতে সরকারি খাত অপেক্ষা বেসরকারি খাতেই বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ আলোকে ২৫টি বস্ত্রকল ও ৩৩টি পাটকলসহ বহুসংখ্যক সরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে পুঁজি প্রত্যাহার করা হয়। তাছাড়া দেশের সার্বিক

www.pathagar.com

শিল্পায়নের লক্ষ্যে '৮২-৮৩ সালে ২৮টি পাটকল এবং ২২টি বস্ত্রকল পূর্বতন বাংলাদেশী মালিকদের ফেরত দেয়া হয় এবং বস্ত্রকল সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন ৯টি বিশেষ ধরণের মিল থেকে পুঁজি প্রত্যাহার করে।

১৯৮৬ সালের জুলাই মাসে নতুন শিল্পনীতি ঘোষণা করা হয়। '৮৬-৮৭ অর্থবছরে প্রথম নয় মাসে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পজাত দ্রব্যের সাধারণ উৎপাদনসূচক শতকরা ১১.৫৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৫৭.৪২-এ দাঁড়ায়। যার '৮৫-৮৬ সালের প্রথম নয় মাসের গড় সাধারণ উৎপাদনসূচক ছিলো ১৫৭.৪২। তখন অধিকাংশ শিল্প পণ্যের উৎপাদন রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে পূর্বের চেয়েও হ্রাস পেয়েছিলো। '৮৮-৮৯ অর্থ বছরে মোট দেশজ উৎপাদনে শিল্পখাতের অবদান আগের বছরের শতকরা ৯.৯ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১০.১ হয়।

১৯৮৯ সালের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে 'ঋণ সালিশী বোর্ড এবং বিনিয়োগ বোর্ড' গঠন। দেশজ শিল্পের সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে '৮৮-৮৯ সালের বাজেটে কর ব্যবস্থায় কয়েকটি পুনর্বিন্যাসমূলক পরিবর্তন করা হয়। '৮৮-৮৯ সালে বেসরকারি শিল্পখাতে ৩,৫৯৭টি শিল্প প্রকল্প অনুমোদন ও নিবন্ধন করা হয়। এবং '৮৭-৮৮তে ৯৮১টি শিল্প প্রকল্পের জন্যে অনুমোদন দেয়া হয়েছিলো। আর '৮৮-৮৯ এ মোট ১৭টি শিল্পে বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছিল। '৯০-৯১ সালে বেসরকারি শিল্প খাতে ৫,৮৬৭টি (ক্ষুদ্র শিল্পসহ) শিল্প প্রকল্প অনুমোদন ও নিবন্ধন করা হয়। '৯১-৯২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে মোট ২,১৮৮টি শিল্পকে অনুমোদন এবং নিবন্ধিত করা হয়। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিদেশি বিনিয়োগও রয়েছে।

১৯৮৯ বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে গঠন করা হয় 'বিনিয়োগ বোর্ড।' মার্চ '৯১ থেকে মার্চ'৯৫ পর্যন্ত বিনিয়োগ বোর্ডের ২,৫৮৬টি শিল্প প্রকল্প নিবন্ধিত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ২৭৯টি বিদেশি প্রতিষ্ঠান। আবার সরকারি মালিকানাধীন এন্টারপ্রাইজগুলোকে বেসরকারিকরণ করার নিমিত্তে মার্চ '৯৩-এ 'প্রাইভেটাইজেশন বোর্ড' গঠন করা হয়। এ পর্যন্ত এই 'প্রাইভেটাইজেশন বোর্ড' বিভিন্ন খাতের ১৮টি সরকারি মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানের বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করেছে। সরকারি মালিকানাধীন বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) এ পর্যন্ত সারাদেশে ৩১টি শিল্প এলাকা গঠন করেছে। আরো ৫৭টি শিল্প এলাকা বাস্তবায়ন শেষ হওয়ার পর্যায়ে রয়েছে।

অবকাঠামো খাত:

আশির দশকে আমাদের অবকাঠামো খাতে বেশ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। আশির দশকে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার বেড়েছে শতকরা ১৩ ভাগ হারে এবং শতকরা ১৩ ভাগ বেড়েছে বিদ্যুতের ব্যবহার। তথাপি আমাদের জ্বালানি ব্যবহারের মাত্রা প্রতিবেশী ভারত ও থাইল্যান্ডের চেয়ে অত্যন্ত কম। ১৯৮৮ সালে আমাদের জনপ্রতি ৫০ কেজি

www.pathagar.com

তেল সম ইউনিট জ্বালানি ব্যবহার করেছি। যেখানে ভারতে এর পরিমাণ ছিলো ২১০ কেজি এবং থাইল্যান্ডে ৩৩০ কেজি।

বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ যেমন বেশি তেমনি আবার বিতরণের সময় এর অপচয়ের পরিমাণও অনেক বেশি। বিদ্যুতের দাম স্বাধীনতা-উত্তরকালে বার্ষিক ১৬ শতাংশ হারে বেড়েছে মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ অত্যাল্প হবার কারণে।

মাত্র ২,৭৪৬ কিলোমিটার রেললাইন রয়েছে আমাদের দেশে। আর কেবল মাত্র ২৪ কিলোমিটার রেলপথ বাড়াতে পেরেছি আমাদের স্বাধীনতা পরবর্তী এ দীর্ঘ সময়ে। যদিও সড়ক পথের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। আমাদের পাকা রাস্তার প্রবৃদ্ধি ঘটেছে ৮.৩ শতাংশ হারে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে, আর ৪.৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালীন সময়ে। সড়ক পথের প্রবৃদ্ধি ভালো হলেও এর উন্নয়ন ঘটেছে ভারসাম্যহীনভাবে। আর যদিও শহর ও উপ-শহরগুলোর সংযোগ সড়ক পথ ৫২ শতাংশ বৃদ্ধি করেছে, তথাপি গ্রামগঞ্জের সাথে সংযোগ সড়ক বেড়েছে ২৩ শতাংশ হারে। এরপরও আমাদের ১৫ হাজার মানুষের জন্যে মাত্র এক কিলোমিটার সড়ক পথ। জলপথের আমাদের ব্যাপক সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এদিকে আমরা নজর দিতে না পারলেও উদ্ভাবনী মানুষ নদীমাতৃক দেশে ইরি চাষের যন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে জল পরিবহণের ক্ষেত্রে যে মিনি বিপ্লব ঘটাতে সক্ষম হয়েছে সে ব্যাপারে মতদ্বৈততার কোন অবকাশ আছে বলে মনে হয় না।

ব্যাংকিং খাত:

সরকার পরিচালিত ৬টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ৩টি বিশেষায়িত ব্যাংক প্রতিষ্ঠান নিয়ে স্বাধীনতাত্তোর সময়ে ব্যাংক ব্যবসার যাত্রা শুরু হয়। সময়ের ব্যবধানে সংখ্যা বেড়েছে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের এবং এরই সাথে বেড়েছে শাখা, কর্মীবাহিনী এবং পরিবর্তিত হয়েছে ব্যাংক ব্যবস্থার প্রকৃতিও। শুরুতে সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হলো ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে মালিকানা। যদিও বর্তমানে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা ব্যক্তিমালিকানায় পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু পাকিস্তান আমলে এদেশে একই সাথে সরকারি ও বেসরকারি মালিকানা ব্যাংক ছিলো। যার মধ্যে বেসরকারি ব্যাংকের সংখ্যা ছিলো বেশি। সে সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে ২২টি ব্যাংকের শাখা ছিলো। এর দু'টি পূর্ব পাকিস্তান ভিত্তিক, ১২টি পশ্চিম পাকিস্তান (পাকিস্তান) ভিত্তিক, ৫টি ভারতীয় এবং ৩টি বিদেশী।

আর্থিক খাতে এক জটিল অবস্থা বিরাজ করছিলো দেশ স্বাধীন হবার মুহূর্তে। মুদ্রার তারল্য ছিলো না ব্যাংকে। পাকিস্তানীদের ছিলো অধিকাংশ দেশী ব্যাংকের মালিকানা। মাত্রা দু'টি ব্যাংকের মালিকানা ছিলো বাংলাদেশের লোকদের। ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৩ সালের মধ্যে ব্যাংক ব্যবস্থায় পুনর্গঠন কর্মকান্ড সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক ছাড়া বর্তমান দেশী-বিদেশী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৪০-এ দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া কিছু ক্রেডিট সোসাইটিও রয়েছে এই খাতে। এই ৪০টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তিনটি রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংক রয়েছে।

www.pathagar.com

আমাদের রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংকগুলো '৭২-৭৩ সালে মোট ৭০২ কোটি টাকা আমানত নিয়ে যাত্রা শুরু করে। '৭৫-৭৬ সালে এসে ব্যাংক আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ১,০৯৯ কোটি টাকা। '৯৫ সালের মার্চ পর্যন্ত তফসিলী ব্যাংকগুলোর মোট শাখা দাঁড়ায় ৫৮০০টি। যার মধ্যে পল্লী এলাকায় শাখার সংখ্যা ৩,৬৩৬টি (শতকরা ৬২ ভাগ) আর শহুরে শাখার সংখ্যা ২,১৯৪টি (শতকরা ৩৮ ভাগ)। '৯৪-৯৫ অর্থ বছরে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক আহরিত আমানতের পরিমাণ ছিলো ৩,৪২,৯৭৮ মিলিয়ন টাকা।

'৯৪-৯৫ অর্থ বছরে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত মোট ঋণের স্থিতির পরিমাণ ২৯,২৬৩ মিলিয়ন টাকা (১২.১%)। ব্যাংক ঋণের মধ্যে সরকারি খাতসহ রাষ্ট্রায়াত্ত খাত ১০৬৮ মিলিয়ন টাকা (৩%) বৃদ্ধি পেয়ে ৩৪,১৬৩ মিলিয়ন টাকায় এবং বেসরকারি খাতে ২৮,২৯৫ মিলিয়ন টাকা (১৩%) বৃদ্ধি পেয়ে ২,৩৭,২০০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। '৯৩-৯৪ অর্থ বছরে ১৭,৯৫০ মিলিয়ন টাকায় শিল্প ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রাকে '৯৪-৯৫ বছরে ৩১,১০০ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত করা হয়। এপ্রিল '৯৫ পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যাংক ১২,০৮০টি প্রকল্পের অনুকূলে ২৬,০৯০ মিলিয়ন টাকা প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করেছে। যার মধ্যে ১১,৬৫৩টি প্রকল্পের অনুকূলে ১৫,৪৮০ মিলিয়ন টাকা অবমুক্ত করা হয়। '৯৪-৯৫ অর্থ বছরে মোট ব্যাংক ঋণের পরিমাণ ৩,২৬,৭৩০ মিলিয়ন টাকা। যার আনুমানিক ৪০ শতাংশ মেয়াদোত্তীর্ণ। ব্যাংক সেক্টেরের একটি কলংকজনক অধ্যায় হচ্ছে এই মেয়াদোত্তীর্ণ বা খেলাপী ঋণ।

শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য:

স্বাধীনতার সময় শিল্প-বাণিজ্যে প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে ছিল পাট শিল্প। এর পরের অবস্থানে ছিল চা শিল্প। এ ছাড়া তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এর স্বাধীনতার পরপর একমাত্র সিলেটবাসীরা বিদেশ থেকে রেমিটেন্স পাঠাতেন। বরং এই ধারার পরিবর্তন হয়েছে স্বাধীনতার পর থেকে। এখন কেবল সিলেট নয়, গোটা দেশের বাসিন্দা বিশ্বের নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছেন। আর রেমিটেন্স পাঠানোর ক্ষেত্রে এখন আর কেউ পিছিয়ে নেই। আমাদের বড় ধরনের অগ্রগতি সাধিত হয়েছে রেমিটেন্স সূত্রে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের ক্ষেত্রে। কিন্তু আমাদের জন্যে যেটা দুঃসংবাদ তা'হল পাট শিল্পের দৈন্য দশা। পাটের হাল চিত্র আমাদের জন্যে বেশ কষ্টের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা যেন ধ্বংস করে ফেলেছি পাট শিল্পকে। কেবলই যেন এখন আমাদের জন্যে পাট বোঝায় পরিণত হয়েছে।

আর তৈরী পোশাক শিল্প পাটের জায়গা করে নিয়েছে। পোশাক শিল্প বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের ক্ষেত্রে আমাদের জন্য কেটা সফলতার উজ্জ্বল অধ্যায়। তা'ছাড়া দু'হাতে বৈদেশিক মুদ্রা আমরা উপার্জন করছি চিংড়ি রফতানি করেও। এই খাতই স্বাধীনতার সময় আমাদের জন্যে ছিল অনাহরিত, অজ্ঞাত, মানব সম্পদ বা জনশক্তি, পোশাক শিল্প এবং মৎস্য সম্পদ আমাদের এখন প্রধান রফতানি শিল্প। কিন্তু চা শিল্পের ঐতিহ্যকেও আমরা পাট শিল্পের মত ধরে রাখতে পারিনি।

www.pathagar.com

স্বাধীনতার পরপর অত্যন্ত অল্প পরিমাণ বিলাস সামগ্রী দেশে আমদানী হত। কিন্তু গ্যাট স্বাক্ষরিত হওয়ার পর আমদানি ব্যবস্থা অবারিত হয়েছে। গ্যাট সুবাদে ক্রমান্বয়ে আমদানিমূলক ব্যবস্থা বিলীন হয়ে যাবে। তাই বাংলাদেশ অবাধ আমদানি নীতির সুযোগে এমন জিনিস নেই, যা আমদানি না করছে। যার বেশির ভাগ ভোগ্যপণ্য। '৭০-এর দশকে দেশে ভোগ্যপণ্যের পরিবর্তে মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি করা হতে। '৮০-এর দশকে যন্ত্রপাতি আমদানির সংখ্যা কমে যায়। আবার '৯০-এর দশকে বিশেষ করে '৯১-এর পর মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির দিকে নজর দেয়া হয়। তবে চলতি বছর আমদানির চরিত্র হতাশাব্যঞ্জক। বর্তমানে ভোগ্যপণ্যের আমদানি ক্ষেত্রে বিস্ফোরণ ঘটেছে।

আশির দশকের শুরু থেকেই বাংলাদেশে কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচীর কাজ শুরু হয়। '৯০-এর দশকে এই সংস্কার কর্মসূচীর চাপ আরো প্রবল হতে থাকে। বাণিজ্য উদার করা হয় ঢালাওভাবে শিল্পখাতে তেমন তৎপরতা এসময় লক্ষ্য করা যায়নি। শিল্পখাতে নীতি সংস্কারের প্রধান দিক ছিল বেসরকারিকরণ। সরকারি খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠান বেসরকারিখাতে দেয়ার প্রস্তাব ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শিল্পখাতে বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্যে মুনাফা ও পুঁজি অবাধে দেশের বাইরে নেয়ার পূর্ণ সুযোগ দেয়াও এই সংস্কার কর্মসূচীর অন্যতম লক্ষ্য। রফতানি বাড়ানোর উৎসাহ দান, শিল্পের জন্যে যন্ত্র, কাঁচামাল আমদানির শুল্ক ও শুল্ক বহির্ভূত বাধা দূরীকরণ, টাকাকে রূপান্তর-এসকল বিষয়কেও অর্থনৈতিক নীতি সংস্কারের কর্মসূচীর আওতায় নিয়ে আসা হয়।

কর কাঠামো ও সরকারী আয়-ব্যয়:

গত পঁচিশ বছরে সরকারী আয়-ব্যয় প্রধানতঃ বেড়েছে। সত্তরের দশকে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের প্রাথমিক অবকাঠামো, নতুন প্রশাসনের স্থিতি, উৎপাদনে গতিশীলতা আনয়নে সরকারের ভূমিকা ছিল প্রধান ও উল্লেখযোগ্য। সত্তরের দশকেই বেসরকারী খাতের সাহসী ভূমিকা চিহ্নিত হয়েছিল। বেসকারী খাতে সাদা ও কালো পুঁজির প্রসার ঘটে সরকারী খাতকে নির্ভর করেই সরবরাহ বিপনন, বিপনন ও ঋণের ব্যবহার বা অপব্যবহার করে। সরকারী উন্নয়ন ও উৎপাদন কর্মকান্ডে বিবর্তন ঘটতে থাকে এ পুঁজির চাপে ও রাজনৈতিক বিবর্তনের কারণে। সত্তরের দশকে এ থেকে বেসরকারীকরণের যে সূচনা হয়েছিলো, তা আশির দশকে আরও গতি লাভ করেছিলো। যার ফলশ্রুতিতে সরকারী উন্নয়ন ব্যয়ের ক্ষেত্রে খাতওয়ারী পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। চলতে থাকে কৃষিখাতের ভর্তুকির প্রত্যাহার, কৃষি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সার ও বীজ সরবরাহ ও সম্প্রসারণ ক্ষেত্রে আসে বিবর্তন, আর সংকুচিত হয় কৃষি পণ্য বিপনন ও শিল্প ক্ষেত্রে ব্যবহারের নিমিত্তে সরকারী ভূমিকার। এ প্রবণতাসমূহ আরো তীব্রতর হয়ে ওঠে আশির দশকের শেষ দিকে ও নব্বই-এর দশকে। তথাপি সরকারী বিনিয়োগের বিস্তৃতি চলতে থাকে নির্মাণ, যোগাযোগ, পরিবহন, বিদ্যুৎ, জ্বালানি খাতে। সরকারী বিনিয়োগ সামাজিক খাতে বাড়লেও তুলনামূলকভাব তা তেমন বাড়েনি। আর সরকারী ব্যয় প্রশাসন খাতে অনেক বেড়ে গেলেও দক্ষতার পরিমাণে তা ফল দেখাতে সক্ষম হয়নি।

যদিও আয় বেড়েছে, কিন্তু নির্ভরতা কমেনি পরোক্ষ করের ও আমদানী-নির্ভর আয়ের

www.pathagar.com

প্রবণতার। গুণগত পরিবর্তন আসেনি কর কাঠামোতে। প্রত্যক্ষ কর তেমন আসেনি, যদিও দেশের পুঁজির বিকাশ ঘটেছে। করের আদায় বেড়েছে করের হার কমানোর ফলে, যদিও প্রকৃত মূল্যে তা দৃশ্যমান নয়। কর বহির্ভূত আয় বাড়ছে, যদিও সামষ্টিক উৎপাদনের পরিমাপে তাও এখনও নগণ্য।

এখনও গতানুগতিকতা ও ক্রম অগ্রসরমানতা রাজস্ব আয়ের বিচারে বিদ্যমান। ফলে রাজস্ব ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোন দৃশ্যমান জবাবদিহিতা ও সার্থকতার পরিমাপ নেই। এ অবস্থা থেকে মুক্ত হবার প্রচেষ্টাও পরিলক্ষিত হচ্ছে না। রাজস্ব ব্যয়ের নির্বাহীকেন্দ্রিকতা এর অন্যতম হিসেবে বিবেচিত।

সামাজিক খাতের অবস্থান:

কোন দেশের অর্থনীতির বিবেচনা সমাজ নিরপেক্ষ হতে পারে না। অর্থনৈতিক উন্নয়ন শিল্প-বাণিজ্য নির্ভর হয় বলেই গ্রাম-শহরে জনসংখ্যার যে বিবর্তন তা কেবল কৃষি ও শিল্পের ভারসাম্যের প্রশ্নেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং উৎপাদন সম্পর্ক পরিবর্তনেরও একটি বিশেষ দিক হিসেবে বিবেচিত।

যদিও জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু কৃষিতে বর্ধিত শ্রমশক্তিকে ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে না এবং যথার্থ গতিময়তা পাচ্ছে না কৃষি বহির্ভূত গ্রামীণ কাজের বিস্তারও। বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সত্তর দশকের তুলনায় আশির দশকে সীমিত হয়েছে এবং এর তুলনায় নব্বই-এর দশকে আরও সীমিত হয়ে পড়েছে। এটি কেবল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হারের ন্যূনতার জন্যেই নয়, বরং তা আমাদের শিক্ষা-উৎপাদন, সমাজ সিদ্ধান্ত গ্রহণ-এসকল সম্পর্কের অসম অবস্থার কারণেও ঘটছে বলে অনুমিত হচ্ছে।

সংখ্যা বিচারে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রসার ঘটলেও সে প্রসারতা কাঙ্খিত মাত্রার চেয়ে কম। এ ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে মানোন্নয়নের। শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ সত্তর ও আশির দশকের তুলনায় বেশ বেড়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে বয়সের শিশু-কিশোররা যায় তাদের অংশগ্রহণও বেড়েছে। কিন্তু অর্থবহ ও মানসম্পন্ন শিক্ষাদানে ব্যর্থ হওয়ার কারণে শিক্ষার সুফল থেকে সমাজ বঞ্চিত থেকেই গেছে।

স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক বিস্তার এখন থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে পৌঁছেছে। কিন্তু কেবল প্রতিষ্ঠান দিয়ে স্বাস্থ্য সেবা হয় না। দেশে ওষুধের লভ্যতা সত্তরের দশকের তুলনায় আশির দশকে এবং আশির দশকের তুলনায় নব্বই-এর দশকে বেড়েছে কিন্তু চিকিৎসার ব্যয় সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। সরকারের কোন সুগ্রন্থিত নীতি আজ পর্যন্ত হয়নি।

আমরা পিছিয়ে আছি মানব সম্পদ বিবেচনার সূচকে সুপেয় পানীয় অভাব, স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃব্যবস্থা, মানসম্পন্ন স্বাক্ষর ও শিক্ষিত জনগোষ্ঠী, সৃজনশীল কর্মের সুযোগ, আত্মসমৃদ্ধ জনগোষ্ঠীর বিকাশ এমনি সব বিবেচনায় আমাদের আগমন সত্তরের চেয়ে আশিতে বা আশির চেয়ে নব্বই-এর দশকে তেমন উল্লেখযোগ্যভাবে ঘটেনি বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

www.pathagar.com

আমাদের চরম দারিদ্র্যের অনুপাতে তেমন কোন তারতম্য ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে না। কৃষিখাতের অবস্থা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ-এ দু'য়ের তারতম্যের কারণে বিভিন্ন শহরে বিভিন্নতার প্রতিফলন বিদ্যমান রয়েছে, দারিদ্র্য সীমারেখার নীচের জনসংখ্যার সার্বিক অনুপাতে। কিন্তু কৃষি খাতে যদি দ্রুত প্রবৃদ্ধি ঘটতো, শ্রম-ঘন কর্মকান্ডের যদি প্রসার ঘটানো যেত, আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে যদি স্বল্প পুঁজিতে উৎপাদিত পণ্যের বাজার ভোগ ও উৎপাদন সম্পৃক্ততা সম্প্রসারিত হত, রপ্তানিমুখী শিল্পের প্রসার শ্রম-ঘন ভিত্তিতে যদি হ'ত, তাহলে দারিদ্র্য বিমোচনের বাজার নির্ভর প্রক্রিয়া অনেকটা কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়ার অবকাশ সৃষ্টি হ'ত। কিন্তু বর্তমানে দারিদ্র্য বিমোচনের নামে শহর ভিত্তিক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের পরার্থ আশ্রয়ী যে বেসরকারী খাতের যে উদযোগ তাতে দারিদ্র্য বিমোচন হওয়া কতটুকু সম্ভব তা আমাদের গত ২৫ বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে সহজেই প্রতিভাত হয়েছে। আমরা কেবল সামাজিক অস্থিরতাকে সীমিত করতে Safety net প্রচলনের ক্ষেত্রে উৎসাহী হয়েছি।

নারীর অধিকার আর্থ-সামাজিক অবস্থানের বিভিন্নতায় নানাভাবে লংঘিত হয়েছে। নারীর অধিকার নিয়ে দাতাগোষ্ঠীর সহায়তায় শহরভিত্তিক নারী সমাজের যে আন্দোলন তার শেকড় আজও ব্যাপ্তি লাভ করতে সক্ষম হয়নি।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা:

জাতীয় উন্নয়নের প্রত্যাশায় আমরা এ পর্যন্ত চারটি পঞ্চবার্ষিক এবং একটি দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেছি। যদিও এরমধ্যে একটি পরিকল্পনাও লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেনি। আর প্রতিটি পরিকল্পনার মেয়াদ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশ কম ছিলো। ১৯৭১ সালের পর থেকে গত ২৫ বছরে বাংলাদেশের স্থুল দেশজ উৎপাদনের (GDP) প্রবৃদ্ধির হার ছিলো মাত্র ৩.৭৯ শতাংশ। জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমন্বয় করার পর মাথাপিছু স্থুল দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিলো মাত্র ১.৬ শতাংশ। দেশজ সঞ্চয়ের অপ্রতুলতার জন্যে উন্নয়ন ব্যয়ের এক বিরাট অংশ বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণের মাধ্যমে বহন করা হয়েছে। এ সময়ে খাদ্য ও পণ্য সাহায্য বাবদ এবং প্রচুর বৈদেশিক অনুদান ও ঋণ পাওয়া গেছে।

পরিকল্পনাসমূহের তুলনামূলক অবস্থান:

(কোটি টাকায়)

পরিকল্পনা	পরিকল্পনার আকার	প্রকৃত ব্যয়	বৈদেশিক সম্পদ	প্রত্যাশিত উন্নয়ন হার	প্রকৃত উন্নয়ন হার
১ম পরিকলল্পনা	৪,৪৫৫	২,০৭৪	১,৪৯১ (৭২%)	৫.৫%	৪.০%
দ্বি-বার্ষিক পরিঃ	৩,৮৬১	৩,৩৫৯	২,৫৮১ (৭৭%)	৫.৬%	৩.৫%
২য় পরিকল্পনা	২৫,৫৯৮	১৫,২৯৭	১৬,৩৮৩ (৬৪%)	৭.২%	৩.৮%
৩য় পরিকল্পনা	৩৮,৬০০	২১,৯৪২	২৫,০৯০ (৬৫%)	৫.৪%	৩.৮%

www.pathagar.com

প্রথম পরিকল্পনা:

১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের অর্থনীতিকে গড়ে তোলার প্রত্যাশায় প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এর মোট ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ ছিলো ৪,৪৫৫ কোটি টাকা। যার মধ্যে ৩,৯৫২ কোটি টাকা সরকারি খাতে এবং ৫০৩ কোটি টাকা বেসরকারি খাতে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়। সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য সামনে রেখে এই পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় বলে এতে সরকারি খাতের ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিলো। এই পরিকল্পনাকে পাঁচটি বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় ভাগ করা হয়। পরিকল্পনার সময় শেষে দেখা যায়, সরকারি খাতে মোট ব্যয় হয়েছে ৩,১৫২ কোটি টাকা এবং বেসরকারি খাতে ব্যয় হয়েছে ৫০৩ কোটি টাকা। এ থেকে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে, সরকারি খাতে বরাদ্দকৃত ব্যয়ের শতকরা ৮১ ভাগ এবং বেসরকারি খাতে শতকরা ৪৯.১১ ভাগ।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার তুলনাচিত্র:

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	সরকারি খাত	বেসরকারি খাত	মোট ব্যয় বরাদ্দ
১৯৭৩-৭৪	৫২৫	৭০	৫৯৫
১৯৭৪-৭৫	৬৪৫	৮০	৭২৫
১৯৭৫-৭৬	৭৭৫	৯৫	৮৭০
১৯৭৬-৭৭	৯২৫	১১৫	১,০৪০
১৯৭৭-৭৮	১,০৮২	১৪৩	১,২২৫
মোটঃ	৩,৯৫২	৫০৩	৪,৪৫৫

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রকৃত জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির হার বার্ষিক শতকরা ৫.৫ ভাগ ধরা হয়েছিলো। কিন্তু পরিকল্পনা শেষে দেখা যায় যে, জিডিপি বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র শতকরা ৪ ভাগ হারে। মাথাপিছু আয় বার্ষিক ২.৫ হারে বৃদ্ধি পাবে বলে ধরা হয়েছিলো। বরং পরিকল্পনা শেষে দেখা যায় যে, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ১.১ ভাগ হারে। আর এই পরিকল্পনায় বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে নির্ধারিত লক্ষ্যসমূহ অর্জিত হয়নি। অন্যদিকে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিলো ৪.৬ ভাগ। প্রকৃতপক্ষে বৃদ্ধি পেয়েছে ৩.৭ ভাগ। শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিলো বার্ষিক ৭.১ ভাগ। কিন্তু তা থেকে অর্জিত হয়েছে মাত্র দশমিক তিন ভাগ। আবার সঞ্চয়ের ক্ষেত্রেও লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। পরিকল্পনার শেষ বছরে সঞ্চয় মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ১৪.২ ভাগে উন্নীত হবে নির্ধারিত হয়। কিন্তু এ সময় শেষে সঞ্চয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৩.১০ ভাগ। এ সময়ে দেশে বিদ্যমান খাদ্য সমস্যা দূর করে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হলেও তাও সম্ভব হয়নি।

www.pathagar.com

দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা

দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৭৮ সালের জুলাই মাস থেকে শুরু না করে বরং ১৯৮০ সালের জুন মাস সময় পর্যন্ত দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা ('৭৮-৮০) চালু করা হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পট-পরিবর্তনের পর নতুন সরকার ক্ষমতায় এসে ১৯৭৬ সাল থেকে জাতীয় অর্থনীতিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন আনয়ন করে। দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার জন্যে মোট ৩,৮৬১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। যার মধ্যে সরকারি খাতের জন্যে বরাদ্দ ছিলো ৩,২৬১ কোটি টাকা এবং বেসরকারি খাতের জন্যে বরাদ্দ ছিলো ৬০০ কোটি টাকা। দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনায় বার্ষিক শতকরা ৫.৬ ভাগ হারে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও বাস্তবে মোট জাতীয় উৎপাদন বার্ষিক শতকরা ৩.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গৃহীত হয় ১৯৮০ সালের জুলাই থেকে ১৯৮৫ সালের জুন পর্যন্ত সময়ের জন্যে। এতে ব্যয় বরাদ্দ করা হয় ২৫,৫৯৫ কোটি টাকা। যার মধ্যে সরকারি খাতে ২০,১২৫ কোটি টাকা এবং বেসরকারি খাতে ৫,৪৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। এর মোট ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে ১১,৭১৫ কোটি টাকা অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে এবং ১৩,৮৮০ কোটি টাকা বৈদেশিক উৎস থেকে যোগান দেয়া হবে বলে নির্ধারিত হয়।

কিন্তু পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ১৯৮২ সালের নভেম্বর মাসে এই পরিকল্পনার সংশোধিত দলিল প্রকাশ করা হয়। যাতে মোট ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ ধরা হয় ১৭,২০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকারি খাতে বরাদ্দ করা হয় ৬,১০০ কোটি টাকা।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার তুলনাচিত্র:

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	সরকারি খাত	বেসরকারি খাত	মোট ব্যয় বরাদ্দ
১৯৮০-৮১	২,১১২	৮৫০	২,৮৯৩
১৯৮১-৮২	১,৯১৩	৯৮০	২,৮৯৩
১৯৮২-৮৩	২,১৪৪	১,২৬০	৩,৪০৪
১৯৮৩-৮৪	২,২৩৫	১,৪১০	৩,৬৪৫
১৯৮৪-৮৫	২,৬৯৬	১,৬০০	৪,২৯৬
মোট	১১,১০০	৬,১০০	১৭,২০০

এটা একটি উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা হিসেবে অধিকভাবে বিবেচিত। এতে গ্রামীণ উন্নয়ন তথা স্বনির্ভরতা অর্জনকে উদ্দেশ্য হিসেবে নেয়া হলেও তা অর্জনের কোনো সঠিক দর্শন ছিলো না তাতে। সার্বিকভাবে কৃষি উন্নয়ন, খাদ্যে স্বংয়সম্পূর্ণতা অর্জন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাসকরণ, গ্রামীণ উন্নয়ন এসকল বিষয়ের ওপর প্রাধান্য দেয়া হলেও এই পরিকল্পনা

www.pathagar.com

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে সফল হতে পারে নি। শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে অর্জিত হয়েছে মাত্র ৪.৮ ভাগ যদিও এক্ষেত্রে বার্ষিক শতকরা ৮.৪ ভাগ বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছিলো।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

১৯৮৫ সালের জুলাই থেকে ১৯৯০ সালের জুন পর্যন্ত সময়-সীমার জন্যে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়। যা প্রণীত হয়েছিলো দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণের ওপর অত্যধিক গুরুত্বারোপ করে। এর আয়তন ছিলো, ৩৮,৬০০ কোটি টাকা। যার মধ্যে সরকারি খাতে ২৫,০০০ কোটি টাকা এবং বেসরকারি খাতে ১৩,৬০০ কোটি টকা বরাদ্দ রাখা হয়। আর এই বরাদ্দের ১৭,৫৭২ কোটি টাকা অভ্যন্তরীণ সম্পদ এবং বাকি ২১,০২৮ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্য থেকে মিটানোর কথা ছিলো।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার তুলনাচিত্র:

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	সরকারি খাত	বেসরকারি খাত	মোট ব্যয় বরাদ্দ
১৯৮৫-৮৬	৩,৮২৫	২,৫৬০	৬,৩৮৫
১৯৮৬-৮৭	৪,৩৬০	২,৬৫০	৭,০১০
১৯৮৭-৮৮	৪,৯৭০	২,৭১৬	৭,৬৮৬
১৯৮৮-৮৯	৫,৬১০	২,৮০৯	৮,৪১৯
১৯৮৯-৯০	৬,২৩৫	২,৮৫৬	৯,১০০
মোট	২৫,০০০	১৩,৬০০	৩৮,৬০০

এটাও অনেকটা গতানুগতিক গন্ডী পার হয়ে কোনো নতুনত্ব লাভ করতে পারেনি। অতীত পরিকল্পনাসমূহের মতো এই পরিকল্পনাও মোট ব্যয় বরাদ্দের শতকরা ৫৪.৫ ভাগ সংগ্রহের ব্যবস্থা রাখা হয় বৈদেশিক সাহায্য থেকে।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা:

১৯৯০ সালের জুলাই থেকে ১৯৯৫ সালের জুন সময়ের ব্যাপ্তিতে চুতর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই পরিকল্পনায় প্রাধান্য লাভ করে দারিদ্র দূরীকরণ, বেকারত্ব দূরীকরণ এবং নিরক্ষরতা অবসান সহ দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয়সমূহ। এর লক্ষ্যমাত্রাও অন্যান্য পরিকল্পনার মতো অর্জিত হয়নি।

এর অবয়ব ৬৭,২৩০ কোটি টাকা বিস্তৃত ছিলো। যার মধ্যে ৪০,৭৩০ কোটি টাকা সরকারি খাতে এবং অবশিষ্ট ২৬,৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় বেসরকারি খাতের আওতায়। আর মোট বরাদ্দের মধ্যে ৩২,৪৭০ কোটি টাকা অভ্যন্তরীণ উৎস এবং বাকি

www.pathagar.com

৩৪,৭৬০ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্য থেকে মিটানোর ব্যবস্থা রাখা হয়। এটিও অন্য পরিকল্পনার মতো লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়।

বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তি:

সাহায্যের নামে ঋণ নেয়া হয় দেশের রুগ্ন ও বিপর্যস্ত বাঁচিয়ে রাখার জন্যে। দাতারা খাদ্য ও পণ্য দিয়ে স্বাধীনতার প্রথম দিকে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে সাহায্য করতো। কিন্তু পরিবর্তিতে ক্রমান্বয়ে সাহায্যের নিয়ম থেকে সরে গেছে তারা। আর বর্তমানে ঋণ বাড়িয়ে দিয়ে কমিয়ে দেয়া হয়েছে সাহায্য অনুদান এবং এরই সাথে বিভিন্ন শর্ত জুড়ে দিচেছ দাতারা। যদিও আমাদের অধিকাংশ ঋণ করতে হচ্ছে সরকারি খাতের জন্যে। আমাদের সমাজের বিভিন্ন স্তরে বৈদেশিক ঋণের নির্ভরশীলতা এমন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে যার বিকল্পের 'সুযোগ ব্যয়' বর্তমানের কাঠামোতে ঋণাত্মক। কেননা, এ মূহূর্তে বৈদেশিক ঋণ সাহায্য বন্ধ হলে কর্মসংস্থান, আয়, ভোগ এবং বিনিয়োগের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে।

বাংলাদেশে মোট ২৮,৪২৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সাহায্য এসেছে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৯৪-৯৫ সালের জুলাই মাস সময় পর্যন্ত। যদিও প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলো ৩৪,২৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের। যার মধ্যে জুলাই '৯৪ পর্যন্ত খাদ্য সাহায্য ৫,২১৮.৪ মিলিয়ন ডলার, পণ্য সাহায্য ৮,৮২৬.৬ মিলিয়ন ডলার এবং প্রকল্প সাহায্য হিসাবে ১৩,৪৭৩.৫ মিলিয়ন ডলার গ্রহণ করা হয়েছে।

আমাদের মাথাপিছু বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ বর্তমানে প্রায় ১৩৫ মার্কিন ডলার। যা '৭৩-৭৪ সালে ছিলো ৬.৫৯ মার্কিন ডলার। স্বাধীনতা পরবর্তী আমাদের অর্থনীতির পরিচিত চিত্র হচ্ছে বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরশীলতা। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক কাঠামো ১৯৭১ সালের যুদ্ধ প্রায় ধ্বংস করেছিলো তখন পরনির্ভরশীলতার সংকট ব্যাপক ও আবশ্যিক হয়ে দাঁড়ায়। বিভিন্ন অর্থনৈতিক সূচকের টানাপোড়েনে স্বাধীনতা পরবর্তী সরকার বাধ্য হয়ে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভর করে ধারাবাহিক রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন শুরু করে। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশে বিদেশী সাহায্য নির্ভর উন্নয়ন প্রক্রিয়ার যে ধারা তা বেড়ে গিয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে দাঁড়িয়েছে। আর আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে বৈদেশিক সাহায্যের মাত্রা। তাছাড়া বাণিজ্য ঘাটতি কমেতো নয়ই বরং বেড়ে গিয়েছে আরো বহুল পরিমাণে।

৪৪৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আমদানি-রফতানি বাণিজ্যে ঘাটতি ছিলো ১৯৭২-৭৩ সালে। যা ৯১৯ মিলিয়ন ডলারে পৌঁছে ১৯৭৫-৭৬ সালে এবং তা আরও বেড়ে ১,৫৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায় ১৯৮৬-৮৭-এ। রফতানি আয় দ্বারা আমদানি বিলের ৬০ দশমিক ৪৬ শতাংশ পরিশোধ করা সম্ভব হয়েছে '৯৩-৯৪ অর্থ বছরে।

www.pathagar.com

বৈদেশিক অর্থনৈতিক সাহায্যের অঙ্গীকার ও অবমুক্তি

(৭১-৭২–৯৪-৯৫)

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বৎসর	অঙ্গীকার			অবমুক্তি		
	অনুদান	ঋণ	মোট	অনুদান	ঋণ	মোট
১৯৭১-৭২	৫১২	৯৮	৬১০	২৪৫	২৬	২৭১
১৯৭২-৭৩	৪৮৩	৩৯৫	৮৭৮	৪৮৬	৬৫	৫৫১
১৯৭৩-৭৪	১০৭	৪৪৮	৫৫৫	২১৮	২৪৩	৪৬১
১৯৭৪-৭৫	৩৪৫	৯২১	১২৬৬	৩৭৫	৫২৬	৯০১
১৯৭৫-৭৬	৩৮০	৫৭৮	৯৫৮	২৩৪	৫৬৭	৮০১
১৯৭৬-৭৭	৪০০	৩২৬	৭২৬	২৫৬	২৭৯	৫৩৫
১৯৭৭-৭৮	৪৩৩	৭১৪	১১৪৭	৩৯২	৪৪২	৮৩৪
১৯৭৮-৭৯	৯৩৬	৮২৪	১৭৬০	৫০৫	৫২৮	১০৩৩
১৯৭৯-৮০	৪৮৫	৬৬৮	১২৫৩	৬৫০	৫৭৩	১২২৩
১৯৮০-৮১	৫৫০	১০০৯	১৫৫৯	৫৯৩	৫৫৪	১১৪৭
১৯৮১-৮২	৮০৫	১১১৭	১৯২২	৬৫৪	৫৮৬	১২৪০
১৯৮২-৮৩	৮৩৭	৬৮৫	১৫২২	৫৮৭	৫৯০	১১৭৭
১৯৮৩-৮৪	৮৫৯	৮৩৬	১৬৯৫	৭৩৩	৫৩৫	১২৬৮
১৯৮৪-৮৫	৮৭৫	১১০৫	১৯৮০	৭০০	৫৬৯	১২৬৯
১৯৮৫-৮৬	৮৭৪	৭৮৭	১৬৬১	৫৪৬	৭৬০	১৩০৬
১৯৮৬-৮৭	৮৯৪	৭০৯	১৬০৩	৬৬১	৯৩৪	১৫৯৫
১৯৮৭-৮৮	৮৮১	৬৪৮	১৫২৯	৮২৩	৮১৭	১৬৪০
১৯৮৮-৮৯	৬৬১	১২১২	১৮৭৩	৬৭২	৯৯৬	১৬৬৮
১৯৮৯-৯০	৮৮৪	১২৯১	২১৭৫	৭৬৬	১০৪৪	১৮১০
১৯৯০-৯১	৪৮৫	৮৮৫	১৩৭০	৮৩১	৯০১	১৭৩২
১৯৯১-৯২	১১৪০	৭৭৫	১৯১৫	৮১৭	৭৯৪	১৬১১
১৯৯২-৯৩	৭৩৪	৫৪০	১২৭৪	৮১৮	৮৫৭	১৬৭৫
১৯৯৩-৯৪	৪৬৬	১৯৪৭	২৪১৩	৭১০	৮৪৯	১৫৫৯
১৯৯৪-৯৫ (জুলাই/মার্চ)	৩২৬	৪০৪	৭৩২	৫১৪	৬০৬	১১২০
সর্বমোট	১৫৩৫২	১৮৯২২	৩৪৩৭৬	১৩৭৮৬	১৪৬৪১	২৮৪২৭
শতকরা হার	৪৫	৫৫	১০০	৪৮	৫২	১০০

উৎস: ফ্লো অব এক্সটারনাল রিসোর্সেস টু বাংলাদেশ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার।

আমাদের সাহায্যের নির্ভরতা বর্তমানে এত প্রকট আকার ধারণ করেছে যে, উন্নয়ন কর্মসূচীর দিকনির্দেশনা ও কাঠামো উভয় ক্ষেত্রেই সরকারের কর্তৃত্ব ক্রমান্বয়ে কমে যাচ্ছে। সবকিছু যেন স্থির করে দেন দাতারাই। আমাদের ব্যাপক দারিদ্র ও রাজনৈতিক দুর্বলতাই

www.pathagar.com

দাতাদের এই ক্ষমতার মূল কারণ হিসেবে বিবেচিত। পর্যাপ্ত অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহে সরকারগুলোর ব্যর্থতা, অক্ষমতা, ব্যবহারে অদক্ষতা এবং নিজস্ব নীতি প্রণয়নে ব্যর্থতার কারণে দাতারা দিন দিন এমনভাবে শক্তিশালী হচ্ছে যে, তারা এ সুযোগে আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহেও নাক গলাতে কুণ্ঠিত হচ্ছে না। ঋণ গ্রহণ ও শর্ত দুটোই যেন সমান পাল্লা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের ক্ষেত্রে। যে সরকারই স্বাধীনতার পর থেকে ক্ষমতায় এসেছে তারা সকলেই বলে আসছে বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা কমানোর কথা, তথাপি বাস্তব পরিস্থিতি যেন অপরিবর্তিতই থেকে যাচ্ছে সকল সরকারের আমলেই। যদিও সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল হয়েই প্রতিটি উন্নয়ন সহ সার্বিক কর্মকান্ড চালিয়ে আসছে। তথাপি স্বাধীনতা পরবর্তী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারের সময় কিছুটা ভিন্ন চিত্র পরিলক্ষিত হয়। সবচেয়ে তখন কম পেতো প্রকল্প সাহায্য, পণ্য সাহায্য পেতো সর্বাধিক, আর তখন ঋণ কম পেয়ে বরং বেশি পেতো অনুদান। অন্যদিকে বর্তমানে বেশি পায় প্রকল্প সাহায্য এবং কম খাদ্য সাহায্য। বরং অনুদান কম এবং ঋণ পাওয়ার পরিমাণ বেশি। যদিও আগে এনজিওরা সরকারি সাহায্য পেতো না বরং বর্তমানে তারা তাও পাচ্ছে। তাই ঋণ প্রাপ্তির সাথে সাথে প্রতি বছরই ১১ দশমিক ৫ শতাংশ হারে বৈদেশিক দেনা বৃদ্ধি পেয়েই চলছে। আর দেনার পরিমাণ যদি এই হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে তাহলে আগামী ১০-১২ বছরের মধ্যেই বাংলাদেশের বৈদেশিক দেনার পরিমাণ দাঁড়াবে ৬ হাজার কোটি মার্কিন ডলার। আর যদিও প্রত্যাশা অনুসারে এই সময়ে ৬ দশমিক ৫ শতাংশ হারে জিডিপি বৃদ্ধি পায়, তথাপি ২০০৬ বা ২০০৭ সাল নাগাদ আমাদের বৈদেশিক দেনা জিডিপিকে ছাড়িয়ে যাবে তার আলামতই পরিলক্ষিত হচ্ছে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন (শিল্প বাজারঃ সাইফ ইসলাম দিলাল।)

প্রাপ্তির আত্ম-তুষ্টি:

আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে এতো কিছু ব্যর্থতার পরও আমাদের স্বাধীনতাত্তোর সময়ে কিছু উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তি ঘটেছে বলে অনুমিত হয়:

১. কৃষকদের সর্বশান্ত করে ও মেরে হলেও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার সান্ত্বনা অর্জনে সক্ষম হয়েছি। দুর্ভিক্ষ মোকাবেলার মতো ত্রাণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। চুয়াত্তুর পরবর্তী সরকারসমূহ রাজনৈতিক সচেতনার কারণেই খাদ্যখাতে আর কোনো ঝুঁকি নিতে চাচ্ছে না। যদিও কৃষি খাতের এ সাফল্য, ইদানীং, সার-বীজ, সেচ ব্যবস্থাসহ উপকরণের অব্যবস্থাজনিত কারণে হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে।

২. স্থল ও জলপথে ব্যাপকহারে না হলেও পরিবহন সুযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

৩. অবকাঠামোগত সুবিধা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে অপেক্ষাকৃত হারে বেড়েছে।

৪. মজবুত হয়েছে বিদেশী মুদ্রার ভান্ডার। এ হার আরও দ্রুত বাড়ছে বিনিয়োগ শ্লথ গতির জন্য। ('৯৫-৯৬-এ রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ক্রমহ্রাসমান)।

৫. শতকরা ৭.৩ হারে বেড়েছে রফতানীর প্রবৃদ্ধি।

www.pathagar.com

৬. ঈর্ষণীয় উন্নতি লাভ করেছি আমরা পোশাক শিল্পে। যার অবদান কর্মসৃষ্টি ও বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছে।

৭. বছরে ৭.২ শতাংশ হারে বেড়েছে প্রবাসীদের পাঠানো অর্থের পরিমাণ। যার পেছনে রয়েছে বিশ্ব বাজারে আমাদের মানব সম্পদের কর্মসংস্থানের প্রসারতা লাভ।

৮. কৃষি থেকে অন্যান্য শহরভিত্তিক পেশায় নিয়োজিত হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি এবং গ্রাম্য সাধারণ মানুষের শহরমুখী প্রবণতা বৃদ্ধি।

৯. দুর্যোগ মোকাবেলায় সরকারের পাশাপাশি এনজিওসমূহের অবস্থান ও কার্য সক্ষমতা বৃদ্ধি লাভ।

কিন্তু আমাদের কৃষি-শিল্প সকল ক্ষেত্রে নিজস্ব সম্পদের যোগানসহ বিনিয়োগ বাড়ানোর আবশ্যকতা অত্যন্ত জরুরী হিসেবে বিবেচিত। কেননা বিনিয়োগ না বাড়াতে পারলে আমাদের বিদেশী সাহায্যের ওপর নির্ভরতা কমার কোন অবকাশ নেই।

দ্রষ্টব্য : এই নিবন্ধে স্বাধীনতার পঁচিশ বছরের মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। ফলে বর্তমান আওয়ামী লীগ শাসনামলের মূল্যায়ন অনুপস্থিত।

* *'খবর'-এ মার্চ ১৫, ১৯৯৭-এ প্রকাশিত*

www.pathagar.com